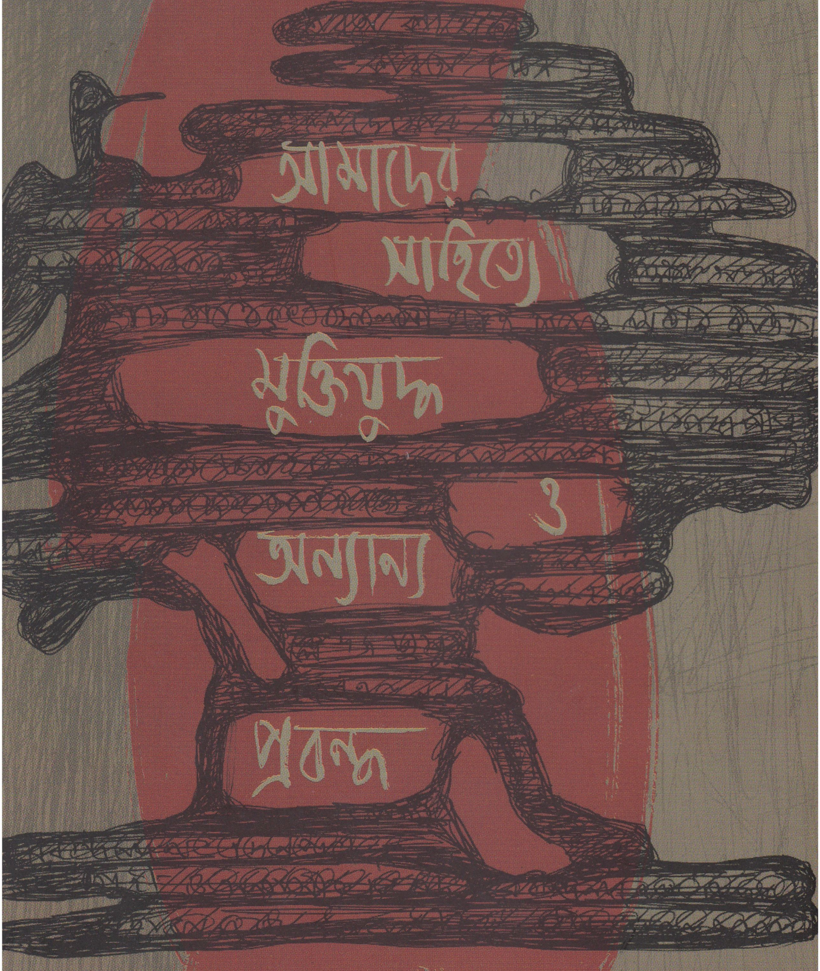


আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিষয়-বৈচিত্র্যে, শিল্প-স্বাতন্ত্র্যে অনন্য এক গ্রন্থ- *আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, আমাদের দেশের প্রচ্ছদশিল্প, বাঙালি ও বাঙালিয়ানা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

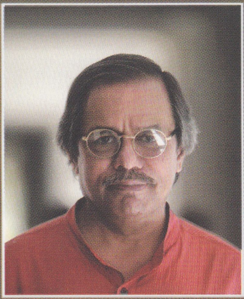
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী

9789849154273



রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা থেকে শুরু করে শেক্সপিয়রের নাটক কিংবা নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তা বা মধুসূদনের কাব্যভাবনা–শিল্পসাহিত্যের নানাবিধ বিষয় ধারণ করে এই প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। কয়েক দশক ধরে রচিত বহুমাত্রিক বিষয় ও চিন্তা-ঋদ্ধ এই প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলো সমৃদ্ধ করেছে বাঙালি পাঠকের মনোজগত। বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্পাঙ্গন, মুক্তিযুদ্ধসহ সম্ভাব্য সব উপাদানকে এই দুই মলাটের মধ্যে সংকলিত করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞান ও চিন্তার চাহিদা পূরণে অনবদ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম এই অনন্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

প্রচ্ছদ | রাজীব রাজু



সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
জন্ম ১৮ জানুয়ারি ১৯৫১ সালে, সিলেটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। ১৯৮১ সালে পিএইচডি করেন কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইয়েটস-এর কবিতায় ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের দর্শনের প্রভাব বিষয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, শিল্পকলার প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক, সমাজনিষ্ঠ কলামলেখক এবং কথাসাহিত্যিক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ–
গল্পগ্রন্থ : *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪), *থাকা না থাকার গল্প* (১৯৯৫), *কাঁচ ভাঙ্গা রাতের গল্প* (১৯৯৮), *সুখদুঃখের গল্প* (২০১১), *বেলা অবেলার গল্প* (২০১৪)
উপন্যাস : *আধখানা মানুষ* (২০০৬), *তিন পর্বের জীবন* (২০০৮), *কানাগলির মানুষেরা* (২০০৯), *আজগুবি রাত* (২০১০), *দিনরাত্রিগুলি* (২০১৩)
প্রবন্ধ ও গবেষণা : *নন্দনতত্ত্ব* (১৯৮৬, ২০১৫), *কতিপয় প্রবন্ধ* (১৯৯২), *অলস দিনের হাওয়া* (২০১৩), *রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ* ইত্যাদি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের *প্রেম ও প্রার্থনার গল্প* গল্পগ্রন্থটি ২০০৫ সালে প্রথম আলো বর্ষসেরা সৃজনশীল বই হিসেবে নির্বাচিত হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ
ও অন্যান্য প্রবন্ধ

আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

অক্ষর-পত্র
প্র কা শ নী

প্রথম প্রকাশ :ফেব্রুয়ারি ২০১৬

অক্ষর-পত্র প্রকাশনীর পক্ষে ৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭ থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে পরিবেশিত
ফোন : ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ০৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ইমেইল : creativebooks@panjeree.net
ওয়েব : www.panjeree.com

প্রচ্ছদ : রাজীব রাজু
গ্রাফিক্স : ইব্রাহিম খান মণি

ISBN : 978-984-91542-7-3

পরিবেশক: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে পরিবেশক : এন আর বি স্কলার্স পাবলিশার্স
১৬৯-০৮ গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে জ্যামাইকা এস্টেট,
নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ইউএসএ।
ভারতে পরিবেশক : বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বি-৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (২য় তলা), কলকাতা-৭
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন

মূল্য ৫০০ টাকা

Amader Sahitye Muktijudha O Anyanno Probondho
by Syed Manzoorul Islam
First Published in February 2016 by Akkhar-Patra Prokashoni
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak (Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

MRP : Taka 500.00 US$: 25

উৎসর্গ

আবুল হাসনাত

পূর্বকথা

গত দশ-পনেরো বছর ধরে নানা কাগজে-জার্নালে লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধনের একটি সংকলন তৈরির জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন অক্ষরপত্র প্রকাশনীর কামরুল হাসান শায়ক। তাঁর আগ্রহে এই সংগ্রহটি প্রকাশিত হচ্ছে। যেহেতু কিছু লেখা সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকী অথবা বিশেষ দিবস সংগ্রহের জন্য লেখা, কিছু লেখা সাহিত্য-জার্নালের জন্য, এগুলো দৈর্ঘ্যে এবং কাঠামোতে হের ফের আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষাতেও। একুশের বই মেলায় প্রকাশের একটা তাড়া ছিল, সেজন্য বানান অথবা বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। সেগুলো পরের সংস্করণে পরিমার্জনা করা হবে। সেই ভরসায় পাঠকের হাতে সংগ্রহটি তুলে দিচ্ছি।

প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি পড়ে পাঠক যদি চিন্তার সামান্য খোরাকও পান, তাতেই এগুলো লেখার পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে ধরে নেব।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সূচি

কবিতা কী ও কেন

১.

ভূমিকা : প্রত্যেক রচনার একটি ভূমিকা থাকা আবশ্যক। অতএব একটি ভূমিকা সংযোজিত হলো। কিন্তু বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট আলোচনা-সীমায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ এর ব্যাপ্তি আদি অন্তহীন। কাজেই ভূমিকাটির গুরুত্ব শুধুই আলঙ্কারিক।

সৃষ্টির আদি থেকে কবি ও কবিতা পাঠক 'কবিতা কী ও কেন' এ প্রশ্নে ভাবিত হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় এ সম্পর্কে এত তথ্য তত্ত্ব ধারণা বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে, তাদের একটি সংকলিত রূপ দেওয়া একজন গবেষকের এক জীবনের কর্ম নয়। মহাকাব্যিক in medias res পন্থায় আলোচনা শুরু করে, কিছুক্ষণ জল ঘোলা করে, মহাকালের কাছে প্রশ্ন-সমাধানের ভার দিয়ে বিদায় নেওয়া ছাড়া এ আলোচনার পদ্ধতিগত আর কোনো উপায় নেই। এবং এ পদ্ধতিতে সামান্য ইতিহাস সংযোজন করলে রচনাটিতে একটি পূর্বাপরতা বজায় থাকে মাত্র।

২.

বেন জনসনের একটি উক্তি : "কবিদের বিচার করা একমাত্র কবিদের কাজ। তাও সকল কবির নয়, শ্রেষ্ঠ কবিদের" (Timber: or Discoveries). কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলাটা প্রযোজ্য কী?

৩.

'কবিতা কী' এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে জানা যাক কবি কে? কী তাঁর পরিচয়। কবিতা বা Poetry যে গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে তার মূল হলো Poiean বা নির্মাণ, অর্থাৎ কবি নির্মাতা। এ নির্মাতা কোনো প্রস্তুতকারক নন; তিনি ঈশ্বরতুল্য স্রষ্টা। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে, অন্ধকার থেকে আলোয়, নীরবতা থেকে সরবতায়। তিনি শব্দকে তুলে আনেন, রূপ দেন সম্পূর্ণতায়। ঈশ্বরের বাণীর মতো, তার শব্দও নিজস্ব শাশ্বত বিষয় নির্মাণ করে, তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য করে তোলে। এজন্য প্রথম থেকেই কবির বিবাদ সমাজের সঙ্গে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। একটি প্রচলিত ধারণা আছে কবি সম্পর্কে যে, তিনি এপোলোর পুত্র, প্রকৃতপক্ষে তিনি এপোলোর প্রতিদ্বন্দ্বী মারসায়াস-এর পুত্র, যার আর্তস্বরে ধ্বনিত হয় শাশ্বত কবিতা এবং কবির বিপ্লবী স্রষ্টা। জর্জ স্টাইনার তাঁর 'ভাষা ও নীরবতা' গ্রন্থে একজন পোলিশ কবির একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যাতে বর্ণিত হয়েছে, মারসায়াসকে পরাজিত করে দেবতা এপোলোর চিন্তিত প্রস্থান। মারসায়াসের বিদ্রোহ এপোলোর কৃত্রিম স্নায়ুর সহ্য ক্ষমতার বাইরে; নুড়ি বিছানো পথে হাঁটতে হাঁটতে এপোলো ভাবছেন :

মারসায়াসের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ থেকে
কোনো একদিন
জন্ম নেবে কিনা
এক ধরনের শিল্প, যাকে বলতে পারি মূর্ত।
হঠাৎ তার পদপ্রান্তে
ঝরে পড়ল
একটি প্রস্তরির বুলবুল
তিনি ফিরে দেখলেন
যে বৃক্ষের সাথে মারসায়াসকে বেঁধে রেখেছিলেন
তার সব ক'টি পাতা সাদা হয়ে গেছে।
[বিগনিয়েক হার্বার্ট]

কবিরা যুগে যুগে বিদ্রোহী হয়েছেন। একজন কবিকে দেবতাও পরাজিত করতে পারেন না, 'পরাজিত হয় না কবিরা'। নীরবতাও

তাদের কাব্যে বাঙ্ময়, তারা নীরবতাকে শব্দে বুনন করেন।

স্টাইনারের ভাষায় পশ্চিমা সাহিত্যে অতঃপর ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কবির অবস্থানটি সূচিত হয়। ভাষার সীমাবদ্ধতাকে কবি স্বীকার করে নেন, কিন্তু তাকে ভাঙতে চেষ্টা করেন। যে Logos বা বাণী ঈশ্বরের কণ্ঠ নিঃসৃত তাকে ধারণ করতে সচেষ্ট হন এবং যেহেতু "সীমার বাইরে যাওয়া যায় না, শব্দ বড় নির্মমভাবে আঘাত দেয় কবিকে", শব্দের ভিতর থেকে একধরনের সম্ভাবনা আবিষ্কারে ব্রতী হন কবি। দান্তে চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের বাণীর তুল্য শব্দ সৃষ্টি করতে, ব্যর্থ হয়েছেন, এলিয়ট চেষ্টা করেছেন, ব্যর্থ হয়েছেন, লিখেছেন :

Words, after speech, reach
Into the silence
Words strain,
Crack and sometimes break, under the burden,
Under the tension, slip, slide, perish.
Decay with inprecision, will not stay in place,
Will not stay still.

কবিতা তাদের জন্য, সকল কবির জন্য বোধ করি, শব্দের সীমানা ভাঙার আর তার সকল সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে তার অন্তর্গত নির্যাসটুকু ছেঁকে আনার অন্তহীন প্রচেষ্টা–উদ্দেশ্য : যে শুদ্ধরূপ চূড়ান্ত Logos তা ঈশ্বরের হোক, ঈশ্বরে-নিরপেক্ষ, অন্যাপেক্ষ অন্য যেকোনো শক্তির হোক কবির প্রাপ্তির বাইরে থেকে যায় চিরদিন, তাকে ধারণ করা, তার সন্নিকট হওয়া। মালার্মে বলেছিলেন, 'Poetry is written with words, not with ideas'. আমরা যাকে যথাশব্দ বলি, যাকে যথাস্থানে বসালে কবিতা হয়, তারা ভাবনা নিরপেক্ষ নয় কিন্তু ভাবনায় পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে তারা।

৪.

এ পর্যন্ত এসে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হলে বলা যায়–কবিতা নিয়ে আলোচনায় বিতর্কের সূত্রপাত হওয়াটাই স্বাভাবিক। মালার্মেলেরীর মতো অনেকে বলেছেন শব্দই কবিতা বা শব্দেই কবিতা, এলিয়টের ভাষায় "I gotta use words when I talk to you" অনেকে

বলতে পারেন, না, কবিতায় ভাবনাই প্রধান। মাথ্যু আর্নল্ড এ পক্ষের প্রবক্তা। কবিতার বিষয়বস্তু হবে গম্ভীর, তাৎপর্যময়, কবিতা high seriousness-কে ধরে রাখবে তার কাঠামোয় যেমন হোমার বা মিল্টনের কবিতার। এ বিতর্ক, অন্যতম একটি বিতর্ক হিসেবে নিরন্তর শ্রুত।

৫.

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতার উপজীব্য যদি শব্দ, তাহলে উপন্যাস গল্প নাটকের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়?

আবার ফিরতে হয় শুরুতে : বলা যায় উপন্যাস গল্প নাটকে ভাবনাই প্রধান। এমনকি 'ফিনেগানস ওয়েকের' মতো শব্দপ্রধান উপন্যাসেও জয়েসের ভাবনাগুলো শব্দরূপ নিয়েছে মাত্র। জাঁক লাকানের ভাষায় বলা যায়, অবচেতনের কাঠামো ভাষার কাঠামোতেই বিধৃত এবং জয়েস এ উপন্যাসে অবচেতনের একটি কাঠামো নির্মাণ করেছেন শব্দে। শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন, কিন্তু ঐ অবচেতনের রূপটিকে বাঙ্ময় করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যভাবে দেখতে গেলে, শব্দপ্রধান যদি বলা যায় উপন্যাসটিকে, তাহলে স্টীভেন স্পেন্ডারের মতো বলতে বাধা কোথায় যে, "ফিনেগানস ওয়েক একটি কাব্যোপন্যাস।" কবিতার শব্দ একটি চূড়ান্ত অনুভূতির ফলিত রূপ, যাকে অতলান্ত শূন্যতা থেকে হাতড়ে নিয়ে আসতে কবি নিয়ত প্রয়াসী। একটি ভাবনাকে মূর্ত করার একই মাত্র পন্থা একটি কবিতায় কবির কাছে খোলা থাকে, একই মাত্র এবং সর্বোত্তম পন্থাটি। এটি সর্বোত্তম না হলে কবিতাটির রূপ পাল্টে যেত। পল ভ্যালেরীর একটি প্রশ্ন তুলে এখানে বিতর্কটির ধারা পরিবর্তন করা যায়। তাঁর ভাষায়, "কবিতা হচ্ছে ভাষার শিল্প অর্থাৎ "the art of Language।" শব্দের নির্দিষ্ট একটি সম্মিলনে একটি ভাবের উদ্রেক হয় যা অন্য সম্মিলনে হয় না। এ ভাবকে কাব্যিক ভাব বলব আমরা। কিন্তু প্রশ্ন আসে এ কাব্যিক ভাবটি কি?

জর্জ স্টাইনারের সূত্র ধরে এখন দেখা যাক কাব্যিক ভাবনা কী এবং কবি কীভাবে এ ভাবনাকে শব্দে রূপায়িত করেন। তিনি ডিভাইন

কমেডি রচিয়েতা দান্তের কাব্যপ্রচেষ্টার যে ধারা বর্ণনাটি দিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করব এবং দেখব কবি যে কল্পলোক, স্বপ্নলোক (ভ্যালেরীর ভাষায়) বা Logos-এর অধিষ্ঠানকেন্দ্র দেবলোক থেকে Logos তুল্য শব্দকে চয়ন করতে ব্রতী হয়েছেন, এ প্রক্রিয়াটি আসলেই রূপক এবং সর্বক্ষেত্রে কবিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বভাব কবি ও পরিশ্রমী কবিতে তফাৎ এই, একজনের চয়নপ্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং অপরিশোধিত। অন্যজন নিরলস প্রচেষ্টায় শব্দের নিষিদ্ধ বাগানে প্রবিষ্ট হন এবং যে শব্দ তুলে আনেন তারা ঐ পরিস্থিতিতে তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে, কোনো চূড়ান্ত বিচারবোধ সাপেক্ষে, পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় এবং খুব সীমিত সংখ্যক উদাহরণে, শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ অথবা এলিয়ট, অনন্য এবং অনুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে শব্দ যে বিশেষ সম্মিলনে অর্থবহ আমাদের অভিজ্ঞতায় তার চেয়ে উত্তম সম্মিলন আর নেই, এবং তারা যে ভাবনাকে মূর্ত করে তার অন্য কোনো শ্রেয়তর প্রকাশ আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো কবি একটি ভাষার প্রকাশের যাবতীয় সম্ভাবনাকে ধারণ করে আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনন্তের মধ্যে দণ্ডায়মান হন। তারা স্টাইনার বর্ণিত ঈশ্বর সদৃশ স্রষ্টা। আমাদের সীমিত জ্ঞানে অসীমকে আমরা যতটা না পাই, কল্পনা করি তার থেকে বেশি এবং যখন দেখি একজন কবির কবিতায় আমাদের কল্পনার অসীম মূর্তরূপে বিরাজমান, তাদেরকে স্রষ্টার উপাধি দিতে কোনো বাধা থাকে না। সকল যুগে কবিরা এ অসীম অনন্তকে পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন, অন্তত তার গোচরে এনেছেন।

দান্তের কাব্যপ্রচেষ্টার উদ্দিষ্ট ছিল ভাষার সম্ভাবনা যেখানে নিঃশেষিত, যেখানে আলো, সংগীত ও নীরবতায় বাঙ্ময় অঞ্চল প্রসারিত, সেই চির আরাধ্য স্থানে উত্তরণ। মানুষের শব্দের বাইরে, দান্তের জন্য ছিল ঈশ্বরের বাণীজগৎ। এ বাণীজগৎ বা topos হচ্ছে জ্যোতির্ময়। স্টাইনারের ভাষায় দান্তের পারাডাইসোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমূহ কাব্যিক এবং নৈতিক বিপদ সত্ত্বেও এক চূড়ান্ত শাব্দিক বিপ্লব ঘটানো। শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে এর চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দৈব অভিজ্ঞতাকে মানুষের ভাষায় ধারণ করতে গিয়ে

প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছে তাঁর ভাষা, তাঁর শব্দ, কিন্তু দান্তে তাঁর বিরল ও transcedent অভিজ্ঞতা মানুষের বোধগম্য ভাষায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই :

এক আলোকিত সম্ভাবনার মুখে দান্তে মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেলেন, তারপর অন্তর্লোকের সকল চিন্তাভাবনা একটি কেন্দ্রে এসে সুস্থির হলো, শুরু হলো একাগ্র ধ্যান এবং অতঃপর অজানা শব্দ-রাজ্যে নিজেকে সমর্পণ, এবং যে শব্দ-যোজনা একসময় তাঁর কাছেও অভাবিত মনে হয়েছে, সেই যোজনার সম্মুখীন হয়ে দান্তে ক্ষণকাল স্তব্ধতার আশ্রয় নিলেন এরপর শুরু হলো জ্যোতির্ময় বিশ্বের দ্বারোন্মোচনের পালা, সেখানে শব্দ অদ্ভুত সহজতা আর সারল্যে তাঁর করায়ত্ত হতে থাকল, যদিও শব্দের প্রয়োজনও তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হতে থাকল। একসময় কবি মানুষের শব্দকে অতিক্রম করে নিকটবর্তী হলেন Logos-এর এবং মানুষের ভাষা তাঁর অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ ধরতে না পেরে পিছনে পড়ে রইল। এ হচ্ছে অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত মুহূর্ত। এ মুহূর্তটিকে কোনো কবি ভাষায় ধরে রাখতে সক্ষম হন না, অন্তত যে ধারণে তিনি নিজে সন্তুষ্ট। এজন্য কবিদের কখনো পূর্ণতৃপ্তি আসে না, তারা চূড়ান্তের নিকটস্থ হতে পারেন, চূড়ান্তকে ধারণ করতে পারেন না : দান্তে অনুভব করেছিলেন ভাষার সম্ভাবনার পর আলো এবং সংগীতকে, চেষ্টা করেছিলেন অন্তত চূড়ান্ত মুহূর্তের একটি অভিজ্ঞতা স্ফূলিঙ্গকে মানুষের ভাষায় রূপায়িত করতে কিন্তু as its furthest reach, where it borders on light, the language of men becomes in articulate as is that of the infant before he masters words. Those who would press language beyond its dinively ordained sphere, who would contract the *Logos*into the word, mistake both the genius of speech and the untranslatable immediacy of revelation. They thrust their hands into fire instead of gathering light.

কোনো কবিই তাঁর অনুভবের অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপকে ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন না। কবিতা শুদ্ধ ভাষার শিল্প নয়, ভাষার অক্ষমতাকে অতিক্রম করে ভাবনাকে শিল্পরূপ দেওয়াই কবিতা

এবং এ প্রচেষ্টায় শব্দের ব্যবহারে ঐ ভাবনার রূপায়ণ প্রচেষ্টাই নিহিত নয়, ভাষার সম্ভাবনাকে ব্যাপ্ত করাও তার লক্ষ্য। প্রত্যেক কবি ভাষাকে ঋদ্ধ করেন তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী। এ প্রক্রিয়ায় ভাষাকে অসম্পূর্ণ ধারণা করা হয়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব থেকে পশ্চিমের সাম্প্রতিক ভাষাভিত্তিক সমালোচনায় সর্বত্র শব্দ নিয়ে প্রচুর উক্তি করা হয়েছে, তার একটি সারাংশ দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু লক্ষণীয় কবিতার ভাষাকে সর্বত্র আলাদা স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সব ভাষাই কবিতার ভাষা নয়, এমনকি চরম আধুনিক কবিতায়ও। একবার এ নিয়ে একটি বিষাদ উপস্থিত হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের মধ্যে, যদিও এক যুগবাসী ছিলেন তারা, একজন বড় হচ্ছিলেন অন্যজনের ছায়ায়। বিবাদের বিষয় ছিল: কবিতার ভাষা কি কথ্য ভাষা হবে? ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন, কবিতায় সাধারণ মানুষের নিত্য-ব্যবহৃত ভাষা থাকবে, তার নিজের কবিতায়ও তার ফলিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোলরিজ দেখালেন, এ আপাতসাধারণ ভাষাও কাব্যিক ভাষা। যেহেতু যে discourse ওয়ার্ডসওয়ার্থ উপস্থাপন করছেন তাঁর কবিতায়, তার প্রকৃত চরিত্রই সাধারণের ভাষা থেকে পৃথক। দান্তের মত সকল কবিই একটি পর্যায়ে ভাষাকে অপর্যাপ্ত ভাবতে বাধ্য হন। তখন অভিজ্ঞতা ভাবনাকে ধারণ করার জন্য নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করে, করতে হয় একান্তই, অতএব সেই ভাষা আর সাধারণের ভাষা থাকে না। তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাষা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন, তা কাব্যিক নয় প্রচলিত অর্থে, কিন্তু শেষ বিচারে কাব্যিক বটে; কারণ তাঁদের কবিতার প্রয়োজনে, সাধারণ ভাষার অক্ষমতার কারণে, যে বিশেষ ভাষায় তাঁরা লিখেছেন (সুধীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ভাষার তফাৎ, জীবনানন্দের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র) তার উদ্দেশ্য কবিতায় কোনো বিশেষ ভাবনাকে নিয়ে আসা, ঐ ভাবনার শব্দনির্ভর উন্মোচনই যদি কবিতা, তাহলে ঐ বিশেষ ভাষা কাব্যিক অবশ্যই।

৬.

কবিতা সৃষ্টির আদিতে শব্দ ছিল শোনার জিনিস, লেখার নয়, অন্তত অধিকাংশের জন্য। Phonetic বা ধ্বনিপ্রধান শব্দ নিয়ে লিখিত

কবিতায় শব্দের এক রূপ, মুদ্রিত শব্দে সাজানো কবিতার অন্য রূপ। অ্যাংলো-সেক্সন যুগের কবিতায় শব্দচয়নে ঝোঁকের ব্যবহার দেখি, অনুপ্রাস প্রধান-শৈল্পিক পদ্ধতি ঐ কবিতার। অ্যাংলো-সেক্সন কবির আবেদন শ্রোতার কানে, তাই শব্দকে ঐভাবে বিন্যস্ত করতে হয়েছে তাকে। ভাবনা তার প্রধান হলে কবিতার রূপ হতো অন্য। তিনি সর্বত্র কবিতা শুরু করেছেন Hwaet শব্দটি দিয়ে, যার অর্থ 'শ্রবণ কর'। শব্দকে শ্রোতা অনুভব করেছেন সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, শব্দের সিঁড়ি বেয়ে ভাবনায় পৌঁছেছেন, অথবা শব্দের আলো-আঁধারিতে হারিয়ে গেছেন। এও এক খেলা কবির। এলিজাবেথীয় যুগে কবিরা যখন লিখেছেন, শব্দকে লিখিত বা মুদ্রিতরূপে ভেবেছেন, পাঠক ঐভাবে পেয়েছে কবিতা, তাতে বাক প্রতিমা নির্মাণের কলাকৌশল সর্বাধিক। অকৃপণ ব্যবহৃত হয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা– উদ্দেশ্য পাঠকের শব্দ-চেতনাকে বিস্তৃত করা। আর বর্তমান শতাব্দীতে আরেক মাধ্যম দখল করেছে আমাদের চেতনার জগৎ দৃশ্যমাধ্যম। মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছেন, Phonetic শব্দকে স্থান চ্যুত করে যেমন মুদ্রিত শব্দ এসেছিল, তাকেও স্থানচ্যুত করতে উদ্যত দৃশ্যমান শব্দ। শব্দকে এখন আমরা দেখতে অভ্যস্ত, পড়তে নয়। অতএব কবিতায় শব্দ ব্যবহার পাল্টেছে।

ই. ই. কামিংস প্রমুখ যেন ম্যাকলুহানের বক্তব্যকে সপ্রমাণিত করছেন। এবং পশ্চিমের তথাকথিত graphic poetry-ও।

৭.

আর পশ্চিমের সাহিত্য-সমালোচনা, যা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ক্রমোগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত বর্ধমান, ঝুঁকে পড়েছে লিখিত শব্দের উপর। Text হচ্ছে এও সমালোচনা ধারার প্রধান উপজীব্য। সমালোচকরা কবিতার কাঠামোকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, তাদের মতে কবিতার আসল অর্থটি, যা আপাত অনেক অর্থের পিছনে কবিতার কোনো গূঢ় অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকতে পারে, একমাত্র শব্দের বিন্যাস বা শব্দ ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নে নিহিত। কবিতা তাদের মতেই সেই জিনিস, যা শব্দের স্তরে স্তরে চিন্তাভাবনা, অনুভবরূপে প্রকাশিত, কিন্তু শব্দের scaffolding ছাড়া

যারা অর্থহীন। ই. ই. কামিংস বলেন, "কবি সেই মানুষ যিনি অনুভব করেন এবং যিনি তার অনুভূতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।"

শুনতে সহজ মনে হলেও, কামিংস বলেন, এ মোটেও সহজ কথা নয়, কবিতা সম্পর্কে যেকোনো আলোচনা, বর্তমান আলোচনাটিসহ, একধরনের সারল্যে দুষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা সবাই জানি, সারল্যের পর আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে। কবিতা শব্দের সম্ভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোতসম্ভাব্য রূপ—এ সহজ অনুধাবনটি দেখা যাক text প্রধান কাব্য-সমালোচকদের কীভাবে চিন্তিত করেছে। দুটি সংজ্ঞা :

ক. কবির কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতামণ্ডলীকে সুশৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য দিয়ে স্বাধীনতা দেওয়া। এটি করতে হয় শব্দের মধ্য দিয়ে, যা অভিজ্ঞতার কাঠামোরূপে ক্রিয়া করে, যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সৃষ্টিকারী বোধগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সংহত হয়। এ সম্পর্ক সৃষ্টি নানাবিধ উপায়ে হতে পারে, তাদের সন্ধান করা ভাষাতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের কাজ। (আই. এ. রিচার্ডস, Pseudo-Statements)। কবিতায় বোধ অনুভূতি অভিজ্ঞতার সংহত রূপ লাভ হয় কী প্রকারে, অর্থাৎ শব্দের কোন ব্যবহারে, রিচার্ডস তার রহস্য উদ্ধারে উদ্যত।

খ. কবি কোনো বিমূর্ত বিষয়কে বেছে নিয়ে তাতে বিশেষ বর্ণনা প্রয়োগ করেন না, বরং বিশেষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি নির্বিশেষ বোধে উপনীত হন। এ বোধ অর্থবহ হয় বিশেষের মাধ্যমে ....এবং এভাবে শব্দ তৈরি করে বিশেষকে, অর্থাৎ কবির অর্থ নির্ভর করে শব্দের ওপর শব্দ নির্মিত উৎপ্রেক্ষার উপরে। (ক্লিনথ ব্রুকস Irony as a Principle of Structure)

ক্লিনথ ব্রুকস শব্দের বিশেষ রূপ ও বিশেষরূপের সমন্বয়ে একটি নির্বিশেষ বোধের কথা বলেছেন এবং এ প্রসেঙ্গ উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। কবিতায় চিত্রকল্প উপমা উৎপ্রেক্ষা ভাষার নির্মাণ হলেও চিত্রধর্মিতা তাদের চরিত্র তাহলে শব্দের গুরুত্ব চিত্রের পর হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রুকস আলোচনা প্রসঙ্গে

সমাধানটি এভাবে দিয়েছেন চিত্রকল্প ও উপমা উৎপ্রেক্ষার মতোই বোধের একটি বিশেষ প্রকাশ, কিন্তু সেই বিশেষ স্থানে অন্তরীণ হয়ে থাকলে তাদের আবেদন সঞ্চারিত হয় না কবিতার সর্বত্র। বিশেষ হয়েও তাদের নির্বিশেষ হতে হয়, অন্যথায় একটি কবিতায় একটিই উপমা ব্যবহৃত হতো। এবং এরা যখন নির্বিশেষ হয়, তখন ভাষাই একমাত্র মাধ্যম। অতএব ভাষা বা শব্দ চিত্রের চেয়ে শক্তিধর, কারণ চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত বা নস্যাৎ করার শক্তি রাখে শব্দ। শব্দের গুরুত্বটি এমনকি Imagist কবিরাও বুঝেছিলেন। তাদের ঘোষণাপত্রে এ রকম একটি দাবি ছিল : কবিতার প্রকাশের জন্য অপ্রয়োজনীয় এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

ফরাসি প্রতীকবাদীদের জন্য একটি কবিতাই ছিল একটি প্রতীক। আর Imagist-দের জন্য একটি শব্দ একটি Image বা চিত্রকল্প। পাউন্ডের কবিতা অথবা চৈনিক Ideogram, যার ভক্ত ছিলেন পাউন্ড এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গ. একজন কবি, যিনি সমালোচকও, টি. এস. এলিয়ট ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ সমকালীন কবিতা আমাদের যে পরিপূর্ণতা এবং উত্তেজনা দিতে পারে তা পূর্বের যেকোনো মহৎ কবিতা থেকেও অধিক।" কারণ কবি তার সমকালের ভাষা ব্যবহার করেন, ভাষায় সমকালকে ধারণ করেন, যার সঙ্গে পাঠকের সম্যক পরিচয়। কবিতার এ শব্দসচেতনতা, তার শব্দনির্ভরতার অন্য নাম। যদি ভাবনাই হতো কবিতার উপজীব্য, তাহলে ভাষার পরিবর্তন কেন? এবং যেকোনো পাঠক জানেন, একজন কবি শুধু সচেতনভাবে তার সমকালের ভাষাকেই ব্যবহার করেন না, তার শ্রেষ্ঠ ভাষাকে ব্যবহার করেন।

'কবিতা কী' এ প্রসঙ্গে আরেকবার ফিরে গিয়ে বলা যায়, কবিতা অনেক কিছুই, কিন্তু সর্বত্রই প্রধানত তা শব্দের উন্মোচন, বিস্ফোরণ, আবাহন, শব্দের অধিষ্ঠান। কবিতার মধ্যে মানে খোঁজার যে প্রবণতা, তা ভাষাকে ছাড়িয়ে গেলে বিপজ্জনক হয়। আবার ভাষা বা শব্দ বিভ্রান্ত করতে পারে পাঠককে। কবিতায় কথ্য ভাষা, খিস্তি খেউড় ব্যবহার করলেই তা আধুনিক হয় না, কোনো কোনো

সমালোচক যেমন মনে করেন, দেখতে হবে এর মাধ্যমে কবি কোন সত্যের সামনে যাচ্ছেন। কবিতায় ভনিতা থাকা সম্ভব নয়, গল্পে উপন্যাসে হয়তো সম্ভব : কারণ কবিতায় মিথ্যামিশ্রিত হবার সম্ভাবনা নেই। কবিতার discourse শব্দের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করে, কোনো ধ্রুব সত্য না হয়েও যা সত্য– এবং কবির মনোজগতের অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ময়লোক সেখানে ছেলেখেলার স্থান নেই, সেখানে খুব যে গাম্ভীর্য আছে, high seriousness তা-ও নয়; তবে ঐ জ্যোতির্ময়লোকে উত্তরণের প্রচেষ্টায় কবি অত্যন্ত একাকী নিঃসঙ্গভাবে আপন ও আন্তরিক হন। কবিতা কোনো Pose-এর ব্যাপার নয়, ভণ্ডামির নয়। কারণ কবিতা মানব অভিজ্ঞতার গোপনতম শ্রেষ্ঠতম উৎসার।

কবিতা কেন?

সবচেয়ে ভদ্র কবিকেও যদি ভুলক্রমে বলি আপনার কবিতাটি ভালো লাগেনি, কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেন; হয়তো বলে বসবেন না, তাতে কী আসে যায়। কিন্তু মনে মনে উত্তাপটি তিনিও আঁচ করতে পারবেন। প্রাচীন গ্রিসে নিয়ম ছিল, কবিতা পড়ে শোনানোর পর নানা প্রশ্ন করা হতো কবিকে এবং শ্রোতার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো তাকে, 'তাতে কী হলো' বলে চলে যাবার উপায় ছিল না। কারণ : কবিতা পঠিত/প্রকাশিত হওয়া মাত্র সর্বসাধারণের অধিকার এসে গেল ঐ কবিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার। আর যদি কারও মতামতের তোয়াক্কার প্রয়োজন না হয়, তো কবিতা অপ্রকাশিত থাকুক। বাজে কবি ও স্থূল সমালোচকের প্রসঙ্গ বাদ দিলে কথাটি এ দাঁড়ায়, কবিতা শুধু পাঠের জন্য নয়, চিন্তা করার জন্যও। কারণ শব্দের কাঠামো থেকে অর্থ উদ্ধার করে আনার সব দায়িত্ব পাঠকের নয়, কবিরও কিছু কর্তব্য আছে। তাই বলা যায়, সর্বাগ্রে, কবিতা প্রকাশের জন্য, কবি কবিতা লিখে সযত্নে তাঁর নামটি লিখে দেন শিরোনামের নিচে, পেটেন্ট লেবেল লাগানোর মতো, অর্থাৎ কবিতা ঐ কবির একান্ত, আর কারও নয়। কারণ কবিতা প্রচারের জন্যও।

এ দুই উদ্দেশ্য, প্রকাশ ও প্রচার যে নঞর্থক, তা মোটেও নয়, কবিতা যতই কবির ব্যক্তিগত হোক, যতই তার ভাষা হোক তার

নিজস্ব, এর ভাষাগত কাঠামোটি তার সমাজের, তার সমকালের, এর উপাদান দশজনের। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির একটি সম্পর্ক প্রকাশের জন্য যে discourse প্রয়োজন, তা-ই কবিতা। এবং প্রবন্ধটির শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল, একজন ভালো কবি অনন্ত ও অসীমকে শান্ত ও সসীমে রূপ দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেন; এ যে প্রাপ্তি, তা বহুজনের হওয়া চাই। কবিতার প্রচার তাই প্রয়োজন।

তবে প্রকাশ ও প্রচারের নঞর্থক দিক আছে অবশ্য। আল মাহমুদের কবি বলেছেন, দয়িতাকে পূর্বপুরুষেরা কবে ছিল কোন সম্রাটের দাস বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়, সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস এবং এর আগে আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনোকালে সঞ্চয় করিনি। পূর্বপুরুষেরা কেন, বিবেক বিক্রয় করে বাক্যের খোয়াড় এখনও বানান কোনো কোনো কবি। তবে, আগেই যেমন বলা হয়েছে, কবিতায় pose-এর স্থান নেই, এসব কবিতা পদবাচ্য হয় না, যেমন ঐসব কবিরা হন না কবি সম্বোধনের অধিকারী।

কবিতার উদ্দেশ্য কী– শুধুই কী আনন্দ নাকি একসঙ্গে আনন্দ ও অন্যকিছু–এ প্রশ্নে কয়েকটি স্কুল দাঁড়িয়ে গেছে। সোজাভাবে আমরা কলা-কৈবল্যবাদী ও উপযোগবাদী এ দুই শ্রেণিতে প্রধান দুটি ধারাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কবি-সহধর্মিণী বুঝিবা তার কলা-কৈবল্যবাদী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব–
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,

না মিলে শস্যকণা (পুরস্কার, সোনার তরী) দ্বাদশ শতাব্দীর কাব্যতাত্ত্বিক হেমচন্দ্র তার 'কাব্যানুশাসনে বলেন, কাব্য রচিত হয় আনন্দ, যশ এবং কান্তাতুল্য উপদেশ লাভের নিমিত্তে। আবার উপযোগবাদী কবিদের লেখায় সমাজ ও দেশের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হতে হবে। মার্ক্সবাদে যেমন সৌন্দর্যতত্ত্বকে, সাহিত্য ও শিল্পকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা হয়েছে– দেখা হয়েছে

যে শিল্প সাহিত্য শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ সূত্র ও সম্পর্কসমূহ থেকে উদ্ভূত নয়। বাইরে পৃথিবীর তথা সমাজের ও বিশেষ করে সমাজের উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের : সাথে তার একটি নিবিড় যোগাযোগ আছে সে-ও কার্যকরণের সূত্রে বন্দি। কাজেই শিল্প ও সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে শুধু শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। কবিতা, মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক এডর্নোর মতে, সমাজের সচেতনতাকে ব্যাপ্ত করবে, কবিতা প্রায়োগিক হবে; স্বর্ণশিখরবাসী কবিতা অধঃপতনের যুগের প্রতিভূ।

'কবিতা কেন' এ প্রশ্নের আলোচনায় যুগে যুগে নতুন প্রেক্ষিত স্থাপিত হয়েছে-নান্দনিক-আধ্যাত্মিক বিচারের যুগে কবিতার এক প্রয়োজন, সংঘাতের যুগে অন্য। কবিতার প্রতি পাঠকের দাবিও হয়েছে পরিবর্তিত। একথা সত্যি যে, কবিতা থেকে পাঠক যদি কিছু চায় এবং তা পায়-ও তাহলে কবিতাকে উপযোগী বলতে বাধা নেই। কিন্তু এ উপযোগিতার চেহারা যুগে যুগে পাল্টেছে। সিডনী বলেছিলেন, কবি পৃথিবীর তাম্রলিপ্ত চেহারা হিরন্ময় করে তোলে এবং শেলীর মতে, কবিরা হলেন বিশ্বের অঘোষিত আইনপ্রণেতা। সিডনী থেকে শেলী—এ দীর্ঘকাল কবিতা ছিল স্বর্গীয় একটি ব্যাপার, যার উৎস দৈব অনুপ্রেরণায়, কাজেই সমাজ বা সামাজিক প্রয়োজন এখানে অনুপস্থিত। এমনকি বিংশ শতাব্দীতে জর্জিয়ান কবিদের বেলায়ও প্রির‍্যাফ্রা লাইটদের কলা-কৈবল্যবাদের ঘোর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কবিতার সামাজিক দায় ও উপযোগিতার প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। বাংলা কবিতায় দীর্ঘদিন কবিতা আনন্দ ও রসের বস্তু হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতেও "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়," (আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে)। অর্থাৎ অনুভূতির সুন্দর ও শাশ্বত প্রকাশই কবিতা। কিন্তু ত্রিশের কবিদের 'আধুনিক' কাব্যপ্রচেষ্টার সাথে সাথে উপযোগিতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সকলেই যে এ প্রসঙ্গটি নিয়ে স্বস্তিতে ছিলেন তা নয়; জীবনানন্দ দাশের ভাষায় : "আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই... কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা,

কবির মনে প্রাককল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায়... তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না" (কবিতার কথা)।" লক্ষণীয়, জীবনানন্দ দাশ 'প্রাককল্পিত' শব্দটি দিয়ে যা বোঝাতে চাইছেন, তাকে আমরা অন্যত্র pose বলেছি, এবং এও বলেছি কবিতায় pose-এর স্থান নেই, কিন্তু কবিতা কি সচেতনভাবে মানুষের সমস্যার মীমাংসা জানায়? বা কবিতা কি আদৌ কোনো সমস্যার মীমাংসা জানায়? বা কবিতা কি আদৌ কোনো সমস্যার মীমাংসা দেয়? কবিতা প্রশ্ন সমাধানের জন্য নয়, কবিতা প্রশ্নের উৎসে পৌঁছানোর একটি পন্থা মাত্র। অন্যত্র জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন: "কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়; কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেশন, তা-ও নয়।" তাতো নয়, কারণ তিনি একটু পরে নিজেই বলেছেন, "কবিতা সকলের জন্য নয়", কবিতা সেই মৌখিক ঐতিহ্যের যুগেও লোকশিক্ষার বাহন ছিল না, এখন তো নয়, যখন কবিতা পাঠককে একটি স্তরে অন্তত শিক্ষিত হতে হয়। তাহলে কবিতা কেন?

শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ হলো, সেখানে কবির সচেতন প্রয়াসলব্ধ আবেগ অনুভূতিগুলোও একটি সহজ ও অ-সচেতন রূপ লাভ করে, মনে হবে যেন কবির চেতনার দূরপ্রান্তে কোন জ্যোতির্ময় লেখক থেকে তার উৎসার। তেমন কবিতা কবির ও তার সমাজের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, সমাজ ও কালের সত্যমূহকে ধারণ করবে, কিন্তু কোনোরূপ pose গ্রহণ করবে না, didactic হবে না। Didactic কবিতা, জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়, "পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া" প্রকাশক। যে কবিতায় মানুষ ও সমাজ আছে, সমাজের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা, উৎপাদনের সম্পর্কসমূহকে ধরে রাখার প্রয়াস আছে সে কবিতা যদি সত্যান্বেষী না হয়, শুধুই প্রোপাগান্ড হয়, তাহলে তা নিজেই বর্জ্য হয়ে যাবে; সময় তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে। কবিকে সমাজের ও সময়ের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হয়, কিন্তু সর্বোপরি বিশ্বস্ত থাকতে হয় নিজের কাছে। জীবনানন্দ এভাবে কবির এ বিশ্বস্ততাকে পরিমাপ করেছেন যে, "হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্য।"

সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্যই কবিতা।

উপসংহার :

এত কিছু বলার পরও কিছুই ঠিক বলা হলো না। আমরা আবার প্রথম কথাটির সম্মুখবর্তী হই, কবিতা কি? প্রাচীন মিসরে কবিতার একটি প্রতীক চিত্র ছিল একটি সাপ, যার লেজটি তার নিজের মুখে প্রবিষ্ট, অর্থাৎ বৃত্তাকার। কবিতা কিছু শেষ করে না, শুরুও করে না। এ আলোচনার ভূমিকার মতো উপসংহারটিও নেহাৎই আলঙ্কারিক।

একাল, কবিতা সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৭

মাইকেল মধুসূদন ও আধুনিকতা

১.

মধুসূদন যে কালে জন্মগ্রহণ করেছেন, শৈশব এবং কৈশোর কাটিয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন, বড় হয়েছেন, যে যুগের আলোবাতাসে নিজের নিভৃত চিন্তাবাসনাগুলোকে মুকুলিত হতে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন, বিদ্রোহ করেছেন এবং একসময়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবনকাল শেষ করে চিরবিদায় নিয়েছেন, সেই কালকে, এখন, এতদিন পর, সঠিকভাবে চিহ্নিত করাই সমস্যার বিষয়। ইংল্যান্ডে তখন ভিক্টোরিয়ান যুগ চলছিল; মধুসূদনের মৃত্যুর পর আরও দুই যুগের মতো রাণি তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (এই রাণি ১৮৭৬ সালে ভারত সম্রাজ্ঞীরূপে ভূষিত হয়েছিলেন) : পরাধীন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব করছে মার্তণ্ড-প্রতাপে। ডারউইনের নৃতাত্ত্বিক মতবাদসমূহ, মানুষের উদ্ভব সম্পর্কিত তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ভিক্টোরিয়ান যুগের অচঞ্চল বহিরাঙ্গকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে, আঘাত করছে এমনটি খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে, ব্রাউনিং ও টেনিসন, আর্নল্ড ও হকিন্স ব্যক্তির ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না, ফিরে যাচ্ছেন সমষ্টিতে এবং যদিও বিশ্বাস কাছের সত্যই ধ্রুব, সত্য আপেক্ষিক নয়, কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির নিরন্তর বিবাদকে মনের চিলেকোঠায় পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না। এদিকে শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগের প্রকট অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিক, আত্মিক সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে অর্থনীতিতে যে

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে, তাদের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে একের পর এক ছায়া ফেলে যাচ্ছে নানা ঘটনা, মতবাদ ও চিন্তা; এমনকি সারা ইংল্যান্ডে জনসংখ্যার উচ্চবৃদ্ধির মতো ঘটনাও সাহিত্যকে প্রভাবিত না করে যায়নি। বলা হয়, ডিকেন্সের প্রধান সব উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ-উপকরণ ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত নানা সমস্যা-অপরাধ-বৃদ্ধি যেমন (এবং কে না জানে অপরাধী ও অপরাধ মনস্তত্ত্বের এমন নির্ভুল রূপকার ডিকেন্সের পর ইংরেজি সাহিত্যে আর প্রায় দেখা যায়নি)। ইংল্যান্ডে উনবিংশ শতাব্দী আসলে ছিল এক দীর্ঘ ক্রান্তিকাল। একদিকে এক বিরাট মধ্যবিত্তশ্রেণির রোমান্টিক কবিবৃন্দ উল্লিখিত 'মনের ক্রমাগতি'র সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, অন্যদিকে সৃষ্টি হচ্ছে সমাজ, অর্থনীতি বিজ্ঞান, সাহিত্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া, ধর্মীয় মতবাদ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, ছাপাখানা; একদিকে নগরায়ণ ও সমষ্টিগত বসবাস, অন্যদিকে বৃহৎ পরিবারের পতন ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দ্রুত এবং অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের অমোঘ প্রভাবে এবং স্বকালেই যে আগামীকে সংবেদনশীল যে কেউ উপলব্ধি করতে পারছেন। এ যে আধুনিকতা, প্রবল জোয়ারের মতো তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সমস্ত ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার জন্য অপেক্ষার সময় ছিল উনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ আয়ুষ্কাল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিদের মধ্যেও আধুনিকতার সমূহ উপাদান ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, সচেতন অচেতনভাবে, বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়েছে। পিছনে তাকিয়ে আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি, ব্রাউনিং-এর ড্রামাটিক মনোলগের ঐতিহ্য না থাকলে এলিয়টের ইন্টেরিয়র মনোলগ কি সৃষ্টি হতো অথবা টেনিসন ব্রাউনিং-এর সমষ্টির প্রতি সমীহ প্রকাশিত না হলে কী সমাজকে আধুনিক কবিবৃন্দ এতটা নিদানিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন? হকিন্সের বিচিত্র ছন্দে কি আধুনিক কবিতার হৃৎস্পন্দন ধরা পড়ে না অথবা আর্নল্ডের বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে জয়েস

বা পাউন্ডের নানা জটিল উন্মোচন? আর যদি আমরা ইউরোপের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে আধুনিকতার অনেক নিদর্শনই সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করছে। দেখতে পাব– ১৮৩০-এর দশকের প্যারিসে avant grade বোহেমীয়বাদ, নীৎসে এবং এমিল জোলার লেখায় আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও তার নানা জিজ্ঞাসার সূত্রপাত, বোদলেয়ারের অপ্রকৃত শহুরে আধুনিক মানুষের অনিশ্চয়তার প্রতিধ্বনি এসবই পরবর্তী সময়ের পূর্বসংকেত। প্রকৃত সত্য এ যে, ঊনবিংশ শতাব্দী ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপে এক বিরাট আত্মজিজ্ঞাসার যুগ, আত্মউন্মোচনের যুগ; আবিষ্কার এবং জয়ের, পরাজয়ের এবং গ্লানির যুগ, যার প্রতিটি দশকে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো শিল্প-সাহিত্য-সমাজচিন্তা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে গেছে, যার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন অনেকেই। আবার জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো আদর্শবাদী দু'চারজন একে ভ্রান্তি ভেবেছেন, ভেবেছেন উন্মাদনা :

> "অতিরিক্ত আবেগ, সহিংস ঘটনাবলি, দানবীয়
> চরিত্রসমূহ আমাদের ক্যানভাস আকীর্ণ করে
> রেখেছে– পড়তে বসলে সংঘাত বাঁধে এসব
> অতিকায় এবং কাল্পনিক শক্তির সঙ্গে।"

মিলের সহমর্মী অনেকেই ছিলেন, যারা পরিবর্তনকে সহজভাবে নিতে পারেননি। আধুনিকতা, যা পরিবর্তনপন্থি, তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল। তবে সময় স্থির থাকে না, বিংশ শতাব্দী অমোঘ নিয়মের দরজায় ঘা দিয়েছে, এঁদের কেউ মেনে নিয়েছেন নতুন সময়কে, কেউ মানতে না পেরে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়েছেন। বাধা দিয়েছেন অনেকে, কিন্তু প্রবল জোয়ারের কাছে তাঁরা ছিলেন সামান্য খড়কুটো।

ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডে, মধুসূদনের জীবনকালে কী ঘটেছিল, এর এ দীর্ঘ বিবরণটি আমাদের কাছে বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয়। সত্বরই আমরা দেখব ভারতবর্ষে তখন কী ঘটছে, কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজে কী বর্ধন এবং পরিবর্তন এসেছে, বাংলা সাহিত্যেরই বা দশা কী। আধুনিকতা বলে যে অবস্থাকে আমরা জানি, তার কোনো ইঙ্গিত ঐ সময়ের সমাজে অথবা সাহিত্যে আমরা দেখি

কিনা। অন্য একটি কারণ : মধুসূদন আজীবন ইংরেজিভক্ত ছিলেন, শুদ্ধ মননশীলতার চর্চা ঐ ভাষাতেই হয়, এমন একটি ধারণা তার ছিল। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের একাগ্রচিত্ত পাঠক ছিলেন এবং ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহের—সাহিত্যিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক অবস্থার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন মধুসূদন। সর্বোপরি, মধুসূদনের আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণে ভিক্টোরিয়ান এবং তৎপরবর্তী প্রচুর উপাদান অনুষঙ্গের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা যেন দ্বন্দ্বে না পড়ি, এদের উত্তরাধিকারী (কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বাধিকারী) তিনি কী করে হলেন। কারণ এ কথাটি মধুসূদনের সাহিত্য পাঠে এবং তাঁর জীবনী বিশ্লেষণে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে, মধুসূদনের মানস তাঁর যুগকে অতিক্রম করে, আগামী যুগকে অনেকখানি ধারণ করেই গড়ে উঠেছে। কবির যে পৌরাণিক পরিচয় দীর্ঘদিন চলে এসেছে, যা রোমান্টিক কবিবৃন্দ, বিশেষ করে ব্লেইক, সোৎসাহে গ্রহণ করেছেন যে, কবি দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা, seer and creator, মধুসূদন সেই পরিচয়কে নতুনভাবে প্রতিভাত করেন। আগামীকে তিনি শুধু অনুভব করেননি, প্রত্যক্ষ করেছেন, আগামীর অনেক কিছু তাঁর বর্তমানেই সন্নিবেশিত করেছেন এবং একসময় ঐ আগামীরই একজন হয়ে গেছেন। এ প্রক্রিয়ায় মধুসূদন বিশেষ কোনো কালের থাকেননি আর, এ ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি বলে, বরং সকল সময়ে সমসাময়িক হয়ে থেকে গেছেন। আধুনিকতার একটি পরিচয় এ সর্বকালীন সমসাময়িকতা : চিরহরিৎ বৃক্ষের মতো, সময়ের শীত বসন্ত অথবা গ্রীষ্মের মতো, অকিঞ্চিৎকর বিভাজনকে যে বৃক্ষ সহজেই অস্বীকার করে অটল গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকে। মধুসূদনকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পথিকৃৎ, আমাদের প্রথম আধুনিক কবি। যদিও 'আধুনিক' শব্দটির সংজ্ঞাগত প্রচুর সমস্যা বর্তমান এবং এর প্রয়োগ নিয়ে নানান তর্ক উঠেছে। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কেন তিনি 'আধুনিকতা'র কোনো সংজ্ঞা দেননি, যে কারণে 'কোনো কোনো সমালোচক' তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন।[২] ভর্ৎসনা বরং ঐ সমালোচকদেরই করা উচিত, কারণ এ শব্দের একটি সর্বগ্রহণযোগ্য

সংজ্ঞা কেইবা দিতে পারে। আবু সয়ীদ আইয়ুব চেষ্টা করেছেন যদিও, বলেছেন, অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে, যে 'নতুন' যুগের মনন ও হৃদয়–প্রতিন্যাস যে সাহিত্যের আবর্জিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত সেই সাহিত্য আধুনিক কিন্তু সাথে সাথে বলেছেন, 'কাল তো দেশ ছাড়া নয়।' আইয়ুবের কৈফিয়ৎটিই বরং বেশি সমাধানসূচক। 'প্রথমত, 'আধুনিকতার' ধারণা স্বভাবতই গতিশীল, ধাবমান', লিখেছেন তিনি 'সেকালের যৌবনমদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম, পলিতকেশা; আবার একালের ঝকমকে আধুনিকতা পঁচিশ পঞ্চাশ কী একশো বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে। কালের যাত্রায় এ ধুলো ওড়ানো পথে কদাচিৎ এমন কবির আবির্ভাব ঘটে যিনি সত্যই কালজয়ী; স্বকালে তিনি আধুনিক বলে মান্য হয়ে থাকতে পারেন, নাও পারেন, হয়তো বা পরবর্তীকালের বার্তা মর্মে নিয়ে আগাম জন্মেছিলেন বলে নিজ দেশকালে পরবাসী হয়েই কাটালেন; কিন্তু দীর্ঘকালের সাহিত্যাকাশে এদের পক্ষধ্বনি শোনা যায়।'[৩] এ বর্ণনায় আমরা মধুসূদনকে পাই, রবীন্দ্রনাথ এলিয়টকে পাই, অথচ সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা নেই এখানে। আধুনিকতা, বড় অর্থে, কোনো সংজ্ঞার ব্যাপার নয়, পরিচয়ের ব্যাপার; কোনো বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়, সংশ্লেষণের ব্যাপার। আমরা বলতে পারি না একজন কবির অজ্ঞেয়বাদ বিশ্লেষণ করে, ঐ অজ্ঞেয়বাদের কারণে তিনি আধুনিক, বরং এ চিন্তার সাথে কবির কাল ও মানসকে তাঁর নিজের আর পরিচয়কে সংযুক্ত করে বলতে পারি, অজ্ঞেয়বাদ তাঁর আধুনিকতার একটি প্রকাশ। অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদী বলেই তিনি আধুনিক তা নয় (এলিয়টের মতো যুগপৎ বিশ্বাসী এবং আধুনিক কমই ছিলেন), বরং বলা চলে যে, আধুনিকতা ঐ কবির রচনায় প্রকাশিত, তার সাথে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে নির্লিপ্ততা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, তাকে তুলে ধরে বরং তাঁর সমূহ ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে। মধুসূদনের ধর্মান্তরকে অনেক সমালোচক উগ্র আধুনিকতাবাদ– যা ছিল তৎকালে ডিরোজিও রিডার্চসন প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল চক্রের উল্লেখযোগ্য পরিচিতি– বলে তিরস্কার করেছেন। এখানে আধুনিকতা শব্দটি মার খেয়েছে বিশ্লেষণের মনোভাবের জন্য। যদি ঐ সমালোচকবৃন্দ চেষ্টা করতেন মধুসূদনের ধর্মান্তরকে মেলাতে তাঁর চরিত্রের অন্যান্য প্রকাশের

সাথে, তাঁর মননশীলতার পূর্ণরূপ আবির্ভাবে এবং সংগোপন 'টাইটান' হয়ে যাওয়ার পথে, বায়রনসদৃশ এক রোমান্টিক বিদ্রোহী হয়ে যাওয়ার সাথে, সমাজ ও পরিবেশের অনেক ঊর্ধ্বে অভ্রংলিহ এক পৌরাণিক চরিত্র হয়ে যাওয়ার সাথে , তাহলে ঐ ঘটনাকে এত গুরুত্ব দিতেন না; একটি সঠিক প্রেক্ষিতে তাঁকে স্থাপন করতে পারতেন তারা, বুঝতেন যে আজীবন বিভিন্ন ভঙ্গি বা গ্রহণকারী মধুসূদনের আধুনিকতার মূলে ভণ্ডামি, ঔদ্ধত্য, ভ্রান্তি বা বিলাস ছিল না, ছিল সারল্য। সুন্দর ও অজ্ঞেয়, দূর এবং দুর্জ্ঞেয়–তাঁর পরিচিত পরিবেশের অত্যন্ত সাদামাটা এবং বিমর্ষ হওয়ার মতো পরিমণ্ডলের বাইরে এক অজানা কল্পলোকের সাথে সেতুবন্ধন যৌবনের কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে রচেছিলেন মধুসূদন, তার মূলে ছিল ঐ সারল্য, ছিল অপার বিস্ময়বোধ। ধর্মান্তর মর্মপীড়ার কারণ ছিল মধুসূদনের পিতামাতার, তাঁর সমাজের এবং অত্যন্ত পীড়াদায়কভাবে সমালোচকদের, (যাঁদের অনেকে বিংশ শতাব্দীর দায়িত্বশীল সাহিত্য সমালোচকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ)। কিন্তু তিনি নিজে কখনো এ নিয়ে চিন্তিত হননি। একবার বলেছিলেন তিনি

> 'as a jolly christian youth, I don't care a pin's head of Hinduism: I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry.[8]

কিন্তু ঠিক এর উল্টোটি কি বলতে পারতেন না তিনি? একজন হিন্দু যুবক হিসেবে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছাড়াই ইউরোপীয় মিথোলজির বিশাল অঞ্চলে বহুবার তিনি কী হারিয়ে যাননি এবং আক্ষেপ করেননি এ বলে যে, ইলিয়ডের মতো জীবনের এত পরিপূর্ণ প্রকাশ ভারতে কোনো পুরাণে দেখা যায় না? আবার এ শেষ কথারই কি উনিশ-বিশ হয়নি তাঁর জীবনে? সমালোচকরা দেখি আরও ভাবনা করেন, ভেবে ভেবে অকূল পাথারে পড়েন যে, যদি খ্রিষ্টান না হতেন মধুসূদন, তাহলে না জানি কত বেশি কাব্য মহাকাব্য উপহার দিতেন বাংলাভাষাকে। কারণ অর্থকষ্ট থাকত না তাঁর, খাঁটি বাঙালি কোন রমণীকে বিবাহ করে, ঈষৎ রাজনারায়ণদত্ত সুলভ জীবন হলেও অন্তত একটি 'রেগুলার' জীবনতো অতিবাহিত

করতেন তিনি। এসব সমালোচকই মদুসূদনকে বলে উগ্র আধুনিক, অসংযমী, অমিতাচারী এবং বিস্ময়করভাবে, তাঁদের ভঙ্গিতে এ ধারণা প্রকাশ পায় যে, মধুসূদনের আধুনিকতা ছিল লোক দেখানো ব্যাপার। আগেই বলা হয়েছে, মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে আলাদাভাবে দেখে অথবা আলাদা আলাদাভাবে জীবনকে বা সাহিত্যকে দেখলে, খণ্ডিতভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সর্বনাশা বাইজান্টাইন মোজাইক চিত্রের খপ্পরে পড়ব। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতি সামগ্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে নিশ্চয় প্রতিভাত হবে যে, তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ আধুনিক মানুষ, সম্পূর্ণ এবং বিপজ্জনক। কারণ তাঁকে ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে তাঁর চরিত্র দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। লক্ষণীয় এ যে, মধুসূদনের আধুনিকতাকে যাঁরা তাঁর নিজের সময়ে প্রকৃত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তাঁরা নিজেরাও একাধিক অর্থে ছিলেন আধুনিক– বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরচন্দ্র বসাক। তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর হলেও ওয়াল্টার পেটারের ভাষায়, এক 'quickened multiplied, consciousnesa'-এর অধিকারী ছিলেন, যা আধুনিক মানসের একটি চরিত্র লক্ষণ।

মধুসূদন সেই অর্থে আধুনিক ছিলেন, যে অর্থে হফম্যানস্থল আধুনিকতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'গ্যাব্রিয়েল ডি অ্যানানজিও' নামক প্রবন্ধে ১৮৯৩ সালে তিনি লেখেন :

> 'আজকে দুটো জিনিসকে মনে হয় আধুনিক : জীবনের বিশ্লেষণ এবং জীবন থেকে পলায়ন... একজন মানুষ তার মনোজগতের ভিতরবাসী সত্তাটিকে ক্রমাগত ব্যবচ্ছেদ করে, অথবা সে স্বপ্ন দেখে। স্মৃতিচারণ অথবা ফ্যান্টাসী, আয়নায় প্রতিফলিত চিত্র অথবা স্বপ্নকল্প। পুরনো তৈজসপত্র আধুনিক, আবার সাম্প্রতিক স্নায়ুবৈকল্যও..... পল বুর্জে আধুনিক এবং বন্ধুও; অনু বিভাজন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে বল খেলা (উভয়েই আধুনিক)। আধুনিকতা হচ্ছে একটি বোধ, একটি হিতচিন্তার বিশ্লেষণ এবং আধুনিকতা হচ্ছে প্রবৃত্তি; সৌন্দর্যের সকল প্রকাশের প্রতি, রঙের সুমিতির প্রতি, একটি উজ্জ্বল উৎপ্রেক্ষার প্রতি, একটি বিস্ময়কর রূপকের প্রতি প্রায় সুপ্তিভ্রমণরত মানুষের মতো আত্মসমর্পণ।

মধুসূদনের জীবনে ও সাহিত্যে বাস্তব ও স্বপ্ন ছিল সহঅবস্থিত। তিনি নিজে রূঢ় বাস্তবের দীর্ঘ ধূসর অঞ্চল মাড়িয়ে এসেছেন জীবনপরিক্রমায়। কিন্তু ক্রমাগত জীবন থেকে পালাতে চেয়েছেন। তাঁর মহাকাব্যিক চরিত্রসমূহের মতো তিনি আজীবন থেকে গেছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। পীড়িত এবং কাতর হয়েছেন স্বপ্নের আঘাতে, কিন্তু স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরেছেন মুক্তির উপায় হিসেবে। ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, 'A Vision'-এ একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যাকে মধুসূদনরূপে কল্পনা করতে পারি, অ্যালের মতো যে স্বপ্নতাড়িত এবং যার বাস্তব অবস্থা যত নাজুক হয়, যত সমস্যা-ক্লান্ত হয় প্রতিদিনের জীবনে তার স্বপ্ন তত উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয়; শেষপর্যন্ত স্বপ্নই তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব। এভাবে স্বপ্নের একটি নিজস্ব পৃথিবী নির্মিত হয়েছে মধুসূদনে, যার সাথে যোগ হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অনুষঙ্গ এবং সবশেষে এ পৃথিবীটিই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক স্বাপ্নিক পুরুষদের মতো তাঁর কাছে এ পৃথিবীর রূপ স্থির ও অচঞ্চল থাকেনি; ক্ষণে ক্ষণে তা পাল্টেছে। একবার তা বিলাত বা Alibion, সেই স্বপ্নরাজ্য, অনেকবার ইতালি, কখনো কাব্যের কোনো অলকাপুরী, কখনো নিজের ছোট সংসার। সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠিও কি একটি মাত্র ছিল? হিন্দু কলেজে প্রথমে 'টাইটানিক' আত্মসচেতনতাকে মনে হয়েছে এ মন্ত্রপূত কাঠি, অন্য সময়ে খ্রিস্টধর্ম এবং সৌভাগ্য আমাদের, দীর্ঘসময় তাঁর ধারণা ছিল এক বিরল সাহিত্যকৃতি তাঁকে দেবে ঐ রাজ্যে প্রবেশাধিকার। হফম্যানস্থলের ধারণা অনুযায়ী জীবন-বিশ্লেষণ ও স্বপ্নে পলায়ন মধুসূদনের সাহিত্য সৃষ্টি এবং জীবন পরিক্রমার ছিল মূল চালিকাশক্তি।

মধুসূদনকে ভুল বোঝা হয়েছে তাঁর অতিমাত্রিক 'আমিত্বে'র জন্য, যাকে আত্মম্ভরিতা অথবা আত্মাদর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে মধুসূদনের আমিত্ব ভিক্টোরিয়ান যুগের সমাজমনস্কতার বিচারে ভারতে কেন ইংল্যান্ডেও বিস্ময়কর মনে হতে পারে। রোমান্টিক যুগে, বায়রন শেলীর ঐতিহ্যে এ আমিত্ব সামান্য এবং স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু ভিক্টোরিয়ান মানসিকতা ছিল ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিপন্থী। ১৮৮২ সালে ইবসেনের 'এন এনিমি

অফ দি পিপল' নাটকে দীর্ঘদিন পর প্রথম ড. স্টকম্যানের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: 'আমিও সঠিক–আমি এবং আমার মতো আরও দু'একজন,' এবং ভিক্টোরিয়ান নির্লিপ্ততাকে সরাসরি আক্রমণ করে বললেন ইবসেন, তাঁর ঐ চরিত্রের মুখ দিয়ে, যে একটি সত্যের স্থায়িত্বকাল মাত্র সতেরো-আঠারো বছর; তার বেশি নয়। এ ছিল অনেকটা যুগান্তকারী ঘোষণা। অথচ মধুসূদনের 'আমিত্ব শুধুই তাঁর চিঠিপত্রে নয়, তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত কোনো সচেতন ঘোষণার বিষয় ছিল না; ছিল একটি চরিত্রগত প্রকাশ। আধুনিক মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে, নিরক্ত নিরাসক্ত হতে পারে, জীবন থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু অচেতন নয় সে। নিজেকে নিয়ে তার সমস্যা–তার যত জটিল সমীকরণ যাদের মেলানো এক দুরূহ ব্যাপার তার জন্য, তার সবই ঐ নিজেকে নিয়ে, আমিত্বকে নিয়ে নিরন্তর বিবাদ থেকে উদ্ভূত। আধুনিক কবিতার নানা ব্যক্তিত্বরা এলিয়টে, ইয়েটসে, পাউন্ডে জীবনের অভ্যন্তরে নিজেদের আক্রান্ত পর্যুদস্ত সত্তা থেকে পালাতে চায়, মুছে ফেলতে চায় অস্তিত্ব। কিন্তু তা যে সম্ভব হয় না, সেই সমস্যাই তার জন্য অ্যাপোকালিপটিক হয়ে দাঁড়ায়।

মধুসূদনের আমিত্ব যে এক ভুল বোঝাবুঝির সূচনা করেছিল তার মূলে ছিল তাঁর সঙ্গে তৎকালীন সাহিত্যে ও সমাজে প্রতিফলিত মানসের সুদীর্ঘ ফারাক। বাংলা সাহিত্যে তখন, ঐতিহাসিক অর্থে, সবেমাত্র মধ্যযুগের শেষ এবং উত্তর মধ্যযুগ, যাকে আধুনিক যুগ বলা যাবে কিনা এ নিয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্ব সবেমাত্র শুরু। ইংল্যান্ডে মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগের মাঝখানে দুটি মস্ত আন্দোলন হয়েছে। একটি রেনেসাঁ, অন্যটি রোমান্টিক মতবাদের উত্থান ও ব্যাপ্তি। এ দুই আন্দোলন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে, ধ্রুপদী যুগের নৈর্ব্যক্তিকতা ও শৈলীর কঠোর নিয়ম শাসন থেকে যা সাহিত্যকে মুক্ত করেছে। যখন ব্যক্তির প্রকাশ হলো বাধাবন্ধনহীন তখনই তার সার্বিক বিকাশ, বর্ধন ও উত্তরণ সূচিত হয়েছে। আধুনিকতা তাই এ দুই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। মধুসূদনের সেরূপ কোনো ঐতিহ্য ছিল না, তাঁর কোনো পূর্বসূরী ছিলেন না। তিনি কবিতা ও নাটক লিখেছেন, গদ্য লেখেননি, যদিও তাঁর কবিতাতেই সবচেয়ে

চমৎকার গদ্য রচিত হয়েছে। লিখলে তাঁকে পাশ্চাত্যের কাছে ধর্না দিতে হতো এবং গ্রহণের সঙ্গে নিজের সৃষ্টিশীলতার আল-কেমি সহযোগে যা তৈরি করতেন তাতে বিশ্ববাসী না হলেও বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই চমৎকৃত হতো (এই বিশ্ব চমৎকৃত করার বাসনা থেকে তাঁর কাব্য প্রয়াসের শুরু)। তাঁর আধুনিক মানস পরিপার্শ্বকে যখনি বৈরী ভেবেছে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, পরিবর্তে ভিতরবাসী সত্তাটিকে গূঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করে, জীবনের অন্যান্য প্রকাশের সাথে তাকে মেলাতেই বেশি উৎসাহী হয়েছে। এজন্যই কবিতা, এজন্যই মহাকাব্য।

কিন্তু রোমান্টিকতার কিছু ঐতিহ্য ছিল মধুসূদনের, আর রেনেসাঁর যুগের অন্যতম প্রবল পুরুষ তিনি নিজেই ছিলেন (এখানে রেনেসাঁ বলতে মধুসূদনের সমসাময়িক উত্থানটি এবং তাঁর মনোজগতের ব্যতিক্রমী উত্থান–যার সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রবন্ধন ছিল–উভয়কেই বোঝানো হয়েছে)। তাহলে তাঁর আমিত্ব প্রকাশে বাধা ছিল কোথায়? এবং এ আমিত্বকেই আমরা রোমান্টিক ও রেনেসাঁধর্মী আমিত্ব না বলে আধুনিক বলছি কেন? এর উত্তর মধুসূদনের যুগের কারও জানা থাকার কথা নয়, যদি থাকে তাও ভবিষ্যপড়ুয়ার বিশেষ ক্ষমতাবলে; কারণ মধুসূদনের চরিত্রের যে স্ববিরোধিতা ছিল, হ্যাঁ-না'র প্রবল দ্বন্দ্ব এবং পরস্পর কলহে রত বিভিন্ন প্রকাশ, তার সাথে মিল ছিল তাঁর পরের এবং বিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যকদের। এ কথা সত্যি যে স্ববিরোধিতা এবং বিভিন্ন বিপরীতধর্মী প্রকাশের একটি যৌগিক সংশ্লেষণ সাহিত্যে নতুন নয়, হেরাক্লিটাস থেকে জিওর্ডানো ব্রুনো হয়ে শেলী-গ্যেটে পর্যন্ত এ উদ্যোগ পরিলক্ষিত। কিন্তু আধুনিক মানুষের সম্মিলন প্রচেষ্টা বিশিষ্ট এজন্য যে, সে শুধু বিপরীতধর্মী কিছু প্রকাশ ও তাদের ঐক্য নিয়েই ভাবিত নয়, বরং বিভিন্নতাকে একত্রে গ্রথিত করার দুটি আলাদা এবং বিপরীতধর্মী পথের সম্মিলনও তার কাম্য। যে হেগেলীয় সংশ্লেষণে এ বিভিন্নতা আলাদা অস্তিত্ব হারায়, সেই সংশ্লেষণে বিপরীতার্থক পদসমূহও একই সঙ্গে লুপ্ত হয়। মদুসূদনের জীবনে যেমন তাঁর বিহরঙ্গ দেখে অনেকেই তাঁর স্বজাত্যবোধকে সন্দেহ করতেন, অথচ মধুসূদন আজীবন একান্ত বাঙালি থেকে গেছেন। বস্তুত ঢাকাবাসীর দেওয়া সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার

সম্বন্ধে আর যেকোনো ভ্রমই হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখনই বলবৎ হয়, অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙালি নহি, আমি বাঙাল, আমার বাটি যশোহর। কিন্তু অন্যান্য সময় তাঁকে সাহেব ধারণা করার সকল সুযোগ অন্যদের তিনি নিজেই তৈরি করে দিয়েছেন। একদিকে ঋণগ্রস্ত, অন্যদিকে অমিতচারী, একদিকে ইংরেজির প্রতি প্রবলভাবে অনুরক্ত, অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি সমূহ দুর্বলতা, এভাবে পরস্পরবিরোধী অনেক প্রকাশে ও চিন্তায় তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। এতে সাধারণ পাঠক তাঁকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, যদিও তাঁর সাহিত্য পাঠের জন্য এতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আর সাহিত্যেও মধুসূদনের বিচিত্র বহু স্ববিরোধী– 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সীতার চরিত্র চিত্রণে,[৬] রাম ও রাবণের বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলোকে অনেকটা স্বেচ্ছায় অস্পষ্ট করে তোলাতে, শৈলীর ধ্রুপদী শাসনের পাশাপাশি অত্যন্ত রোমান্টিক সুরে প্রকৃতিবন্দনা বা চিত্ররচনার প্রাবল্যে; গুরুগাম্ভীর বিষয়ের উন্মোচনে সাদাসিধে, এমনকি কথ্যভাষার প্রয়োগে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রামের চরিত্রের 'সমুন্নতি' সত্ত্বেও রাম ও তাঁর দলবলকে ঘৃণা করে রাক্ষসকুলকে উচ্চাসন দানে (অসংখ্য উদাহরণের এ মাত্র কয়েকটি) যে ভারসাম্যতার হানি হয়, তা পাঠক-সমালোচককে ভাবিত করেছে। তবে একটি স্থানে মধুসূদন যে irony-র প্রশ্রয় নেন, তাতে বোঝা যায় এসব স্ববিরোধ শেষ বিচারে একটি চরম সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাই সৃষ্টি করে। 'মেঘনাদবধ'-এর ৬ষ্ঠ স্বর্গে আছে–

> রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
> নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
> কহিলা বীরেন্দ্র বলী, "ধর্মপথগামী"
> হে রাক্ষসরাজজানুজ, বিখ্যাত জগতে
> তুমি; – কোন ধর্মমতে, কহ দ্বাসে, শুনি,
> জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি–এ সকলে দিলা
> জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।

মধুসূদন নিজেকেই কি গঞ্জনা দিচ্ছেন এ স্থানে, নাকি শাস্ত্রকে এক হাত নিচ্ছেন অজ্ঞতা ও মূঢ়তার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে? বস্তুত মধুসূদন-সাহিত্যে এসব আত্মবিশ্লেষী অথচ আপাত নিরীহ উক্তি নিতান্ত কম নয়, শেষ বিচারে যারা এক স্বাপ্নিক কবির নিজেকে প্রত্যক্ষণ করার একটি সাগ্রহ প্রচেষ্টাকেই প্রতীয়মান করে।

মধুসূদনের চরিত্রে আরেকটি স্ববিরোধ চোখে পড়ে– তাঁর চিঠিপত্রে। এ চিঠিপত্রে তিনি একাধারে আন্তরিক এবং মেকি, কাছের এবং দূরের। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত জন, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে লেখা চিঠিতে মধুসূদন নিজেকে যতটা প্রকাশ করেছেন, আর কোথাও ততটা নয়, সম্ভবও ছিল না। কিন্তু চিঠিপত্রগুলোর ভাষা ও ফর্ম আন্তরিকতার বিপক্ষে। তিনি এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব ইংরেজিতে কেন পত্রালাপ করতেন এ প্রশ্নটি এখন অবান্তর। কারণ তাঁদের যুগের যে পরিবেশ এবং গঠন ছিল, যে বিন্যাস ছিল, আবহাওয়া ছিল, তাতে শিক্ষিত মানুষজন ঐ ভাষাতেই যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহী হতেন। মধুসূদনের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি কেন ইংরেজি বিষয়ে নয়, বরং প্রশ্ন ওঠে যে ইংরেজি তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে। তাঁর চিঠিপত্রগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ম্যানারিজম দ্বারা এসব চিঠিপত্র চিহ্নিত, তা ধার করা এবং অবশ্যই তাঁর মৌলিক নয়। মধুসূদন নিশ্চয়ই ইংরেজি epistolary ঐতিহ্যের ধারা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং চিঠিপত্র তিনি ইংরেজের স্বাভাবিক সৌজন্য ও আলাপচারিতা, তাদের উইট ও হিউমার এবং বিশেষভাবে একটি সুমিষ্ট ভাষণ–এমনকি অমধুর অনেক বিষয়েও– বাগে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। ভারতীয় নামের যথেষ্ট ইংরেজি প্রতিবর্ণকরণ চোখে পড়ে (কৃষ্ণকুমারী হয়েছেন Kissencumari, ঈশ্বরচন্দ্র Issur Chunder) এবং যতটা সম্ভব ইংরেজ-আবহাওয়া বিস্তার করতে পরিশ্রম করেছেন এসব চিঠিপত্রে। পড়লেই বোঝা যায় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত নয় এসব চিঠি, যেন কোনো তৃতীয় পাঠককে, যিনি খাঁটি ইংরেজ, লক্ষ্য করে এসব লেখা। এর কারণ কী? ভারতীয় নামই আমূল বদলে ফেলা, বন্ধুবান্ধবকে ইংরেজ ইয়ার-দোস্তি প্রথায়, Old boy, Old cock এসব সম্বোধন– নিশ্চয়ই প্রকৃত

মধুসূদনকে তুলে ধরে না। মধুসূদনের শ্রমসাধ্য চিঠিপত্র বিনিময়ে যে উদ্দেশ্যটি প্রধান, তা হলো কল্পনায় একজন কীটস বা বায়রন অথবা কার্লাইল হওয়া, যাঁদের চিঠিপত্রের ধাঁচ ও ভাষা অনেকটা মধুসূদনের সঙ্গে সমগোত্রীয়। তিনি নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক–ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন এবং মিল্টন, কীটস, বায়রনের ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসেবে যা কিছু করণীয় তাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র যেহেতু কোনো ইংরেজ পড়েনি বা পড়ার কথাও ছিল না, গৌর বসাক বা রাজনারায়ণকে বাংলায় চিঠি লিখলে কোনো ইতর বিশেষ হতো না। কোনো সমালোচক যদি এসব বিবেচনায় তাঁকে অভিযুক্ত করেন তাহলে মধুসূদনের আমিত্বের একটি বিশেষ প্রকাশ ও তাঁর স্ববিরোধিতার একটি স্তরকে অবহেলা করা হয়। মধুসূদন চিঠিপত্রে শুধু নয়, তাঁর ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত সাহিত্য সৃষ্টি থেকে তাঁর আধুনিক মানসের একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় বেরিয়ে আসে যা জর্জ স্টাইনার কথিত Unhoused লেখকেরই একটি পরিচয়। স্টাইনার তাঁর 'এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল' গ্রন্থে (১৯৭২) এরূপ লেখাকে আমাদের কালের একজন বিশ্বস্ত প্রতিভূ বলে উল্লেখ করেছেন। এ শতাব্দীর পাউন্ড, বেকেট বা নবোকভের মতো লেখকদের মতো মধুসূদন ভাষাকে একদেশবর্তী বা কোনো সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার হিসেবে দেখেননি; তার দ্বিভাষী রচনা মূলত আধুনিক শিল্পীর নান্দনিক আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বাক্ষর। এক্ষেত্রে লেখক নিজের কাছেই বেশি বিশ্বস্ত; কোনো পাঠক তাঁকে পড়ল কিনা, এ প্রশ্নটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না তাঁর কাছে।

মধুসূদনের যে আমিত্ব এ চিঠিপত্রে সুস্পষ্ট, অথবা আমিত্বের যে প্রকাশটি, তা হলো, সমালোচকের ভাষায়, তাঁর আত্মাদর, তাঁর megalomania. মধুসূদন যে যুগে জন্মেছিলেন, যে পরিবেশে কাজ করছিলেন, তাতে যেকোনো শিল্পীই বিনয়ের সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি সামাজিক অনাচার ও ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর কাজকে যৎসামান্য এবং শুধু চেষ্টা মাত্র, এভাবে দেখেছেন।

সেখানে মধুসূদন অনেকটা দুর্বিনীতভাবে, একাধিকবার তাঁর সর্ববৃহৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন বিশ্বের স্মরণযোগ্য কাব্যসৃষ্টির, গ্রিক কিংবদন্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিস্থাপন করার। 'শর্মিষ্ঠা' প্রসঙ্গে বলেছেন, "এ শর্মিষ্ঠা আমাকে অন্য সবার আগে স্থান দিয়েছে।"[৭] চিঠিপত্রে নিজের মেধা ও সম্ভাবনাকে কোথাও খাটো করে দেখাননি সৌজন্যের খাতিরে, বরং প্রতিদিনের ভাষায়, যাকে মনে হবে বড়াই করেছেন। লক্ষণীয়, নিজের সম্পর্কে এক ধরনের অহংকার, যে তিনি সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আসলে তিনি দূরবর্তী কোনো কালের মানুষ, অনেক চিঠিপত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে। নাট্যকার হিসেবে নিজেকে ভাবতেন too early for his age.[৮] 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি নন্দিত হবে বিশ বছর পর, কারণ সবাই বাংলা শিখতে শুরু করেছে, এ উক্তি অবলীলায় করেছেন। নিজের কাব্যসৃষ্টি, নাটক, নাটকের চরিত্র এসবকে অকপটে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। তাতে সমসাময়িক অনেক সমালোচক বা পরিচিতজনেরা রুষ্ট হয়েছেন সন্দেহ নেই, বিনয়ের অভাব থেকে এসব উঁচু দাবি উচ্চারিত হয়েছে ধরে নিয়েছেন। বড় কথা, মধুসূদনকে বুঝে উঠতে অসুবিধা হয়েছে।

কিন্তু যে মানুষ ব্যক্তিজীবনে এতটা নিরহংকারী এবং অমায়িক, বন্ধুবৎসল এবং মৃদুভাষী, তিনি নিজের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে এত জোরগলায় চেঁচিয়ে কোন সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং কেনইবা? এর উত্তর নিহিত মধুসূদনের আধুনিক মানসের একটি আত্মপ্রকাশে।

ম্যালকম ব্র্যাডবারী ও জেমস ম্যাকফারলেন তাঁদের সম্পাদিত 'মডার্নিজম' নামক গ্রন্থে আধুনিকতার পরিচয় লক্ষণগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, একজন আধুনিক শিল্পীর অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে তাঁর self-signature. প্রধানত তা স্টাইলের ব্যাপার, যে স্টাইল-সন্ধান হয়ে দাঁড়ায় একটি সচেতন প্রয়াস। তাঁদের ভাষায়–

> 'The search for a style and typology
> becomes a self-conscious element in the modernist's literary production; he is perpetually engaged in a

profound and ceaseless journey through the means and integrity of art.'

এভাবে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সফল, তাঁরা সকলেই নিজেদের নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী একটি কাঠামো তৈরি করে নেন যাতে তাঁর স্বাক্ষরটি একান্ত নিজস্বতা নিয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিন্তু সচেতন শিল্পীর নিজের সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই, চাই নিজের সম্ভাবনা ও শক্তি, সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। আমাদের কালের যেসব বিখ্যাত শিল্পী মধুসূদনের মতো ঘোষণা দিয়ে মহৎকর্ম সৃষ্টিতে নিয়োজিত, যেমন জেমস ও পাউন্ড, পিকাসো এবং ডালি এবং আরও অনেকে, তাঁদের অনেকেই বলবে magalomaniac, আত্মম্ভরী। অথচ মহৎ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আসে আত্মার অমিত সম্ভাবনাকে সম্যকরূপে ধারণের মধ্য দিয়ে।

মধুসূদনের প্রধান চরিত্ররাও এক অর্থে magalomaniac. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামের চরিত্র রাক্ষসদের পাশে এতটা পাংশু কেন, তার কারণ তার চরিত্রে magalomania নেই, যা আছে রাবণের চরিত্রে। ঐ কাব্যটির চিত্রকল্প পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যাবে সচেতন-অসচেতন কতভাবে রাবণকে জীবনাপেক্ষা বৃহৎ দেখানো হয়েছে, আর রামকে জীবনের সমান। রাবণের সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত উত্থান এবং আরোহণের চিত্রকল্প শিখর ও আকাশবাসী চেতনা। বস্তুত 'উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে' একটি archetypal চিত্রকল্প, 'মেঘনাদবধ'-এর ক্ষেত্রে।

রাবণ রাজার যুদ্ধ প্রস্তুতির একটি দৃশ্য :
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;
বাজিছে রণ-বাজনা, গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক বিভা।

সমতল থেকে যে আয়োজন শুরু হয়, তার বিস্তার হঠাৎ করে হয় ঊর্ধ্বগামী– রেশমি কাপড়ের নিশান থেকে সবশেষে আকাশে,

যেখানে সুবর্ণ বর্মেরচ্ছটা সূর্যের জৌলুসের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে দৃষ্টি ধীরে ধীরে সমতল থেকে উন্মার্গগামী, যাতে সমুন্নতির প্রসঙ্গটি অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ উদাহরণ অসংখ্য আছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'; কিন্তু এর মাধ্যমে মধুসূদনের আকাশচুম্বী কল্পনা এবং উর্ধ্বগামী আমিত্বের একটি সংযোগ সাধিত হয় এবং স্বভাবতই শক্তির প্রকাশ রাবণের ক্ষেত্রে শব্দ ও চিত্রকল্পকে যুগপৎ ধারণ করতে পারে বলে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়। এজন্য রাবণের চরিত্রেই মধুসূদন চিদ্‌মুক্তির আভাস পান। এ ব্যতিক্রমী চিদ্‌মুক্তি আধুনিক একজন মানুষের জন্য অপরিহার্য।[১০]

২.

এ পর্যন্ত আলোচনায় যদি মনে হয়, মধুসূদনকে তাঁর সময়কাল থেকে সরিয়ে এনে বিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকদের সারিতে বসিয়ে, এঁদের সম্পর্কে প্রযোজ্য মাপকাঠি বা শর্তানুযায়ী তাঁকে বিচার করা হচ্ছে এবং এভাবে তাঁকে আধুনিক প্রমাণ করা হচ্ছে, তাহলে প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে গুরুতরভাবে ভুল বোঝা হবে। সত্য যে, এ প্রবন্ধের চিন্তা-প্রক্রিয়ায় এ তুলনামূলক বিচারটি অপরিহার্য। কারণ আধুনিকতাবাদকে যদি একটি আন্দোলন হিসেবে আমরা দেখি, তাহলে বিংশ শতাব্দীতেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং উৎসার। কিন্তু এ তুলনামূলক বিচারে মধুসূদনকে অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত করে দেখার কোনো প্রয়াস নেই, বরং তাঁর যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করে তাঁকে অবলোকন করা হচ্ছে। আধুনিকতাবাদ একটি বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন হলেও আধুনিকতা কোনো সময় বা কাল-নির্দিষ্ট-অবস্থা বা গুণ নয়, সকল যুগেই এর প্রকাশ, যদিও প্রকাশের বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। মধুসূদন আধুনিক ছিলেন তাঁর মেধা ও বুদ্ধির অপূর্ব স্ফূরণে, স্বকালের সাথে তাঁর অসংখ্য পার্থক্য ও কলহের জন্য, তাঁর জীবন ও সৃষ্টির দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় প্রকাশের জন্য, তাঁর সাহিত্যের যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য। তাঁর জন্য আধুনিক হওয়াটা অনেক বেশি বিস্ময়কর ছিল, যতটা ছিল একজন বোদলেয়ার বা ইবসেন অথবা এমিল জোলার জন্য। কারণ মধুসূদনকে তিন চার শতাব্দীর ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে মাত্র কয়েক দশকে আত্মস্থ করতে হয়েছে এবং তার পাঠকের কাছে পৌঁছাতে হয়েছে। এজন্য যে appropriate style তিনি উদ্ভাবন

করেছেন, তার পিছনে প্রয়াস ছিল সচেতন। এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাই ধরা যাক; যাকে appropriate বললেও বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে বোঝানো যায় না। 'তিলোত্তমাসম্ভবা কাব্য' রচনাকালে মধুসূদন যে একটি নতুন ছন্দের বিস্ফোরণ ঘটালেন যে ছন্দে জীবনের কঠোর ও কোমল উভয় প্রকাশ সম্ভব, যা ভাবকে শক্তি দেবে, তাকে নুয়ে পড়তে দেবে না, সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। কিন্তু ইংরেজি ব্ল্যাঙ্ক মিল্টন পর্যন্ত আসতে প্রায় একশ' বছর সময় নিয়েছে। সেই কিড ও মার্লো থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র ও স্পেনসার পর্যন্ত অনেক কাব্য ও নাট্যগুরুর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে এ ছন্দটি এবং রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে এর বিকাশ ঘটেছে। বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষরের ঐতিহ্যমাত্র ছিল না। মধুসূদনের সেই বিখ্যাত উক্তি যে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ব্যবহৃত না হলে বাংলা নাটকের কিছুতেই উত্তরণ হবে না, পরোক্ষে এটাই প্রমাণ করে যে প্রচলিত ছন্দরীতি (কাব্যে রচিত) নাটকের জন্য মোটেই উপযোগী ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মধুসূদন যা করেছিলেন, তার একটি সার সংক্ষেপ করলে এ দাঁড়ায় :

১. কাব্যে ও নাটকে জীবনের কঠিন ও কঠোর প্রকাশ সহজসাধ্য করেছিলেন

২. তাঁর সকল প্রকাশের ওপর ঈপ্সিত শৈল্পিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৩. মধুসূদন ইংরেজি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের একটি প্রতিপক্ষ বাংলায় সৃষ্টি করেছিলেন এবং ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের সকল গুণই ঐ ছন্দে বজায় রেখেছিলেন।

৪. যে ঐতিহ্য ইংরেজি সাহিত্য কয়েকশ' বছরের' মধুসূদন এককভাবে তা মাত্র কয়েকটি রচনার ব্যবধানে সৃষ্টি করেছিলেন।

এবং সর্বোপরি,

৫. তাঁর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্য একটি appropriate style তিনি তৈরি করেছিলেন।

আবারো মধুসূদনের একটি বিশেষ অর্জনের দিকে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি যায়–মধুসূদন শুধু সৃষ্ট করেননি, তিনি আবিষ্কারও করেছেন এবং মাত্র কয়েক বছরের সময়কালে একাধিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে তাকে বৈধও করেছেন। তাঁর সমসাময়িক আর কেউ এ কাজটি করে যেতে সক্ষম হননি এবং তাঁর পরবর্তীকালের খুব কম লোকই পেরেছেন।

মধুসূদনের আধুনিকতা নিয়ে আলোচনায় আরেকটি দিক উল্লেখযোগ্য অন্তত এ কারণে, এতে তাঁকে সম্যকভাবে বোঝার পথ প্রশস্ত হয়। তা হচ্ছে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসের এক ঈর্ষণীয় সমীকরণ। ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সময়ে এ ধরনের সমীকরণ চোখে পড়ে, ইংল্যান্ড একটি দ্বীপ হলেও তার কবি সাহিত্যিক কখনো বিচ্ছিন্ন দূর দ্বীপবাসী থেকে যাননি, তাঁরা ক্রমাগত ইউরোপীয় মানুষকে আত্মস্থ করতে ব্রতী হয়েছেন। এঁদের অনেকে প্রাচ্যকে গ্রহণ করেছেন, প্রাচ্যের সর্বোত্তম পাঠগুলোকে বাণীরূপে গ্রহণ করেছেন। মধুসূদন আজীবন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সত্তার যুগল অস্তিত্বকে একটি গ্রহণযোগ্য সমীকরণে বন্দি করতে চেয়েছেন, যাতে তারা একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়। এর ফলে তিনি যত সহজে হোমার, ভার্জিল, টাসো, দান্তে, মিল্টন ও শেক্সপীয়রকে ব্যবহার করতে পেরেছেন তাঁর কাব্যের প্রয়োজনে, তত সহজে ব্যাস-বাল্মীকি, কৃত্তিবাস-কালিদাসকে কাজে লাগিয়েছেন। কোন অসংলগ্নতা সৃষ্টি হয়নি, কোনো অসংগতিও দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, মানব মনের ও তার কল্পনার এরূপ স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য এবং এদের একাত্মীকরণ অতীতে অনেক কবি করেছেন– ইতিহাস, পুরাণ, দেশকাল, ভূগোলের সীমানা ডিঙিয়ে অনেক কবি সর্বচারী হয়েছেন অনেক কালে, তাহলে মধুসূদনের বিশিষ্টতা কোথায় অথবা তাঁর আধুনিকতার পরিচয়টি এখানে কোথায় আসে?

যে সমস্ত কবি মানুষের বিপরীতধর্মী, অসম অথবা শুধুই স্বতন্ত্র পরিচয়সমূহকে একটি সমতলে স্থাপন করে মেলতে চান, তাঁদের অনেকের থেকেই মধুসূদন ছিলেন উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী। অতীতচারী অনেক কবি ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তাতে

আবেগ প্রবল থাকে, প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। রোমান্টিক কবিবৃন্দের ক্ষেত্রে বরং দেখা যায় তাঁদের বিপরীতবাসী মানস মধুসূদনের মতোই একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, যাতে জীবনের প্রতি একটি সামগ্রিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। এ অর্থে ঐ রোমান্টিক কবিবৃন্দ অবশ্যই আধুনিক ছিলেন।

মধুসূদন তাঁদের ধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি সম্মিলন ও সমীকরণ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে ঘটাতে পেরেছিলেন, কারণ জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল গতিশীল এবং অখণ্ড। তাঁর প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছে, কারণ দুটি ভিন্ন সভ্যতার কেন্দ্রীয় অনুভবগুলোর ঐক্য সাধন intuition এবং প্রজ্ঞার ব্যাপার। আমাদের কালে আধুনিকতার একটি পরিচয় যদি হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ (আমাদের কালের এক সংবেদনশীল সমালোচক অ্যান্থনি আলভারেজ তো এ মতই ব্যক্ত করেছেন যে 'আধুনিকতাবাদ ও এ আন্তর্জাতিকতাবাদ বস্তুত সমার্থক দুটি শব্দ')" তাহলে মধুসূদনের বিশ্ববিহারী কল্পনাকে বলতেই হবে। তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন প্রচেষ্টা শুধু উভয় ভৌগোলিক ভূমির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এদের একটি যুগলবন্ধনে নিয়ে আসার পরিশ্রমের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এজন্য ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি ইংরেজি নাটক ও কবিতা লিখেছেন, ভারতীয় পুরাণকে ভিত্তি করে 'আধুনিক' ছন্দে ও ফর্মে 'আধুনিক' কাব্য রচনা করেছেন, তাঁর যুগের সমস্যাকে একটি প্রচলিত নাট্য-কাঠামোয় সমসাময়িক করে উপস্থাপিত করেছেন। অ্যাংলো-স্যাক্সন ও হিন্দুকে নিয়ে রচনা লিখেছেন, তাতে খ্রিস্টধর্মের সাফাই গেয়েছেন। ইটালির কবি দান্তের ওপর ফরাসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য শেষপর্যন্ত ভূগোলের বিভাজন ছিল না মধুসূদনের কাছে, বরং মানব মনের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, বোধ অনুভূতির কিছু ভিন্নমুখি প্রকাশের ক্ষেত্র বলে তাদের বিবেচনা করেছেন। এদের মধ্যে একটি সংযোগ রচিত হলে মানব মনের ঐক্যই সুনিশ্চিত হয়। এজন্য বাঙালি হয়েও সর্বভারতীয় এবং শেষপর্যন্ত সর্বদেশীয়, হিন্দু হয়ে জন্মেও খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, সাগরদাঁড়ির কিশোরের 'অ্যালবিওনে'র উপকূলের জন্য দীর্ঘশ্বাস সবই তাঁর ঐক্য সন্ধানী মনের একেকটি পর্যায় মাত্র।

৩.

মাইকেল মধুসূদন যদি রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘায়ু হতেন এবং ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি কি ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতেন, বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকে এবং নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে? যদি ধরে নেওয়া যায় তাঁর আর্থিক বা সাংসারিক অবস্থা সহনীয় হতো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি লিখতেন ক্রমাগত বা ফি বছর না হলেও এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' অপেক্ষাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে, সেরূপ বৃহৎ কিছু লিখতেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের মতো বিরাট ঘটনা যেখানে মধুসূদনকে স্পর্শ করেনি, ধরে নেওয়া যায় রাজনীতি তাঁকে ততটা প্রভাবিত করত না, তবে ভিক্টোরিয়ান যুগের টলটলায়মান শেষকাল এবং তাঁর নিঃশব্দ প্রস্থান: ভারতে কংগ্রেসের জন্ম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি, সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব ইত্যাদি তিনি কতটা নিস্পৃহভাবে নিতেন সে প্রশ্ন আসে। কিন্তু তিনি প্রবলভাবে অনুভব করতেন এবং উৎসাহভরে অবলোকন করতেন শিল্প-সাহিত্য ও সংগীতে বিংশ শতাব্দী তথা আধুনিকতার প্রবেশ, যার প্রভাব সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউরোপে এবং অন্যত্র মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এবং পরাধীন ভারতে যার ঢেউ লেগেছে। মধুসূদন শেষ জীবনে স্বভূমে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, হয়তো আরও বেশি দেশীয় হতেন তিনি এবং ইংরেজ সভ্যতার শীতল ও শুষ্ক যে পরিচয়টি তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলেন, তার প্রভাবে তাঁর বাঙালিয়ানা আরও সম্পূর্ণ হতো, যদিও সাহিত্যে এর প্রকাশ কতটা হতো বলা মুশকিল। উপরোক্ত চিত্রটি এতটা hypothetical যে এর উপর মন্তব্য করাতেও অনেকে উৎসাহিত হবেন না কিন্তু একটি ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা নিয়ে বলা যায় মধুসূদন কী করতেন তিনি জীবন থেকে পালাতেই থাকতেন এবং সাহিত্যে সেই পলায়নকে বাস্তব-পরাবস্তবে মিশিয়ে রূপায়িত করতেন, স্বপ্ন ও জাগরণের যুগল বিষয়ে পরিণত করতেন। তিনি চিন্তায় ও কাজে আধুনিক ছিলেন বলে নিজস্ব ও মৌলিক ভাবনার খুব বাইরে গিয়ে পরিপার্শ্ব থেকে সৃষ্টি-উপাদান তাঁকে সংগ্রহ করতে হতো না; বরং তাঁর সৃষ্টিতে পরিপার্শ্বকে দেখার উপায় থাকত, যেমন তাঁর সৃষ্টিতে সর্বত্র আছে। মধুসূদন যা লিখে গেছেন, তাতে ব্যক্তি ও জীবন, এক

ও অনেক বিভিন্নভাবে উন্মোচিত এবং এ কাজটি আধুনিক একজন কবি সাহিত্যিকের কাছেও বহু আরাধনার বিষয়।

তথ্য নির্দেশ :

১. জন স্টুয়ার্ট মিল, 'এসে অন মি. ম্যাকোলে', ১৮৫৬; বরিস ফোর্ড সম্পাদিত 'দি পেলিকান গাইড টু ইংলিশ লিটারেচার', ৬ষ্ঠ খণ্ডে উদ্ধৃত (হারমন্ড্স্ ওয়ার্থ; পেঙ্গুইন বুকস ১৯৫৮), পৃ : ৪৭।

২. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৮৩, পৃ : ১২;

৩. ঐ

৪. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলি', ১৯৮৫, পৃ : ৩৪;

৫. হুগো ভন হফম্যানস্থল, 'গ্যাব্রিয়েল ডি অ্যানানজিও' রচনা সমগ্র, গদ্য, প্রথম খণ্ড (১৯৫৬), পৃ : ১৪৯;

৬. সীতা, প্রমীলা রাধা বা সরমার চরিত্র নিয়ে এরূপ ভাবার সংগত কারণ রয়েছে যে, এসব চরিত্রায়নে মধুসূদন সহজ পারেননি, ফলত স্ববিরোধী রেনেসাঁর আবহাওয়ার ব্যক্তির মূল্যায়নের পাশাপাশি নারীর প্রতি এক ধরনের সমীহবোধ স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান ছিল এবং মধুসূদন নারীকে উচ্চাসনেই বসিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে নারী যে রহস্যময়তা ও কুহেলিকার অধিকারী, যা পৌরাণিক যুগ থেকে সকল কালে সাহিত্যে সুস্পষ্ট, তা পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত রেনেসাঁর সরাসরি উন্মোচনে এবং নারীকে অন্তরাল থেকে তুলে এনে সম্মুখবর্তী করার মাধ্যমে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। মধুসূদনের নারী-রেনেসাঁ চিন্তাও ঐতিহ্যের টানাপোড়নে দ্যোদুল্যমান। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যত্র বলা হয়েছে, নারী চরিত্রে মধুসূদন নিজেকে কখনো স্থাপন করতে পারেননি, তাই তাঁদের চরিত্রায়নে ভারসাম্যতা সর্বদা রক্ষিত হয়নি।

৭. গৌর বসাকে লেখা চিঠি, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী'তে উদ্ধৃত, পৃ.-৫৩;

৮. ঐ, পৃ.-৫০;

৯. ম্যাকলম ব্র্যাডবারী ও জেমস ম্যাকফারলেন সম্পাদিত 'মডার্নিজম', হারমন্ডস্ ওয়ার্থ : পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৬৮, পৃ : ২৯।

১০. এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের একটি মন্তব্যকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' রাধার চরিত্রায়ন সম্পর্কে তিনি লেখেন : 'কবির শিল্পীমনের উদ্বোধন এখানে ঘটেনি। কারণ রাধার মধ্যে আপনাকে প্রক্ষেপ করার সুযোগ যেমন ছিল না, তেমনি মনমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল চরিত্র

নির্মাণের সম্ভাবনাও ছিল না। কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্নে ব্রজাঙ্গনা অলস কারুবিলাস এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ থেকেছে।' 'মধুসূদন রচনাবলী', পৃ.-১৯;

বস্তুত এ কারণে মধুসূদনের নারীচরিত্রসমূহ পুরুষ-চরিত্রের তুলনা কিছুটা হলেও ম্রিয়মাণ। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' আকর্ষণীয় কিন্তু অভিভূত করার মতো নয়। কারণ বোধহয় যে, তাঁর নিজের ভাষায় মুসলমানেরা হিন্দুদের থেকে fiercer race স্বল্প পরিসরে ফতেমার চরিত্রটিও (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ) এজন্য হয়তো মনে থাকার মতো।

১১. এ. আলভারেজ, 'বিওন্ড অল দিস ফিডল; এসেজ, ১৯৫৫-১৯৬৭', (লন্ডন, ১৯৬৮)।

সুন্দরম, শীত সংখ্যা ১৩৯৪

বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্প

প্রচ্ছদশিল্পের ভালোমন্দ নির্ভর করে পুস্তকশিল্পের ভালোমন্দের ওপর। প্রচ্ছদশিল্প হচ্ছে কলা অর্থে শিল্প 'The art of book cover illustration' এবং পুস্তকশিল্প হচ্ছে বাণিজ্য অর্থে শিল্প। অর্থাৎ বইয়ের ব্যবসায় বাণিজ্য ভালো হলে প্রচ্ছদশিল্পের সুদিন আসে, বইয়ের ব্যবসায় মন্দা থাকলে প্রচ্ছদশিল্পের আকাশে ঘনায় মেঘ। কলা ও বাণিজ্যের এ আন্তঃসম্পর্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি এবং অর্থনীতির কিছু অমোঘ সূত্র অনুযায়ী এটি পরিচালিত হবে, এটিও আমরা ধরে নিই। কিন্তু বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যত্র, বিশেষ করে শিল্পোন্নত পশ্চিমাবিশ্বে, প্রচ্ছদশিল্পের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির সূত্রকে আমরা মাঝে মধ্যে অকার্যকর দেখতে পাই। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যায়।

পশ্চিমাবিশ্বে পুস্তকশিল্প একটি বড় শিল্প। এমন অনেক প্রকাশনা সংস্থা আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে, যাদের বহুজাতিক অন্যান্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়—পুঁজি বিনিয়োগ, উৎপাদন, বাজার, মুনাফা ইত্যাদির হিসাবে। এমন অনেক প্রকাশনা সংস্থা আছে, যারা বইয়ের বিজ্ঞাপনেই লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে প্রতিবছর। সে সমস্ত প্রকাশনা সংস্থা যেকোনো বই প্রকাশের জন্য যেকোনো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। আমাদের প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রচ্ছদশিল্পের এখন অত্যন্ত সুদিন থাকার কথা। এ কথা মানতেই

হবে। পশ্চিমা পুস্তকগুলোর প্রচ্ছদ খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্প কতটা হচ্ছে? আমরা যদি যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের গত দশ বছরে প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদের একটি খতিয়ান নিই এ কাজটি অবশ্যই নির্বাচিত বই নিয়েই হতে হবে, পরিসংখ্যান থাকে বলে স্যাম্পলিং, সে অনুযায়ী তাহলে দেখব, প্রচ্ছদ ক্রমশই নকশা বা ডিজাইনের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটার ইমেজ সরবরাহ করছে, অনেক সময় শুধু আকর্ষণীয় লেটারিং দেওয়া হচ্ছে, আবার অনেক সময় গ্রাফিক্সকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। প্রায় সকল বড় প্রকাশনা সংস্থার নিজস্ব গ্রাফিক্স শাখা থাকে, তারা ডিজাইন বা নকশা (অথবা প্রচ্ছদ বিন্যাস) সরবরাহ করছে। পশ্চিমের বইপত্রের প্রচ্ছদে ফটোগ্রাফিক ইমেজও কাজে লাগানো হয়। পুরো বিষয়টি এখন প্রযুক্তিগত কৌশলের এবং এটি পরিগণিত হয়েছে উচ্চমানের গ্রাফিক কুশলতায়। আমাদের দেশে পেপারব্যাক প্রকাশনা শুরু হয়েছে মাত্র কিছুদিন হলো, এখনও তেমন দক্ষতা আমাদের অর্জিত হয়নি। মলাটের লেমিনেশন বিষয়টিও আমাদের দেশে এসেছে এ সেদিন। পশ্চিমে শক্ত মলাটের বইয়ের দাম বেশি, পেপারব্যাকের দাম অনেক কম। শক্ত মলাটের প্রচ্ছদ আলাদা কাগজে ছাপা হয়, প্রায়শই এবং কোনো কোনো সময় তাতে ছবি থাকে। কিন্তু পেপারব্যাকের মলাটে প্রায়শই ছবি থাকে। আমরা বলতে পারি, পশ্চিমা প্রচ্ছদশিল্প পেপারব্যাকের ওপর অনেক বেশি জোর দিচ্ছে।

কিন্তু এ যে প্রচ্ছদ নিয়ে এত আয়োজন, সেখানে নকশা, ডিজাইন, গ্রাফিক্স-সবই আছে, কিন্তু কোনো একক প্রচ্ছদশিল্পী বলতে কেউ অনেক সময়ই থাকেন না। প্রচ্ছদ ডিজাইনার হিসেবে এ জনের নাম থাকে, তবে তিনি একটি কম্পিউটার ইমেজ বা কোনো ধ্রুপদ শিল্পীর আঁকা ছবি নিয়ে প্রচ্ছদটির নকশা করেন। অথবা তিনি পরিকল্পনা করেন, বাকিটা যন্ত্র করে। আমাদের দেশে যেভাবে প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে অনেক প্রথিতযশা শিল্পী কর্মরত আছেন, সেরকম পশ্চিমে নেই। বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত শিল্পীদের ছবি হয়তো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তিনি প্রচ্ছদশিল্পী নন। এর অনেক কারণ আছে–হয়তো একজন শিল্পী প্রচ্ছদের জন্য যে পারিশ্রমিক দাবি করবেন, সেটি দিলে বইটির দামে আর পোষাবে না; হয়তো এ বই ছাপা হয় যে ক'টার প্রচ্ছদ

আর শিল্পী করতে পারেন; হয়তো পাঠক প্রচ্ছদ নিয়ে মাথা ঘামায় না; আকর্ষণীয় একটা মলাট হলেই চলে, সেজন্য গ্রাফিক্স-এর সাহায্যেই কাজটা সেরে ফেলা হয়। যেভাবেই হোক, পশ্চিমের প্রচ্ছদশিল্প প্রকাশনা শিল্পের একটি সংস্থা কোনো আলাদা শিল্প বিষয় নয়। এটি decoration বা অলঙ্করণ, ডিজাইন ও নকশার বিষয়। পশ্চিমের কোনো কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে যখন বইয়ের ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে, বই বিক্রি হচ্ছে না প্রকাশক জমিবন্ধক রেখে বইয়ের পিছনে টাকা খাটাচ্ছেন, সেখানে, নিতান্ত সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করছেন প্রখ্যাত অনেক শিল্পী। আমাদের জন্য এটি একটি গৌরবের এবং শ্লাঘার বিষয় যে, আমাদের প্রচ্ছদশিল্প শুরু থেকেই আর্ট হিসেবেই শিল্প। এমনটি খুব বেশি দেশে যে হয়েছে, আমার মনে হয় না। এদেশে সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পী প্রচ্ছদের পিছনে প্রচুর মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন, কামরুল হাসানের মতো জীবনবাদী শিল্পী এঁকেছেন প্রচ্ছদ। রবীন্দ্রনাথও প্রচ্ছদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রচ্ছদ বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বহু নামি শিল্পী প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে এখন অনেক বই প্রকাশিত হয়, যাদের সাহিত্য মূল্য সামান্যই। কিন্তু প্রচ্ছদের গুণে, অর্থাৎ গুণী প্রচ্ছদশিল্পীর স্পর্শে, বইটির একটি ভিন্ন মূল্য দাঁড়িয়ে যায়। এটি ঘটতে পারে শুধু বাংলাদেশে।

পুস্তকশিল্পের যখন আকাল, তখন প্রচ্ছদশিল্প কেন থেমে থাকেনি বাংলাদেশে? বরং বলা যায়, দ্রুত একটি আলাদা মাত্রা অর্জন করেছে শিল্পটি। এটি কি করে হয়? প্রতিবছর বহু বই প্রকাশিত হয় বাংলাদেশে এবং আমরা দেখতে পাই প্রচ্ছদ বিষয়ে ক্রমেই যত্নবান হচ্ছেন প্রকাশকরা। এ কথা তো সত্যি যে, আমাদের প্রকাশনার মান বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের দামও বেড়েছে, কিন্তু সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না এ মুহূর্তে। প্রকাশনার মান যে বেড়েছে, তার কারণ উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার। এখন যত ইচ্ছে রং ব্যবহার করা যায় প্রচ্ছদে, অত্যন্ত চমৎকারভাবে সে রংগুলো ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। ভালো কাগজ ও বোর্ড ব্যবহার করা

হচ্ছে, বাঁধাইয়ের কাজটিও অনেক নিখুঁত হয়েছে। আর লেমিনেশন প্রক্রিয়াটি এসে যাওয়ায় প্রচ্ছদের মানই বেড়ে গেছে।

কিন্তু প্রকাশনার মান না হয় বাড়ল, বইয়ের কাটতি কি বেড়েছে? দেশে এখন বাংলা একাডেমির বইমেলাসহ অনেকগুলো গ্রন্থমেলার আয়োজন হয়। তা সত্ত্বেও বই বিক্রির হার আশাব্যঞ্জক নয়। যেকোনো প্রকাশককে জিজ্ঞেস করুন, বলবেন, ব্যবসায় মন্দা, ভালো নয়। তাহলে প্রচ্ছদশিল্পে কেন যে মন্দা দেখা দেয়নি?

এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে বইয়ের সঙ্গে চিত্রকলার দীর্ঘ সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমে চৌদ্দ পনেরো শতকে পুস্তক অলঙ্করণ ছিল একটি উন্নত ও রুচিশীল আর্ট। পাণ্ডুলিপি কোনো কোনো পৃষ্ঠায় বা মার্জিনের খালি জায়গা অত্যন্ত যত্নসহকারে অলঙ্কৃত করা হতো। এ শিল্পটি অবশ্য অনেক পুরনো। মধ্যযুগে এর একটি চমৎকার উৎসব ঘটেছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রধানত ধর্মীয় পুস্তকের অলঙ্কারণে। পনেরো শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ একে অন্যান্য পুস্তকের সাজসজ্জার জন্য মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক ছাপাখানার পুস্তক অলঙ্করণের একটি চর্চা ছিল। এখন শুধু শিশু-কিশোর পাঠ্য এবং চিত্র প্রয়োজন, এমন বইয়ের অলঙ্কারণ থাকে।

সে তুলনায় বাংলাদেশে চর্চাটি রয়ে গেছে। পাল যুগের কিছু কিছু অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যেগুলোতে চমৎকার চিত্র ও অলঙ্করণ দেওয়া আছে। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই চিত্রিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাবে–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এরকম পুঁথির একটি সংগ্রহ রয়েছে, যেখানে ছবির অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একসময় পুঁথির মলাট হিসেবে কাঠের ব্যবহার হয়েছে এবং সে কাঠের ওপর বর্ণময় চিত্রাদি শোভা পেয়েছে। আমরা এসব কাঠের মলাটকে আমাদের আদি প্রচ্ছদ হিসেবে ভাবতে পারি।

বাংলাদেশের মুদ্রণযন্ত্রের আগমন ইউরোপের প্রায় তিনশ বছর পর। গুটেনবার্গ ছাপাখানায় প্রথম বাইবেল ছাপা হয়েছে, শ্রীরামপুর

ছাপাখানাও ইংরেজ মিশনারিরা স্থাপন করেছিলেন ধর্মীয় গ্রন্থাদি ছাপার জন্য। কিন্তু ছাপাখানা আসার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাণ্ডুলিপি বা পুস্তক এবং চিত্রচর্চার মধ্যকার সম্পর্কটি। দু'শ বছর আগেও বেশ তাজা ছিল; এ দু'শ বছরে এটি নষ্ট হয়নি। বরং বলা যায়, নতুন করে তা বিন্যস্ত হয়েছে। এ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারটি প্রচ্ছদশিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রচ্ছদশিল্পের টিকে থাকা এবং তার বিকাশ নির্ভর করে অনেকাংশে পাঠকের ওপর। বাংলাদেশে প্রচ্ছদশিল্পী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই একটি বইয়ের প্রচ্ছদ কে এঁকেছেন, তার ওপর বইটির মর্যাদা বেশ খানিকটা নির্ভরশীল। পাঠক চান, বইয়ের প্রচ্ছদ রুচিশীল হবে বিষয়বস্তুকে তা প্রতিফলিত করবে। পাঠকের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায় সাম্প্রতিক একটি সমালোচনা থেকে, এ বছর বইমেলাতে বরাবরের মতো অনেক নতুন বই এসেছিল, কিন্তু বই বাঁধাইকারীদের ধর্মঘটের জন্য মাঝখানে নতুন বই আসা প্রায় বন্ধ ছিল। এজন্য কিনা কে জানে, মেলার শেষদিকে প্রায় একই রকম প্রচ্ছদ বেশকিছু বই বাজারে চলে এল, এর মধ্যে জনপ্রিয় উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি ছিল, হয়তো প্রকাশকের তাড়াহুড়ার জন্য শিল্পী পুরো বইটি না পড়েই প্রচ্ছদে এঁকেছেন; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্তে একটি মেয়ের মুখ এঁকেছেন প্রচ্ছদে– রোমান্টিক গল্পে একটি বা একাধিক সুশ্রী মেয়ে থাকবে, এ তো চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। ফল হলো যে, প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি উপন্যাসের প্রচ্ছদে একই রকম মেয়ের মুখশ্রী শোভা পেতে লাগল, একটি জাতীয় দৈনিকের চিঠিপত্রের কলামে কয়েকজন পাঠক এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পাঠকের বিরক্ত হবার কারণ, প্রচ্ছদকে এভাবে 'সস্তা' করা হয়েছে।

যে পাঠক মুখশ্রীর চিত্রায়নকে সস্তা বলেন, তিনি নিশ্চয়ই কি সস্তা নয়, তা জানেন; তবে আমাদের মনে হয়েছে মহিলার মুখশ্রী মাত্রকেই সস্তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে প্রতিভাহীন চিত্রায়ন এবং অযত্নের প্রকাশকে গোটা প্রবণতাটাকে। মহিলা (অথবা এবং পুরুষ) মুখশ্রী বা দেহাবয়ব নিয়ে আগেও প্রচ্ছদ হয়েছে, আগামীতেও হবে, কিন্তু তাতে যদি কোনো বিজ্ঞাপন চিত্রের মতো বাহারি বিষয় থাকে বা

পাঠকের দৃষ্টিকে, একটি প্রিন্ট-শাড়ির বিজ্ঞাপনের তরুণীটির মতো, তা কেবল আকর্ষণই করে, তবে তাকে সস্তা বলা সংগতই বটে। বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্পে এ ভঙ্গিসর্বস্ব অথবা বিজ্ঞাপনের আদলে নারীর মুখশ্রী আঁকাটি তুলনামূলকভাবে বিরল ঘটনা। বরং দেখা যায়, রিপ্রেজেনটেশনের চাইতে ব্যঞ্জনা এবং আভাসসৃষ্টি গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার প্রচ্ছদের এক বড় অংশ নির্ভরশীল বিমূর্ত প্রকাশবাদের ওপর। বিমূর্ত শিল্প দিয়ে প্রচ্ছদ তৈরির ইতিহাস আমাদের দেশে মাত্র তিরিশ বছরের মতো; এখন বিশেষ করে কবিতার বইয়ে, এর ব্যবহার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।

পাঠক যেহেতু মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে একটি 'ভালো' প্রচ্ছদের জন্য, প্রকাশক চেষ্টা করেন একটি ভালো প্রচ্ছদ আঁকাবার। এজন্য প্রচ্ছদ শিল্প খুঁড়িয়ে চললেও পা হড়কে পড়ে যায় না। আমাদের শিল্পীরা প্রচ্ছদ আঁকেন সামান্য পারিশ্রমিকেই। যেখানে একজন শিল্পী তাঁর মৌলিক একটি চিত্রকর্ম পঁচিশ হাজারে বিক্রি করতে পারেন, তিনি পঁচিশ'শ টাকায় একটি প্রচ্ছদ আঁকতে গররাজি হন না, এটি পুস্তকশিল্পকে কিছুটা হলেও সহায়তা দেয়। তাছাড়া, প্রচ্ছদশিল্প যেহেতু একটি স্বীকৃত শিল্প মাধ্যম আমাদের দেশে, অনেক তরুণও উৎসাহী হন প্রচ্ছদশিল্পী হতে। বস্তুত বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ব্যস্ত প্রচ্ছদশিল্পীদের মধ্যে তরুণদেরই প্রাধান্য। খালিদ আহসান বা ধ্রুব এষ অথবা ইউসুফ হাসান, অশোক কর্মকার, সৈয়দ ইকবাল—এরা সকলেই তরুণ। এদের সাফল্যে অনেক তরুণ শিল্পী প্রচ্ছদ আঁকায় উৎসাহী হন। হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থগুলোর পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে, দেখা গেল জামাল আহমদ প্রচ্ছদ এঁকেছেন। জামাল আহমদ চারুকলা ইনস্টিটিউটের তরুণ অধ্যাপক, শিল্পী। প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে এ প্রয়াস তাঁর বলা যায় প্রথম। সমর মজুমদার, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, বীরেন সোম, এরাও এভাবে উৎসাহী হয়ে এসেছিলেন, এখন প্রতিষ্ঠিত প্রচ্ছদশিল্পী। হাশেম খান একসময় প্রচুর এঁকেছেন প্রচ্ছদ, তিনিও আগ্রহী হয়েছিলেন এর অন্তর্গত চ্যালেঞ্জের জন্য। পাশ্চাত্যে গ্রাফিক্স যেখানে সাহায্য করছে প্রচ্ছদকে, আমাদের দেশে সেখানে কম্পিউটার বা অন্যান্য গ্রাফিক্স মাধ্যম ততটা সক্রিয় নয়।

হয়তো খরচে পড়তা পড়ে না, হয়তো প্রায় একই খরচে একজন ভালো প্রচ্ছদশিল্পী কাজ করে দেন। তবে কম্পিউটারের অমোঘ উপস্থিতি বেশিদিন ঠেকানো যাবে না; হয়তো এমন দিন আসবে যখন কম্পিউটার ইমেজ থেকেই প্রচ্ছদ হয়ে যাবে সস্তায়। কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে মুহম্মদ নূরুল হুদার উপন্যাস 'জন্মজাতি'। প্রচ্ছদ দেখা গেল তিনিই করেছেন, কম্পিউটারে। তবে সত্য কথা বলতে কী প্রচ্ছদটি এ কারণে তেমন জমেনি। এবার বাংলা একাডেমির বইমেলা ঘুরে দেখা গেল, কম্পিউটারে এখনো হস্তক্ষেপ শুরু হয়নি প্রচ্ছদশিল্পে। বাংলাদেশের বোধ করি সবচেয়ে ব্যস্ত এবং খ্যাতিমান প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী কম্পিউটারের সাহায্য নেন না। রফিকুন নবীসহ অন্যান্যরাও নিজের হাতেই আঁকেন, যেমন ছবি আঁকে—উত্তম সেন, মাসুক হেলাল, আনওয়ার ফারুক অথবা মামুন কায়সার, সনাতনী প্রথাতেই আঁকেন—যেটুকু প্রযুক্তি নিতে হয় আধুনিক ছাপাখানার, সেটুকু অবশ্য তাঁরা নিচ্ছেন।

আমাদের প্রচ্ছদশিল্পের টিকে থাকার একটি কারণ হলো, প্রকাশনা শিল্প থেকে শুরু করে পাঠক পর্যন্ত, সকলের কাছেই প্রচ্ছদটি বইয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেখার প্রবণতার জন্য। এখনও বইয়ের সমালোচনায় প্রচ্ছদশিল্পীর নাম এসে যায়, প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য সর্বদেশীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বইয়ের প্রকাশনা-সৌষ্ঠবের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদের জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। প্রচ্ছদের জন্য পুরস্কার পাশ্চাত্যে কোথাও দেওয়া হয়ে থাকে কিনা আমার জানা নেই; তবে বাংলাদেশে এর একটি আলাদা মূল্য আছে। শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদের পুরস্কার পাওয়া বইটির অতিরিক্ত পঞ্চাশ কপি বিক্রি হয়ে যায়; যেখানে মোট বিক্রি তিন থেকে চারশ' কপি, সেখানে, এ অতিরিক্ত বিক্রিটি প্রচ্ছদশিল্পের প্রতি আমাদের দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

তবে প্রচ্ছদশিল্পের টিকে থাকার মূলে যে কারণটি হয়তো সহজেই চোখে পড়ে না। অথচ যার অবদান অনস্বীকার্য, সে হচ্ছে শিল্পীদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা, প্রচ্ছদ একটি বইয়ের বিষয়বস্তুর

সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে, এরকম একটি ধারণা বহু আগে থেকেই চলে এসেছে। নজরুলের অগ্নিবীণা প্রচ্ছদে একটি বীণার ছবি দেওয়া হয়েছিল, সেই বহু আগে, কুড়ির দশকে, যা থেকে আগুন বেরুচ্ছে। এ হলো 'অগ্নিবীণা' নামের সার্থকতা। বিভূতিভূষণের আম আঁটির ভেপুর প্রচ্ছদে সত্যজিৎ রায় এঁকেছেন ভেঁপুটি; তাঁর নিজের ফেলুদা সিরিজের গল্পের প্রচ্ছদে ফেলুদা থাকেন। তা তিনি গ্যাংটকে হলে পিছনে গ্যাংটক, কাঠমণ্ডুতে হলে পিছনে কাঠমণ্ডু। সম্প্রতি অসিত চৌধুরী ঢাকায় ফেলুদা বলে একটি বই লিখেছেন, তার প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। তাতেও ফেলুদা প্রচ্ছদে, ঠিক যেমন সত্যজিৎ রায় আঁকতেন, পিছনে রিকশায় লালমোহন বাবুকেও যেন দেখা গেল এবং তার পিছনে ঢাকা অর্থাৎ কমলাপুর রেলস্টেশন। বিষয়বস্তুর প্রতি এ বিশ্বস্ততা সবসময় যে উপকারী হয় সেরকম কোনো কথা নেই, তবে বাংলাদেশের শিল্পীরা এর মাধ্যমে সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকলার একটি সেতুবন্ধন রচনা করেন। এমনকি কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদেও দেখেছি, বিষয়বস্তুর একটি বিমূর্ত আভা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। খালিদ আহসান এবং আফজাল হোসেনকে আমার অত্যন্ত চিন্তাশীল প্রচ্ছদশিল্পী মনে হয়, তরুণদের মধ্যে যদিও আফজাল এখন প্রচ্ছদ আঁকেন না বলতে গেলে। সৈয়দ ইকবাল, অশোক কর্মকার অথবা ইউসুফ হাসানও ভেবেচিন্তে প্রচ্ছদ আঁকেন। অনেক সময় তাঁদের প্রচ্ছদ একটি গভীরতা অথবা ব্যাপ্তি দেয় বিষয়বস্তুকে, এটি আসে তাদের নিষ্ঠা থেকে। কাইয়ুম চৌধুরীর মতো অগ্রজ শিল্পী, যেকোনো বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবেন, বিষয়টি থেকে কোনো একটি মূল চিন্তা উৎপ্রেক্ষা অথবা ইমেজ তুলে আনেন, তারপর সেটাকে বিষয়বস্তু বিবেচনা করে ছবি আঁকেন, কোনো কোনো সময় বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধতাও অর্পণ করে প্রচ্ছদে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশে বহু বই লেখা হয়েছে, আজকাল প্রতিবছর আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করি, নতুন নতুন তথ্য নিয়ে বেরুচ্ছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই। কিন্তু তাদের প্রচ্ছদ খুব বিচিত্র হয় না– বিচিত্র হবার অবকাশ যে নেই, তা নয়; শিল্পীরাই ধরে নেন, বিষয়টি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ, সেখানে মুক্তিযোদ্ধা, বন্দুক, উত্তোলিত হাত, বাংলাদেশের পতাকা

অথবা একটি যুদ্ধের দৃশ্যকে উপজীব্য করে প্রচ্ছদ হয়। সবুজ ও লাল রং আসে, যেন অবধারিতভাবে। এভাবে যখন প্রচ্ছদ আঁকা হয়, কিছুটা পৌনঃপুনিকতা আমরা লক্ষ করি, কিছুটা স্থবিরতা। কোনো কোনো শিল্পীও স্থবিরতা এড়িয়ে যান। নিজস্ব একটি মৌল ভাবনাকে উপহার দিয়ে–হয়তো খোলা আকাশ, উড্ডীন পাখি অথবা শস্যক্ষেতের আভাস, কেউ কেউ বিমূর্ত করে ফেলেন ছবিটি, কিন্তু আমাদের মানতেই হয়, মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল একটি ঘটনার আবেগ ধারণ করতে গিয়ে অনেক প্রচ্ছদই গতানুগতিক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়ের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে ধর্মীয় পুস্তকের কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলাম ধর্মীয় পুস্তকের প্রচ্ছদে ছবি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রচ্ছদ সেখানে গৌণ, সেটি শুধুই মলাট, কাজেই সাদামাটা লেটারিং করেই কাজ সারা হতো এবং এ অভ্যাস চলে আসছিল বহু দিন থেকে। কিন্তু বিষয়ের এ সীমাবদ্ধতাকে দেখেছি কোনো কোনো প্রচ্ছদ অতিক্রম করেছে ইসলামি শিল্পকলার একটি প্রধান ধারা ব্যবহার করে, যাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি। আজকাল ক্যালিগ্রাফির প্রচলন হয়েছে আমাদের দেশে এবং এর ব্যবহারে ধর্মীয় পুস্তকের প্রচ্ছদ অনেকটা আকর্ষণীয় হয়েছে। কিছুদিন আগে ইরান থেকে প্রকাশিত ধর্মীয় পুস্তকের কিছু আমার হাতে এসেছিল। ক্যালিগ্রাফির সূক্ষ্ম এবং অনুপম ব্যবহারে একটি প্রচ্ছদ কী জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, এগুলো তার নমুনা। আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত পুস্তকগুলোও বিষয়ের পৌনঃপুনিক বিন্যাস ঘটায় প্রচ্ছদে পৌরাণিক নানা ছবি এসব প্রচ্ছদের প্রধান সহায়।

একটি প্রচ্ছদ তখনই আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ হয়, যখন তাতে শুধু ভিতরের চিন্তা বা ঘটনার একটি ছবিই থাকবে না, বরং তার প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ায় এমন ব্যঞ্জনার সমাহার থাকবে সেখানে। প্রচ্ছদ আসলে একটি ব্যাখ্যার বা interpretation এর বিষয়। ভালো প্রচ্ছদ এ interpretation দিয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে, একটি বিন্যাসের মধ্যে। এজন্য শিল্পীকে ভিন্ন মাধ্যমটি (গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক) সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে অন্তত ওই মাধ্যমটি যে

ব্যাখ্যার সম্ভাবনা তৈরি করে, সে সম্পর্কে তাকে চিন্তাশীল হতে হবে। প্রচ্ছদ এক ধরনের মিনিয়েচার শিল্প। মিনিয়েচার শিল্পের যেমন ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎকে বৃহৎ এর ভাবনাকে ধারণ করার ক্ষমতা থাকতে হয় প্রচ্ছদশিল্পেও সেরকম হবে, শিল্পীর থাকতে হবে সেই Quality of vision, যা একটি অনুবিশ্বে সমগ্র বিশ্বের সারাৎসারকে স্থাপন করার শক্তি যোগায়। মিনিয়েচার শিল্প শুধুই ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প নয়– আকৃতির সীমাবদ্ধতা এখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ডেকান বা দাক্ষিণাত্যের মিনিয়েচার ঐতিহ্য দেখতে পাই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে একটি বৃহৎ এর বোধ সঞ্চারিত হয়। ছবিগুলোতে গভীরতা থাকে; ছবির পিছনটা যেন অবারিত এমনকি প্রাসাদের উঠোন অথবা অলিন্দের প্রেক্ষাপটেও। একটি হচ্ছে সেরকম গভীরতার আভাস দেবে; কারণ একটি বইয়ের দুই মলাটের ভিতর কি যে ঘটে যায়, তার সবটা জানা কি সম্ভব? যা ঘটে তা হয়তো লিপিবদ্ধ থাকে; যা ঘটে না, যা ঘটতে পারে, সেটি আমরা কল্পনা করে নিই। আমাদের কল্পনাকে যদি গভীরতা দিতে পারে প্রচ্ছদ অথবা তার গভীরতার সঙ্গে আমাদের কল্পনা মেলাতে পারি আমরা, তাহলে সে প্রচ্ছদটি হয় উন্নতমানের।

আরেকটি পর্যবেক্ষণ আছে প্রচ্ছদ সম্পর্কে। ধরা যাক, একটি উপন্যাসের প্রচ্ছদ আঁকতে হবে এবং উপন্যাস, আমরা জানি, এক চলমান জীবনচিত্র বিশেষ। এখন এ জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তকে ধরবেন শিল্পী? কোন বিশেষ প্রকাশ অথবা ভঙ্গিটি? এ নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভালো প্রচ্ছদশিল্পী তখন নির্ভর করবেন তার পঠনের অভিজ্ঞতার ওপর। তিনি বেছে নেবেন, শেষপর্যন্ত, একটি মুহূর্তকে এবং একটি চিত্রকে, যাকে আমরা epiphanic বলতে পারি। সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদগুলো আমার এ কারণে ভালো লাগে যে, তাদের ভিতর ওই মুহূর্তের উদ্ভাস, ওই epiphanic বিষয়টি আছে, তারপর অবশ্য সত্যজিৎ রায় কিছু প্রযুক্তিকে বিন্যাস ঘটান, যা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন; কিন্তু এপিফ্যানিটি জেগে থাকে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ এরকম এপিফ্যানিনির্ভর। আসলে একটি বইয়ের বিষয়বস্তুর যেমন আছে আখ্যানধর্মিতা—একটি আখ্যানকে প্রধান করে তৈরি হয় একটি উপন্যাস, নাটক অথবা গল্প (কবিতারও

থাকে নিজস্ব আখ্যান, তবে সেটা তৈরি হয় উৎপ্রেক্ষা-উপমা-প্রতীকের সীমিত স্পেস আর শব্দের আন্তঃসম্পর্কে তার প্রকাশের রেখার বিন্যাসে ধরা পড়ে না), সেই আখ্যানের অনুকূল আরেকটি আখ্যান তৈরি করে প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদের আখ্যানটি একটি এপিফ্যানিক মুহূর্তের একটি চলমানতার, যাকে শুধু ধরে রাখা হয় মুহূর্তের আপাত গতিহীন বিন্যাসে। কিন্তু তার পিছনের গতিটি অনস্বীকার্য। সে আভাস ভালো প্রচ্ছদ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্প নিয়ে আশান্বিত হবার কারণ রয়েছে। আশান্বিত হবার কারণ দীর্ঘদিনের পুস্তক অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ চিত্রায়নের ঐতিহ্যকে যারা ধরে রেখেছেন, তার চিত্রকলার চর্চাকারী শিল্পী–কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবীর প্রধান পরিচয় চিত্রশিল্পী হিসেবে। তাদের আছে যে Quality of vision তা সঞ্চারিত হয়েছে তরুণদের মধ্যে। তরুণরা আবার নিজস্ব কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, অনেকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন অগ্রজদের। এভাবে একটি শিল্প যখন চলমান এবং গতিশীল থাকে, তার যাত্রা হয় ঊর্ধ্বমুখী, শিখর অধিমুখে। কিন্তু একই সঙ্গে আশাঙ্কিত-কারণ কম্পিউটার গ্রাফিক্স যখন জোয়ারের মতো ঢুকবে এদেশের পুরাতন একটি শিল্পকে ভাসিয়ে না দিলেও তার ভূমিটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাছাড়া প্রচ্ছদশিল্পের নামে কিছু দেহসর্বস্ব বিজ্ঞাপনধর্মী চটুল কাজের চর্চাও হচ্ছে এদেশে– এসবের ব্যাপ্তি না ঘটলেই হয়। প্রচ্ছদে নিজের ছবি ছাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আজকের নয়। সেটা বহুদিনের মানবিক একটি প্রবৃত্তি। সে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পুস্তক প্রকাশনা যখন বাড়বে, যখন বহুমানুষের হাতে হাতে ঘুরবে বই, তখন যদি রুচির প্রশ্নে নমনীয় হয়ে চটকদার প্রচ্ছদের দিকে ঝুঁকে পড়েন প্রকাশক, তখনই সমস্যা হবে।

তবে সে আশঙ্কাটি আমার নিজের কাছেই অমূলক মনে হয়। বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্প দুর্দিনেই যেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে টিকে থাকে পুস্তক প্রকাশনার সুদিনে নিশ্চয় তাতে আরও শক্তি আর লাবণ্য যোগ হবে।

বই, মে ১৯৯৪

তুমি কি কেবলই ছবি

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা যাদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাদের একজন। কিন্তু তিনি যে চিত্রকর হবেন, তিন-চার হাজারের মতো ছবি তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এঁকে ফেলবেন এবং তা-ও জীবনের শেষ বারো বছরে দীর্ঘদিন সে সম্পর্কে তারও কোনো পরিষ্কার ধারণা অথবা অভিপ্রায় ছিল বলে মনে হয় না। ছোটবেলায় তিনি আর দশটা পড়ুয়ার মতো ড্রইং শিখেছেন, হয়তো মাঝেমধ্যে স্কেচ এঁকেছেন, নিসর্গের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সেগুলোর কোনো নমুনা অথবা উল্লেখ আমাদের চোখে পড়ে না। তবে ছবি আঁকা না হলেও সে সম্পর্কে তাঁর চিঠিপত্র অথবা আত্মজীবনীমূলক লেখা বা স্মৃতিচারণে দু-একটি মন্তব্য আছে। কিন্তু সত্যিকার নিষ্ঠা এবং তীব্রতা নিয়ে তিনি ছবি আঁকা শুরু করলেন বয়স যখন তাঁর ষাট পার হয়েছে। এত দেরি করে কেন তিনি চিত্রচর্চা শুরু করলেন– এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। দ্বিতীয় একটি প্রশ্নও এ সঙ্গে তোলা হয় এবং তা হলো এই : রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সময়ে অনুসৃত বা চর্চিত সকল চিত্রধারা থেকে একটি দূরবর্তী ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর চিত্রচর্চা করেছিলেন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর অনুমানভিত্তিক হতেই বাধ্য, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেননি। তবে শিক্ষিত একটি অনুমান এরকম যে, সাহিত্যচর্চাকেই তিনি তাঁর প্রধান কাজ বিবেচনা করেছিলেন এবং চিত্রকলাকে ঠাকুর পরিবারের অন্যদের (অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ) এবং তাঁর সময়ের অন্যান্য মেধাবী চিত্রকরের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ছবি আঁকার

ক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিন তাঁর উচ্চাশা ছিল না। হয়তো ভেবেছেন, যারা ভালো আঁকেন, তারাই আঁকুন; কিন্তু তাঁর প্রস্তুতি ছিল না—এমন কথা বলা যাবে না। তবে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে হয়তো কেন তিনি এত দেরিতে ছবি আঁকা শুরু করলেন, তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের ছবি ভারতীয় চিত্রকলার পূর্ববর্তী বা সমকালীন ধারাগুলো থেকে ছিল পৃথক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিকে ভাবপ্রধান করেননি, বরং আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার মতো আঙ্গিকপ্রধান করেছেন। নিজেই বলেছেন, তাঁর ছবি রেখা ও রঙের ছবি, ভাবের ছবি নয়। আঙ্গিককে প্রাধান্য দিতে গিয়ে টেকনিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; বর্ণলেপন, রেখাঙ্কন, বুনোট বা টেক্সচার- এসবের দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে স্বদেশ, বিশেষ করে স্বদেশের প্রকৃতি ও মানুষ এবং স্বদেশের রং তাঁর কাগজে ক্যানভাসে গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে তাঁর ছবি আধুনিক, কিন্তু তা উন্মূল নয় অথবা পশ্চিম— অন্বেষী নয়। এধরনের একটি সমীকরণে পৌঁছানোর জন্য হয়তো তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ঐতিহ্যের অথবা পশ্চিমা আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ— কোনোটিতেই নিজস্ব প্রতিভা ও মৌলিকতা থাকতে পারে না। এ মৌলিকতাটি বরং নিহিত আছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার একটি নতুন ব্যাখ্যায়। এ ব্যাখ্যা ব্যক্তির সময় ও দেশচিন্তাকে ঐতিহ্যের একটি মাত্রায় স্থাপন করবে, যে মাত্রাটি সকল সময়েই সমকালীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে যেমন, চিত্রকলায়ও তেমনি, আধুনিকতাকে এক নতুন এবং নিজস্ব ব্যাখ্যায় হাজির করেছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে এ 'সুন্দর ভুবন'কে ভালোবেসেছিলেন, তবে বিশ্বের সৌন্দর্য একটি শতদল পদ্মের মতো নিখুঁত নিটোল নিষ্কলুষ সৌন্দর্য নয়— এ উপলব্ধি তাঁর ক্রমশ গভীর হয়েছে।" তাঁর চিত্রকলায় এ অসুন্দর অথবা কলুষ তীব্রভাবে প্রতিফলিত। বস্তুত সাহিত্যে অসুন্দর, উদ্ভট, অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাগুলোকে কিছুটা রেখে-ঢেকে উপস্থাপন করলেও চিত্রকলায় সেই সংযম দেখানোর তাঁর প্রয়োজন হয়নি।

হয়তো রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, চিত্রকলাকে তিনি তাঁর সাহিত্যের পরিপূরক ও সম্পূরক হিসেবে নিলে যে কথাগুলো, ভাবনাগুলো,

প্রতিক্রিয়াগুলো তিনি তাঁর সাহিত্যে তেমন তীব্র ও ব্যাপকভাবে দিতে পারেননি, সেগুলো তাতে দিতে পারবেন। হয়তো এজন্য একসময় তাঁর চিত্রকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ, যখন তিনি সভ্যতার সংকট নিয়ে অনেক বেশি তাড়িত হচ্ছেন, সমকালীন রাজনীতি নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন [চার অধ্যায় এ সময়ের রচনা] এবং ভারতীয় শিল্পকলা নিয়েও কিছুটা হতাশ হচ্ছেন। ভারতীয় শিল্পকলায় তিনি মৌলিকতা এবং আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন, কিন্তু খুব বেশি শিল্পী এ দুই মানদণ্ডে তাঁর কাছে উৎরাতে পারেননি।

ছেষট্টি-সাতষট্টি বছর বয়সে নিয়মিত চর্চার তুলি হাতে তুলে নেওয়ার আগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলা বা আর্ট নিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন, যার একটি সংকলন খুব দীর্ঘ না হলেও গুরুত্ববহ। তাঁর শিল্প দর্শনের মূলে ছিল পূর্বাপরতা, অখণ্ডতা (খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডতাকে তুলে ধরা), একই সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে পরিমিতিবোধ এবং আনন্দ এবং বিভিন্ন রসের উৎসার তিনি কামনা করতেন। ১৮৯৪ সালের ১৩ জুলাই এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার মনে হয় বিশুদ্ধ আর্ট হচ্ছে ছবি ও গান, সাহিত্য নয়। মানুষের ভাষা, মানুষের তুলি ও কণ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি মুখর। সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিস মিশিয়ে ফেলি...'

'জাপান যাত্রী'তে ১৯১৬ সালে তিনি লেখেন, 'অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি, অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অরূপরাজ্যের কলা গান।' এরকম উদ্ধৃতি আরও অসংখ্য দেওয়া যায়, কিন্তু যে বিষয়টি তাতে প্রতিষ্ঠা পাবে, তা মূলত শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের, শিল্পের সীমাহীন শক্তির। শিল্পকলায় এর সবই যে প্রতিফলিত হয়, তা নয়। কিন্তু এর একটি শক্তি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় শেষ বয়সে তাঁকে চিত্রকলা চর্চায় ব্রতী করেছে এবং তা হচ্ছে জীবনকে নানাভাবে ব্যাখা করার এর ক্ষমতা। হয়তো বা ৬৬/৬৭ বছর বয়সে তিনি ভেবেছেন, একটু বিশুদ্ধ শিল্পের চর্চা করবেন এবং করতে গিয়ে একে জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার এক অনন্যপায় হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। সেজন্যই এত দেরি, সেজন্যই এত প্রস্তুতি।

১৯৩০-এ প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের প্রথম বড়মাপের প্রদর্শনী হয়। ইউরোপে তাঁর ছবির প্রশংসা এবং মূল্যায়ন যেভাবে হয়, নিজের দেশে সেরকম হয়নি। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি তাঁর কবিতা ও গান তুলে, তাঁর আধুনিকতাবাদী চিত্রকলাগুলো তার থেকে বিপরীত একটি ভাবমূর্তি তৈরি করে অনেকে সেটি মানতে নারাজ ছিলেন। আমেরিকাতে যখন রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হয়, সেখানেও তেমন আগ্রহ তৈরি হয়নি, মানুষ কবি রবীন্দ্রনাথকেই এগিয়ে রেখেছে সৃষ্টিশীলতার বিচারে। কিন্তু যত দিন গেছে, মানুষ তত বুঝেছে– রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কে একটি বৈশ্বিক মাত্রায় স্থাপন করে এর প্রকৃতি বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে নতুনত্ব ছিল, তাঁর শৈলীতেও ছিল তার ছাপ। তাঁর শৈলীকে বলা যায় সমসাময়িক আধুনিকতার প্রকাশে বিশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্য বুঝতে তাঁর ছবিগুলোর পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যও আমাদের সাহায্য করে। তাঁর কবিতার দৃশ্যপ্রতিমা, নিসর্গ বর্ণনা; তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাসের চরিত্রায়ন ও বাস্তবের বয়ান, তাঁর নাটকের দ্বন্দ্বসংকুলতা, তাঁর গানের আকুলতা, আনন্দ আর নিবেদনের আয়োজন, তাঁর খাপছাড়া কবিতা ও রচনার উদ্ভটতা এবং কৌতুকের প্রকাশ– সবই তাঁর চিত্রকলাতে ছায়া ফেলেছে, যদিও সংগত কারণেই চিত্রকলার ভাষাটি ভিন্ন একটি মাত্রায় বাঙ্ময় হয়েছে সেই 'মানসী বা 'সোনার তরী'র সময় থেকেই, যখন তিনি সক্রিয় চিত্রচর্চা শুরু করা থেকে কয়েক দশক দূরে, তাঁর কবিতায় যে নিসর্গ, তা তাঁর চিত্রকলায় এসে একই মহিমায় ধরা দেয়। অর্থাৎ ছবি আঁকার হাতটা কবি রবীন্দ্রনাথের হাতকে মাঝে মাঝে কবিতায় তুলির ভাষা এঁকে দিতে সাহায্য করেছে। তবে ১৮৯০-এর দশকে 'ছিন্নপত্র'র চিঠিগুলো লেখার সময় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রময়তা নিয়ে আবির্ভূত হন অনেক জোরালোভাবে। যেমন– শাহজাদপুর থেকে জুন ১৮৯১ সালে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ একটি ভিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। অদ্ভুত সেই স্বপ্নে তিনি দেখেছেন–

একদল অদ্ভুত লোক এসেছে.... তারা মানুষকেও বড় করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্য উমেদার হয়েছেন– তারা এঁদের মাথায় কী একটি গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুঁশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন।

ছিন্নপত্রের এ চিঠিটি আমরা একটু ব্যতিক্রমী বলে শনাক্ত করতে পারি। খেলাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন একটি স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নে চলছে মানুষের, বস্তুর, দালানের, শহরের নানা ফর্মের ভাঙচুর। মেয়েরা লম্বা হয়ে যাচ্ছে হুঁশ করে। দালান বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। আর শহরে চলছে নারকীয় শ্রীবৃদ্ধি। শহরের সঙ্গে নরক এবং এসবের সঙ্গে শয়তানের একটি যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে এবং এ উপাদানগুলো, তাদের ভিতরকার এ সম্পর্কগুলো আমাদের কাছে কিন্তু নিতান্ত কৌতুকের বশে নির্ণিত বলে মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, পুরো স্বপ্নটিই একটি খেলার বিষয়। বরং রোমান্টিক কবির বিপন্ন এবং বিপদগ্রস্ত জগৎটি যখন বাস্তবতার কঠিন আঘাতে আহত এবং অরক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন অশুভের আগমনে শঙ্কিত সেই কবির কাছে অনিবার্য একটি চিত্রকল্প বলে মনে হয় ওই স্বপ্নটি। এ চিত্রকল্পের চরিত্রটি আবার এমন যে, এটি সহজেই প্রতীকী একটি স্তরে বিন্যস্ত হতে পারে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসি কবিতায় নব্য রোমান্টিকতা দেখা দিয়েছিল প্রধানত চিত্রময়তা, আবেগধর্মিতা এবং শুভ অশুভের দ্বান্দ্বিক অবস্থাননির্ভর ভাবনার পুনরুত্থানের কারণে। প্রতীকবাদ বলে যে আন্দোলনটি এখন ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেই প্রতীকবাদ ওই নব্য রোমান্টিকতাকে অবলম্বন করেছিল, বাস্তবতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আর বোদলেয়ারের মতো আহত রোমান্টিকরা (বাইরে যে-পরিচিতিই তারা গ্রহণ করুক না কেন) অশুভকে দেখছেন অশুভ রূপেই– আতঙ্কিত হয়েছেন, আকর্ষণবোধ করেছেন। কিন্তু অশুভের টানে পঙ্কে তলিয়ে যাবার আগে নির্বাণের উপায় অন্বেষণ করেছেন আরেকবার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন অশুভকে, অনেকটা বোদলেয়ারের মতো। তাঁর ছিন্নপত্রের ওই পত্রে, স্বপ্নেই তিনি অনুভব করেছেন, অশুভের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চিত্তকে শুচি করতে হবে। তাই তিনি বড়দাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছেন উপাসনা করতে, ওই স্বপ্নে।

ছিন্নপত্র রচনার সময়কাল, ছিন্নপত্রের পটভূমি, এর চিন্তাভাবনা ও দর্শন, এর ট্রানসেনডেন্সের প্রয়াস– সবই আমাদের কাছে গুরুত্ববহ

মনে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তখন যাচ্ছে নানা ওলটপালট, প্রধানত শোকের ও বিচ্ছেদের নানা ঘটনা- স্ত্রীকে হারিয়েছেন, পুত্রকে হারিয়েছেন, হৃদয়ের দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, জমিদারি দেখাশোনার নামে বেরিয়ে পড়েছেন পদ্মা, আত্রাই ও গড়াইয়ের বিস্তীর্ণ জলপথে; ঘুরে বেড়িয়েছেন বোটে করে। কত রাত তাঁর কেটেছে একা, ওই নৌকায়। সেসবের কত বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন তাঁর চিঠিগুলোতে। পদ্মার ওপর বিস্তীর্ণ আকাশ, সেখানে অন্ধকার জমেছে কৃষ্ণপক্ষের। রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারের ভিতর দেখেছেন আরও অন্ধকার। হয়তো একটি স্তর ভেদ করে জেগে উঠেছে আরেকটি স্তর, হয়তো এক স্তর থেকে আরেকটি আলাদা করেছে হালকা ও সূক্ষ্ম একটি রেখা, যা আলোরও নয়, অন্ধকারেরও নয়। ওই সূক্ষ্ম সাদার ঘের, যা পদ্মার ওপর বস্তুর সঙ্গে বস্তুর প্রভেদরেখা, অথবা এক অস্তিত্বের সঙ্গে অন্য অস্তিত্বের বিভাজন টান, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ ওই বিভাজনরেখা ব্যবহার করেননি চিত্রকলায় এবং 'ছিন্নপত্র' পড়লে আমার মনে হয়, এটি তিনি ধার নিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব চিত্রভাবনা থেকে। কিন্তু বড় কথা এ ছিন্নপত্র তথা উনিশ দশকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবাস, আসলেই অপরিহার্য ছিল চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের জন্য, আরও সিকি শতাব্দী পরে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রায়শ জমিনটি আলোকিত। ফিগার/ফিগারগুলো অন্ধকার। অবশ্য ফুল বা পাখির চিত্রে এর উল্টোটিও দেখা যায়। পটভূমির অন্ধকার থেকে ফিগারের বা বস্তুর অন্ধকারকে আলাদা করার জন্য একটি সূক্ষ্ম সাদা রেখায় তিনি ফিগারের বা বস্তুকে ঘের দিয়ে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে আলো, যা আপাত দৃষ্টিতে নিসর্গ থেকে সঞ্চারিত, তা কিন্তু নিসর্গের নয়; আবার যে অন্ধকারে তিনি আচ্ছন্ন করে দেন মানুষ, পাখি, জন্তু ও প্রকৃতিকে, তা-ও প্রাকৃতিক নয়। আলো ও অন্ধকার উভয়ই অতিপ্রাকৃত, এদের উৎস অন্য কোনো জগতে, অন্য কোনো অনুভবের দেশে।

এ অন্ধকার মানুষের প্রবৃত্তির, তার শ্বাপদ-চেতনের। এ আলো মানুষের ভিতরের। এ আলোতে এসময়ের মানুষ শুচি হয়, কিন্তু

এতে বাস্তবতার ক্লেদও দৃষ্টিমান হয়। যে আলো ও অন্ধকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবিত হয়েছিলেন, যাদের আবিষ্কার করে তিনি মানুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, কবিতা থেকেও চিত্রকলা তাদেরকে তিনি অনেক সহজে অনেক নিশ্চিন্তে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ আলো-অন্ধকারে তো মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অধিকার। অথচ এদের চরিত্রটি এমন নয় যে সহজে বুঝে ফেলা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ আবার নির্ভর করেছেন আবেগের ওপর নয়, বুদ্ধির ওপর, এবং তিনি মুখ্য করেছেন জ্যামিতিকে। শিল্পের সবচেয়ে অন্তর্গত, সবচেয়ে জটিল অথবা বিমূর্ত– অথবা সবচেয়ে চিরায়ত বিন্যাসটিকে ধরে রাখতে পারে একমাত্র জ্যামিতি। পিকাসোর জ্যামিতি আমাদের খুব শক্তিশালী মনে হয়। মনে হয় পৃথিবীর সকল জ্যামিতি যেন এখানে। কিন্তু জ্যামিতি দ্যা ভিঞ্চির ছিল, টিশিয়ানেরও ছিল, ভ্যান গগেরও ছিল। আধুনিক চিত্রকলার তো জ্যামিতি মৌল একটি নির্মাণ ও প্রকাশ শর্ত। দ্যা ভিঞ্চির জ্যামিতি ছিল ফিগারের সঙ্গে ভূমির সম্পর্কে, টিশিয়ানের ছিল ফিগারের বহিস্থ পৃথিবীর সঙ্গে তার ভিতরের পৃথিবীর। রবীন্দ্রনাথের ছিল বস্তুর কর্মের সঙ্গে তার সারাৎসার বা নিকষিত রূপের। কখনো এর প্রকাশ হয়েছে 'জ্যামিতিক'–জ্যামিতি আর কীভাবে আসতে পারে! কিন্তু অন্যত্র এ প্রকাশ দুয়েকটি পৌনঃপুনিক মোটিফ-এ এসেছে (যেমন পুঞ্জীভূত গাছ, উল্লম্ব ফিগার, দুটি ফিগারের পরস্পর সংলগ্ন বক্রতার আকার এসেছে অতি প্রাকৃতিক আলোকের প্রক্ষেপণে, অন্ধকারের স্তরবিন্যাসে)। রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি শুধু ফর্মে, বস্তু বা ফিগারের পরিগৃহীত রূপে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জ্যামিতি প্রথমত অনুভবের, বস্তুর প্রাকচিন্তাকে, যে চিন্তা থেকে ওই বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। পরক্ষণে, অথবা সমান্তরালভাবে, বস্তুকে রূপ দেয়, চিন্তাকে ভাষা দেয়, সেরকম চিত্রকল্পে থাকে জ্যামিতি। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে সুমিতির অভাব দেখা যায়। ওই অভাব প্রথাগত জ্যামিতি-চিন্তাকে অতিক্রম করে একটি মৌল জ্যামিতি চিন্তা; যা ফর্মের বিন্যাসকে বিশ্বস্ত করবে কখনো জটিল, কখনোবা পরস্পরবিরোধী, বহু ভাবনার কাছে। সাধারণ একটি প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় শুভ-অশুভ, মঙ্গল

ও অমঙ্গলকে যে সত্যের কাঠামোয় বন্দি করা হয়, তা চিত্রকলায় কিভাবে আসে? এর উত্তর খুব সহজ নয়, তবে এ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে যে, তাদের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জ্যামিতিতে। প্রায়শ তাঁর ছবিতে যে উল্লম্ব ফিগার হু হু করে ওঠে যায় উপরের দিকে এবং প্রতিতুলনায় আভূমি বিছিয়ে থাকে জমি, প্রেক্ষাপট, একে অপরের আড়াআড়ি ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে ছবির এ দুই প্রধান পক্ষ, তাতে বিপরীত দুটি চেতনাও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ছবির প্রায় মাঝখানে, যেখানে তাঁরা পরস্পরসংলগ্ন, সেখানে আমাদের চোখ যায়। আর ওই স্পেসটুকুতে আমরা দেখি বহু বিচিত্র রেখার খেলা এবং ক্ষেত্রের সৃষ্টি। তাঁর অনেক ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে সাধারণ দর্শকের অস্বস্তি ছিল, – ওই যে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, সরীসৃপ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, সেসব ঠিক কোনো পায়রার খোপে ফেলে বিচার করা হবে, এ নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু আমরা দেখি, এমন জীবজন্তু পাখি যখনই আঁকেন রবীন্দ্রনাথ, তার চিত্রময়তা হয় তিরোহিত, যার বিপরীত ঘটে তাঁর কবিতায়। কিন্তু নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে দেখলে আমরা আবিষ্কার করব, ওইসব জন্তু-জানোয়ার আসলে অপার সম্ভাবনাময় নয়। বরং তারা নির্ধারিত, সীমাবদ্ধ তাদের জ্যামিতিক গঠনে। জ্যামিতি যখন প্রকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তা আবেগকে আশ্রয় করে ঋদ্ধি পায় না কখনো, তার জন্য প্রয়োজন হয় মননের, যুক্তির, পারম্পর্য, কার্যকারণ ও বৈজ্ঞানিক সূত্রের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাপড়িতে সাজান, জ্যামিতি এখানে তাঁর প্রধান সহায়ক এবং এ জ্যামিতিক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের জানান যে অশুভ আসলে অনন্ত নয়।

কাল্পনিক ও বাস্তব জীবন্ত পাখি, নিজের প্রতিকৃতি ও নারীমুখ বা মানুষের আদল—এগুলোর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন প্রকৃতির নানা চিত্র, ফুল, দর দালান বা কোনো স্থাপনা যার স্বরূপ অচিহ্নিত এবং সেই সঙ্গে কালি ও কলমের আঁকিবুকি সমৃদ্ধ কিছু ছবি যাতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির রূপ হয়তো দাঁড়ায়, অথবা দাঁড়ায় তাদের ছায়া। একটা রহস্যময়তা ঘিরে রাখে তাঁর ছবি ভাবের চিত্র নয়। রং ও রেখার ছবি, কিন্তু ভাবের নয়। কেন নয়, তা ছবিগুলোর দিকে একটু

অভিনিবেশ নিয়ে তাকালে বোঝা যায়। তিনি যত্ন করে ছবি আঁকতেন, কোনো কোনো ছবিতে হয়তো অনেকটা সময় নিয়ে কালি ও কলম অথবা তুলি চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু জোর দিয়েছেন রেখা ভঙ্গিমা ও রেখার গতিশীলতার ওপর; গুরুত্ব দিয়েছেন রঙের বিন্যাসকে, একটি রঙের সঙ্গে অন্য একটি রঙের সম্পর্ক অথবা অসম্পর্ককে। ফলে তার ক্যানভাসজুড়ে বোধের এবং বুদ্ধির একটা খেলা চলে। ছবিগুলোর কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, যেখানে একটা ভাব সকল প্রকাশকে ছাপিয়ে ওঠে প্রধান অভিব্যক্তিটি নির্মাণ করবে। বরং রবীন্দ্রনাথের একটি ছবির সর্বত্র আমাদের চোখ যায়; অনেক যে ছন্দ এবং গতিশীলতাকে তিনি প্রধান করে করেন অবয়ব নির্মাণ ও তার প্রকাশ বিশিষ্টতার মাধ্যমে, তাতে পুরো ছবিটাই আমাদের বোধে স্থান করে নেয়।

ভাবের বিষয়ে তাঁর এ অনাগ্রহ বোধহয় এ কারণে ছিল যে, ভাব একটা জায়গায় বোধকে আটকে দেয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির দর্শকদের থেকে চেয়েছেন গতিশীল অনুভূতি, সর্বগ্রাসী কল্পনা এবং বিশ্লেষী বুদ্ধি। রেখাকে গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং রেখাকে দুটি প্রধান উপায়ে চালনা করেছেন; কৌণিক এবং বক্রকৌণিক রেখা আড়াআড়ি, আলম্ব অথবা কাগজ-ক্যানভাসের এক কোনা থেকে অন্য কোনার উদ্দেশে ধাবিত; আর বক্র রেখাটি কখনো আধখানা চাঁদ বা পূর্ণ চাঁদের আদলে মুখ, স্তন, শরীরের কোনো অংশ বা বৃক্ষের উপরিভাগ, কখনো তা কৌণিকতাকে আশ্রয় করে ভেঙে বিচিত্র সব আকার নিয়ে (জীবজন্তু, পাখি ইত্যাদি) ফর্মের যোগান দেয়। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই এদের সহাবস্থানও লক্ষ করা যায়। রেখার এ দুই বিন্যাসে গতিশীলতা তীব্র এবং তা আসে রেখার তারল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। রেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতের আরেকটি কারণ তাঁর 'চিত্রলিপি'তে পাওয়া যায়। তিনি লেখেন–

> বিস্মৃতযুগে গুহাবাসীদের মন
> যে ছবি লিখিত ভক্তির কোণে
> অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে
> সেই ছবি আমি আপনার মনে
> করেছি অন্বেষণ।

গুহাবাসীর ছবিতে পরিচিত দৃশ্যাবলিই স্থান পেত, কিন্তু শিল্পীর রেখায় তা গতিশীল একটি মাত্রা পেত। সেই রেখা অনেক পরিশ্রমে তৈরি হতো, বিশেষ করে পাথরের দেওয়ালে শুধু চকখড়ির একটা দাগ দেওয়ার মতো নয়, বরং শক্ত হাতে পরিচালিত হতো প্রকৃতি থেকে আহরিত রং লেপনের হাতিয়ারটি। সেই রেখাতে জগৎকে বোঝার একটা চেষ্টা থাকত; চারদিকের বস্তু ও প্রাণ এবং সেগুলোর সঙ্গে আদান-প্রদান ও মোকাবিলা থেকে নির্ণিত অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সাজাবার একটা প্রয়াস থাকত। রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। গুহাচিত্রীর বিস্ময় ও আনন্দ আছে তাঁর ছবিতে, আছে রেখাকে পরিণত করে বস্তু এবং বিষয়ে প্রবেশ করার আয়োজন। এজন্যই হয়তো আপাতদৃষ্টিতে বিনয় নিয়ে, কিন্তু গূঢ় একটা অহংকার নিয়ে, ওই আদিম কৃতী গুহাচিত্রীর মতো তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি কি আর ছবি আঁকি। শুধু আঁচড়-মাচড় কাটি'।

রবীন্দ্রনাথের ছবির আধুনিকতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেকে তাঁকে পশ্চিমের চিত্রকলার মাপে বিচার করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, তাঁর ছবি বুঝতে পারবে পশ্চিমের শিল্পরসিক। ভারতীয়রা তাঁর ছবির সমঝদার হতে পারবেন না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দিরা দেবী বা নির্মলকুমার মহলানবিশকে লেখা নানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর ছবি সব পশ্চিমেই থাকবে, একটি ছবিও দেশে ফিরিয়ে নেবেন না। এর একটা কারণ ছবিগুলোর লাঞ্ছনা, যা 'অন্তঃপুরে' থাকতেই শুরু হয়েছিল এবং অযোগ্য অভাজনদের স্থূল হস্তাবলে। কিন্তু তাঁর ছবি পশ্চিমে রেখে যাওয়া মানে এ নয় যে, তিনি পশ্চিমা ঐতিহ্যের বেশ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর ছবিতে। একটা অর্থ এভাবে করা যায় রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ খেদ এবং আশাবাদের যে, 'গীতাঞ্জলি' যেমন সম্পূর্ণ অ-পশ্চিম একটি কাজ হয়েও পশ্চিমে সমাদর পেল, তেমনি তাঁর কাজও পূর্ব-পশ্চিমের কোনো নির্দিষ্ট ধারাতে না পড়েও, নিজের একটি ধারা সৃষ্টি করেও, নিজগুণে পশ্চিমা চিত্রমানসে জায়গা করে নেবে। সে সম্ভাবনা ১৯৩০-এ দেখা দিয়েছিল, পরের ২/৩ বছরও ছিল। তারপর পশ্চিম উদাসীন হতে শুরু করেছে তাঁর ছবি সম্পর্কে। তবে তাতে

তাঁর ছবির কোনো ইতরবিশেষ হয়নি। বরং গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর থেকে ভারত-বাংলাদেশে তাঁর ছবি নিয়ে যে উৎসাহ দেখা দিচ্ছে, তাতেই প্রমাণিত হয়েছে–রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে মনে রেখে ছবিগুলো আঁকেননি। এঁকেছেন নিজের দেশ, নিসর্গ, মানুষজন এবং জীবনকে মাথায় রেখেই।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আছে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব, চেনা এবং অচেনা পৃথিবী। তাঁর নিজের সময় এবং অনন্ত। কিন্তু এ যে তিনি বলেছিলেন, 'অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি, চারকোনা কাগজে ক্যানভাসে রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত অসীমের রূপকেই ধরার চেষ্টা করেছেন, এর সুরটি বাজিয়ে গেছেন। সেই অসীমের প্রকাশ যে রূপকে অবলম্বন করেই হোক না কেন।

সমকাল : কালের সেরা, ৩ মে ২০১৬

কাইয়ুম চৌধুরী : ফিরে দেখা

আশি বছর বয়সে খুব হঠাৎ করেই পৃথিবীকে বিদায় জানালেন কাইয়ুম চৌধুরী। এতটাই হঠাৎ ছিল তাঁর চলে যাওয়া যে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে তাঁর বন্ধুজনের, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের, তাঁর গুণমুগ্ধদের। ঢাকায় একটি উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনে তিনি ছিলেন বক্তা। বক্তৃতা দেওয়া শেষ হলে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। আবার একটি 'না বলা' কথা বলার জন্য মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কথা বলা শুরু করলেন, কিন্তু থেমে গিয়ে ঢলে পড়লেন। বরাবর কাপড়-চোপড়ে সৌখিন ছিলেন। চেহারাও ছিল সৌম্য শান্ত। খেলা হাসির পাখি। সে সন্ধ্যাতেও তাঁর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। আমি সেই অনুষ্ঠানে ছিলাম না, কিন্তু একজন আমাকে ই-মেইলে তাঁর ওই না-বলা কথা বলার মুহূর্তটির একটি ভিডিও পাঠিয়েছিল। আমার কম্পিউটারে এক মিনিটের ওই ভিডিওটি একবার দেখেই আমি সেটি মুছে ফেলেছি। তবে তার আগে মনে হয়েছে, কাইয়ুম চৌধুরীর এ চলে যাওয়াটা তাঁর জীবনের মতো, ছবির মতো পরিপাটি।

এই হঠাৎ চলে যাওয়াটাই তাঁকে মানায়। তাঁর ছবিতে যেমন, জীবন প্রকাশিত সতেজ এবং শক্তিমান ভঙ্গিমায়; মানুষ-প্রকৃতি দেশের নানা উদ্‌যাপনের সাবলীল এবং সুঠাম ভঙ্গিটি প্রতিফলিত, তা যেন তিনি নিজের ভিতরে ধারণ করে চলে গেলেন। আশি বছরের কেউ ইহলোক ছেড়ে চলে গেলে আপনজনও একটা সান্ত্বনা পায়—অনেক

দিনই তো থাকা হলো পৃথিবীতে। সেজন্য শোকটাও তেমন প্রবল হয় না। কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরীর ক্ষেত্রে তেমনটি বলা যাবে না, তাঁকে আমি অশি বছরের তরুণ বলেই জানতাম। একজন তরুণ শিল্পী অবেলায় চলে গেলে– যেমন গেছে ছাপচিত্রে জাদু জাগানো শিল্পী ফখরুল ইসলাম– যেমন কষ্ট হয়, ক্ষোভ হয়, তেমন হয়েছে কাইয়ুম চৌধুরীর বেলায়। 'প্রথম আলো'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি, এর সাহিত্য সাময়িকী, বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদিতে ছাপানো গল্প-কবিতা-নিবন্ধের শিরোনাম-ছবি আঁকতেন এবং ছবি আঁকার আগে সেসব পড়তেন। 'প্রথম আলো'র সাহিত্য সাময়িকীতে আমার একটি গল্প ছাপা হয়েছিল 'উজানিবেলা' নামে। গল্পটি তিনি পড়েছিলেন, তবে এর জন্য শিরোনাম-ছবি তিনি এঁকেছিলেন কিনা, ঠিক মনে পড়ছে না। এরপর আমার সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন, 'উজানিবেলা' কথাটি তাঁর খুব মনে ধরেছে, যদিও আগে কখনো তা শোনেননি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি উজানিবেলার মানুষ। আমি তাঁকে কখনো ভাটিবেলাতে আছেন বলে ভাবিনি। তাঁর জানাশোনা সবারই ছিল সেই অবস্থান। সেজন্য তাঁর চলেও যাওয়া মেনে নিতে মন চায়নি। এখনও কষ্ট পেতে হয়। তাঁর কাজের জায়গাটা ছিল বিশাল। সেখানে একটা শূন্যতা জমেছে। সেই শূন্যতা কোনোদিন ভরাট হওয়ার নয়।

গত বছর নভেম্বরের ২১ তারিখ কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তিনি এসেছিলেন আমার ছেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায়। এর আগে আমি তাঁকে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, বলেছিলাম তাঁর পুরনো ঢাকার বাসায় আমন্ত্রণপত্র হাতে নিজে গিয়ে দেখা করার অক্ষমতা মার্জনা করতে। তিনি হেসে বলেছিলেন, সবাইকে বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানালে অনুষ্ঠানটি এর পরের বছর নভেম্বর করতে হবে। তাঁর সামান্য অসুস্থতা ছিল, কিন্তু ২১ নভেম্বর যখন অনুষ্ঠানে এলেন তাঁকে দেখাচ্ছিল সেই উজানিবেলার মানুষ। একটা টেবিলে বসে অনেকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলেন, টুকটাক কথা বলেছিলেন। নবদম্পতিকে একটা ড্রইং উপহার দিয়েছিলেন। ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, আবার দেখা হবে।

কাইয়ুম চৌধুরীর ছবি নিয়ে কিছু লেখার বা বলার সময় ব্যক্তি কাইয়ুম চৌধুরী সামনে চলে আসেন। জীবনে তিনি যেরকম একটি প্রসন্নতা ধরে রাখতেন; কথাবার্তা, চালচলনে পরিচ্ছন্ন একটা ভাব বজায় রাখতেন, ছবিতেও তাই। তাঁর অনেক ছবি আছে কষ্টের, ক্রোধের, শোকের, কিন্তু সেগুলো ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে তাঁর জীবন ও প্রকৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও শুভবোধ, নারী ও প্রান্তিক মানুষের উদ্‌যাপন। জীবনে তাঁরও যে কষ্ট-দুঃখ ছিল না, তা নয়, বঞ্চনাও নিশ্চয় ছিল! কিন্তু সেসব গৌণ করে তিনি প্রতিদিন জানান দিতেন শক্তির, আনন্দের, ভালোবাসার এবং প্রাপ্তির। তিনি যে খুব কথা বলতেন, প্রাণোচ্ছলতা দেখাতেন, তা নয়। বরং অনেক আড্ডাতেও দেখেছি, চুপচাপ বসে শুনছেন, অল্প অল্প কথা বলছেন, কিন্তু মুখে হাসিটা ধরে রেখেছেন। মানুষটা তিনি এমনই ছিলেন যে কথা না বললেও মনে হতো অনেক কথাই যেন বলা হয়ে যাচ্ছে। খুব উদ্দীপনামূলক ছিল তাঁর উপস্থিতি। আর যখন কোনো বিষয়ে বলতেন, খুব প্রত্যয় নিয়ে বলতেন, গুছিয়ে বলতেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিষয়টি– তা গ্রামের, প্রান্তজনের অথবা শহরের এবং মধ্যবিত্তের হোক– তিনি খুব ভালো জানতেন। ইতিহাসের ওপরেও তাঁর দখল ছিল। আর বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের শুরুর দিকের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে এ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা, প্রশংসনীয় দখল। অনেক আড্ডায় তাঁকে আমাদের শিল্পের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। আমার অনেক জানা হয়েছে। একবার মোহাম্মদ কিবরিয়াকে নিয়ে একটি বই লিখতে গিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি। দ্বারস্থ বলতে দ্বারস্থই। নয়াপল্টনের জোনাকি সিনেমা হলের পাশে গাজি ভবনে তাঁর ফ্ল্যাটে, যেটিতে ছিল তাঁর স্টুডিও। তিনি ছবি আঁকছিলেন, আর আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কাইয়ুম চৌধুরী আর কিবরিয়া ছিলেন দুই ভুবনের শিল্পী, অথচ কিবরিয়ার ছবি নিয়ে তাঁর চমৎকার সব পর্যবেক্ষণ ছিল, কী গভীরভাবে কিবরিয়ার ছবির বিষয়শৈলী-রেখা-বুনোট এসব তিনি পড়েছিলেন।

যে দুই ভুবনের কথা বলা হয়, বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার দিগন্ত ছুঁয়ে ছিল তাদের বিস্তার। তবে এ দুই ভুবনের বাসিন্দারা যে একে অপরের সীমানায় ঢুকে পড়তেন না, চাইতেন না বা

পারতেন না, তা কিন্তু নয়। অনেক শিল্পীই ছিলেন দুই ভুবনের বাসিন্দা, আরও অনেকে প্রায় সকলে– এক ভুবনে স্থিতি নিলেও অন্যভুবনে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন কখনো কখনো। এখানেই ছিল বাংলাদেশের শিল্পকলার শক্তি, যে শক্তি এখনও প্রাণবন্ত করে রেখেছে আমাদের শিল্পকলাকে। কিবরিয়ার ভুবন ছিল ঝকঝকে আধুনিক, পশ্চিমা আধুনিকতার অনেক উপাদানই ছিল সেখানে। এ আধুনিকতা বিষয়কে প্রকাশ করে ফর্মের বৈচিত্র্যে, করণ-কৌশলে। এসব ফর্মের এবং কৌশলের উৎপত্তি আধুনিকতার স্বাতন্ত্র্য চিন্তায়। বিমূর্ততা, প্রকাশবাদিতা, জ্যামিতির নানা সূত্র এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি এসব ফর্ম ও কৌশল চিন্তার পিছনে সক্রিয়। রঙের ক্ষেত্রেও এ ভুবনবাসীরা হিসাবি। কিবরিয়ার ছবির ধূসর নীল আধুনিক মানুষের অবস্থানটাই তুলে ধরে। পশ্চিমা শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার চরিত্র লক্ষণ হিসেবে যেসব অবস্থার কথা বলা হয়, যেমন– বিচ্ছিন্নতা, একাকি, বিশ্বাসের ঘরে শূন্যতা, পারক্যবোধ ইত্যাদি, সেসব বাংলা কবিতা উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে, পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলাদেশের চিত্রকলাতেও। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় সমকালের 'বিকার-বিক্ষোভ-ক্লান্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, রশিদ করিমের চেতনাপ্রবাহ শৈলীতে লেখা একটা উপন্যাসের নাম 'বড়ই নিঃসঙ্গ'। আধুনিকতা খুব জোরেসোরে মানুষের মনোজগৎ, তার চিন্তা-উদ্দীপনা-আদর্শ-সংগ্রামকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করেছে সেই রেনেসাঁসের আমল থেকে এবং আরও জোরেসোরে আঠারো শতকের জ্ঞানালোক প্রাপ্তির যুগ থেকে, তাতে একটা বিশাল প্রত্যয় ছিল, আস্থা ছিল মানুষের নিয়তি নিয়ে– 'প্রগ্রেস' বা ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন, যুক্তি-তর্ক-বিজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যটা অধিকার করা নিয়ে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ থেকেই তো শুরু হলো এ 'প্রগ্রেস' নিয়ে, মানুষের অগ্রযাত্রা নিয়ে সন্দেহ। বোদলেয়ার তো লিখেই ফেললেন মানুষের অশুভ নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ সেই ১৮৫৭ সালে। আর যখন ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ হলো, শতাব্দী শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়র যুদ্ধ হলো, কুড়ি শতকের শুরুতে ইউরোপে সংঘাত ঘনিয়ে এল, আয়ারল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ হলো এবং সবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলো, মানুষ দেখল, মানবশক্তিকে

ব্যঙ্গ করে দানবশক্তিরই জয় হলো। এরপর বিশ্বাসের ঘরটা কি করে ধনধান্যে ভরা থাকে? কোন ভরসায় বলা যায় মানুষ অমৃতস্যপুত্রা?

আধুনিক শিল্পসাহিত্যের ভিতরটাতে আছে একটা শূন্যতা, অবসাদ, বিষাদ এবং অবিশ্বাস, এরই প্রকাশ ঘটেছে নানা শৈলী-কৌশল এবং আঙ্গিকে। কিবরিয়া-আমিনুল-দেবদাস এবং অন্য অনেকে এসব ব্যবহার করেছেন, এঁদের আগে শফিউদ্দিন করেছেন (পরের শিল্পীদের তালিকাটা তো বিরাট)। ভাবতে অবাক লাগে, জয়নুল আবেদিনের এবং তাঁর কয়েক সহযোগীর হাত ধরে যে শিল্পচর্চা শুরু হলো ১৯৪৮ সালে, মাত্র দশ বছরেই তা আধুনিক শিল্পকলার মেজাজ-মনন ও প্রকাশভঙ্গিগুলো কী সুন্দর অধিকার করে নিল ।

জয়নুল আবেদিনের প্রসঙ্গ এল—বাংলাদেশের শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে চলে আসে এবং এর সূত্র ধরে বলা যায়, তিনিও আধুনিক শৈলীর চর্চা করেছেন একসময়, কিন্তু ভেবেছেন দেশজ ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনটা অনেক জরুরি এবং সেইখানেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এ জায়গাটাই আমাদের শিল্পকলার আরেকটি অথবা বলা যায়, মূল ভুবন। এ ভুবনেই ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। এর ভূগোল নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে সক্রিয় ছিলেন, একে নিরন্তর সমৃদ্ধ করে গেছেন। তবে এমন নয় যে আধুনিকতার অন্য ভুবনটাতে তিনি পা দেননি। দিয়েছেন এবং এর জ্যামিতিমনস্কতাকে কখনো কখনো কাজেও লাগিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ পেয়েছেন বাংলা শিল্পকলার ঐতিহ্য থেকে, মূল থেকে, লোকজ চর্চা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সমকালকে ব্যাখ্যা করতে। এজন্য তাঁর ছবিতে আল্পনা, শীতল পাটি, নকশি কাঁথা, শখের হাঁড়ি, মাটির পুতুল, সচিত্র হাতপাখাসহ অসংখ্য লোকজশিল্পের শিল্পী কারিগরদের শ্রেষ্ঠ চর্যাগুলোর উপস্থিতি। অথচ এ চিরায়ত সৃজনচিন্তাগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের সময়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে কত সাবলীলভাবেই না প্রকাশ করতেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের কেউ কেউ এরকম একটি ধারণা পোষণ করেন যে,

গ্রামীণ বা লৌকিক বিষয়গুলো আধুনিকতার বিপরীতার্থক, অর্থাৎ আধুনিকতার মাপকাঠিতে এগুলো পড়ে না। শিল্প নিয়ে যারা লেখেন, তাঁদের দু-একজনের লেখাতেও এরকম একটি আভাস আমি পেয়েছি। এটি ধোপে টেকে শুধু যদি আধুনিকতাকে আমরা কুড়ি দশকের বিমূর্ত এবং প্রকাশবাদী প্রবণতার বিচারেই সংকীর্ণ করে ফেলি (কিন্তু তাও তো শেষপর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যখন দেখি আধুনিক শিল্পকলার এক গুরু পিকাসোর চিত্রকর্মে আফ্রিকার লোকশিল্প প্রভাব খাটায়, অন্তত একটা পর্যায়ে)। এরকম ধারণার উৎপত্তি আধুনিকতাকে সময়কালের একটি সাম্প্রতিক (এক শ-সোয়া শ বছর আগে থেকে) আবর্তনে বন্দি করে ফেলা থেকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আধুনিকতা হচ্ছে চলমান সমসাময়িকতার একটা প্রকাশ। শেক্সপীয়র তাঁর সময়ে আধুনিক ছিলেন। আজ চারশ বছর পরও তিনি সমান আধুনিক। জয়নুল আবেদিন ছিলেন আধুনিক একজন শিল্পী, তাঁর নিজের সময়টা—সেই ত্রিশের দশক থেকে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছবিতে, যে তীব্রতা, শাণিতবোধ থেকে ক্ষোভ, বিদ্রূপ এসবও ছিল—তা ইউরোপীয় অনেক আধুনিক শিল্পীর কাজেও দেখা যাবে না। তাঁর ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ছবিগুলো? তাঁর বিদ্রোহী ষাঁড়টি, তাঁর নিত্যদিনের সংবেদী প্রকাশগুলো?

কাইয়ুম চৌধুরী এ জায়গাটাতে জয়নুল আবেদিনের অনুগামী। তিনিও এঁকেছেন মানুষের শোষণের-সংগ্রামের ছবি, গ্রামের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনের পিছনে উঁকি দেওয়া অপ্রাপ্তির অথবা ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার ছবি। তাঁর প্রকৃতি চিত্রায়ন সবসময় ছিল একাধারে সুললিত এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃতিকে উপজীব্য করে আঁকা তাঁর অনেক ছবিতে একটা অস্বস্তিও যেন আমি দেখি, যেন তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করতেন, এ প্রকৃতি কি এরকম থাকবে চিরদিন, নাকি মানুষের লোভের এবং বস্তুজীবনের ছায়া পড়বে এর সবুজ বিস্তারের ওপর? একবার এক দ্বিবার্ষিক এশীয় শিল্পকলা আয়োজনের সেমিনার সভা শেষ হওয়ার পরদিন বুড়িগঙ্গায় শীতলক্ষ্যায় বিদেশি অতিথি এবং দেশের শিল্পী ও শিল্পলেখকদের লঞ্চভ্রমণে আমিও ডাক পেয়েছিলাম। শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক সুবীর চৌধুরী সেই ডাক পাঠিয়েছিলেন। লঞ্চের ডেকে বসে কাইয়ুম চৌধুরী জলরং

ছবি আঁকছিলেন। নদীপারের দৃশ্যাবলি। আঁকতে আঁকতে আমাদের কয়েকজনকে বললেন, এ নদী বেশিদিন থাকবে না। এ দৃশ্যাবলিও না। এ কয়েকজনের মধ্যে কালিদাস কর্মকার ছিলেন, মাহমুদুল হক ছিলেন, আরও কারা কারা ছিলেন। কালিদাস বলেছিলেন, নদীটা তাহলে তখন শিল্পীরা কল্পনা করে আঁকবেন। কালিদাস কর্মকার নদী খুব ভালোবাসেন। নদীর পানিতে তিনি শুয়ে থাকতে পারেন। তাঁর সঙ্গে একদিন ষাটনলে নদীতে নেমে ভেসে থাকতে চেষ্টা করেছি। কয়েকবার কসরত করে রণে ভঙ্গ দিয়েছি। কালিদাস যখন বলছিলেন কল্পনা করে আঁকার কথা, আমার মনে প্রশ্ন জাগল, লৌকিক শিল্পের অনেক উপকরণই তো হারিয়ে গেছে। কথাটি কাইয়ুম ভাইকে (এ নামেই তাঁকে ডাকতাম) বলতেই একটুখানি হাসলেন। বললেন, আমাদের কল্পনায় এসব উপকরণ, এগুলোর মোটিফ, নকশা সবই গেঁথে রয়েছে।

নদীপারের দৃশ্য আঁকছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। সবুজটা আমার অনেক গাঢ় মনে হলো, যেন ওই সবুজের ভিতর একটা ছায়া জমেছে।

তবে কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন আশাবাদী মানুষ। শিল্পের শুদ্ধতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। মানুষের সম্ভাবনায় তিনি প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ যদি তার মূলটাকে চিনতে পারে, যদি সেই মূল থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, তবে সময়কে মোকাবিলা করতে সে সাহস নিয়ে নামবে। এ মূল রয়েছে গ্রামে, প্রকৃতিতে; আমাদের জাতিসত্তায়, আত্মপরিচয়ে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এবং বিশাল তেজ নিয়ে ইতিহাস জয় করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাঙালির জেগে ওঠায়। মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকতে তিনি আনন্দ পেতেন। এমনকি যখন তাঁর দশটা বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকার কাজ থাকত, তিনি যদি দেখতেন এর কোনটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, তাহলে সেটিই প্রথম বেছে নিতেন। নারীকে তিনি দেখতেন এক ভিন্ন উচ্চতায়। আমাকে যা তৃপ্তি দেয়, সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে, শিল্পকলার অনুরাগী হিসেবে, তা হচ্ছে সমাজ নিরন্তর নারীকে নির্যাতন করলেও তার আত্মপ্রকাশের সবগুলো পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও এবং তাকে পুরুষতন্ত্রে বাধ্য প্রজাতে পরিণত করার চেষ্টা করে গেলেও আমাদের শিল্পী-

লেখক-সাহিত্যিকরা তাদের দেখেছেন ভিন্ন চোখে। জয়নুল-কামরুল হাসানের নারীদের কথাই ধরুণ অথবা শামসুর রাহমান, হাসান আজিজুল হকের নারীদের কথাই ধরুণ। কত বিচিত্র অবস্থান তাদের। জীবনে কত যে তাদের সংগ্রাম। কিন্তু সব ছাপিয়ে তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে, শ্রেণি হিসেবে নয়। তারা সাহসী, প্রত্যয়ী, আত্মসচেতন এবং নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান। সকল নারীই যে তাই, তা নয়; কিন্তু কয়েকজনও যদি থাকে তারাই তো একটা শক্তির স্ফূরণ ঘটায়। এ শক্তিই উপস্থিত এবং এ উপস্থিতি জানান দেয়, এটিই হওয়া উচিত নিয়ম। উপস্থিত নয়, যা অনুপস্থিতের কাতারে যা পড়ে, তা হয় সমাজের জন্য, নারীর জন্য নয়। এ উপস্থিতি ঘোষণা দেয়, অনুপস্থিতিটা ব্যতিক্রম। এটি বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

হয়ও নি। এখন সমাজে নারীর যে অবস্থান, তা দশ বছর আগে থেকেও ভিন্ন। এ দশ বছরে নারী এগিয়েছে, যে সম্ভাবনা পঞ্চাশের দশকেই শিল্পী-লেখক-সাহিত্যিকরা দেখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নিয়ে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। লাল, সবুজ, হলুদ নিয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। শুধু যে প্রকৃতির রং এবং মনটা সেগুলোতে প্রতিফলিত, তা নয়–এসব রঙে তিনি পেতেন আনন্দ এবং দ্রুতি এবং উদ্‌যাপনের তাড়া। তিনি ক্রমাগত প্রকৃতিকে, মানুষকে, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশকে উদ্‌যাপন করে গেছেন। শুধু প্রকৃতি নিয়ে নয়, অবয়বধর্মী অসংখ্য কাজ তিনি করেছেন, মানুষের সঙ্গে প্রাণী ও পাখি, মাছ ও পতঙ্গ। আরও এঁকেছেন নৌকা এবং গ্রামবাংলার নানা বাহনের ছবি। তাঁর ছবিতে মানুষ কর্মী এবং পরিব্রাজক, জীবনের কাজে ব্যস্ত এবং অবসরের মুহূর্তে নিমগ্ন। কাইয়ুম চৌধুরী একদিকে যেমন প্রকৃতি ও স্বদেশের ছিলেন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক, তেমনি মানবচরিত্রের পাঠক, যদি কোনো ছবিতে– যেখানে প্রকৃতি প্রধান চিন্তাস্থিতির দেখা পাওয়া যায় অন্য ছবিতে–যেখানে মানুষ প্রধান উপজীব্য–গতির দেখা মেলাটা অবধারিত। এ গতি জীবনের, কাজের এবং সাধনার। স্থিতি ও গতি, অবয়ব ও কাজ, উদ্‌যাপন ও কৃত্য–

এরকম দ্বিত্বতায় সাজানো থাকে তাঁর ছবি, এবং তাতে বাস্তবকে ঠিক যতখানি বাস্তবতার নিরিখে আমরা পাই, কল্পনাকেও পাই তৃতীয় একটি মাত্রা হিসেবে। কাইয়ুমের ছবিতে কল্পনা সর্বগামী এবং এ কল্পনা জীবনবাস্তবতাকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যায়, তা কষ্টকর অভিঘাতগুলো ভুলিয়ে দেয়।

কাইয়ুমের রং নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, রংকে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং রঙের হাতে তাঁর ছবির ভাব ভাবনা ও দর্শনকে অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর ছবিতে অনুজ্জ্বল রং নেই, নিষ্প্রভ রং নেই, কারণ তার শিল্পদর্শন মানুষ ও জীবনের বাস্তবতা ইতিহাস এবং প্রকৃতির অনস্বীকার্যতাকে কেন্দ্র করে উন্মোচিত। তাঁর রং, আমি আগেই বলেছি, বলিষ্ঠ, কারণ তিনি সত্যের বিষয়গুলোকে জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। তাঁর রং একদিকে প্রকৃতির চিরায়ত রূপ এবং প্রকৃতির শক্তিকে যেভাবে উপস্থাপনা করে অন্যদিকে তা মানুষের মনোজগতকে এবং তাঁর কল্পনাকে শক্তি ও সম্ভাবনার একটা জায়গা থেকে উন্মোচিত করে। প্রকৃতি ও মানুষের আখ্যান নির্মাণে রং হচ্ছে কাইয়ুমের বিশ্বস্ত আধেয়। খুব বেশি রঙে তিনি বিচরণ করেননি– তাঁর ছবিতে বেগুনির উপস্থিতি কবে দেখেছি মনে নেই কিন্তু যতগুলো রং ব্যবহার করেছেন, প্রত্যেকটির সম্ভাবনা ষোলআনা আদায় করে নিয়েছেন।

কাইয়ুম চৌধুরীর জ্যামিতি নিয়ে কথা উঠেছে। কেউ বলেছেন, এতে তাঁর আধুনিকতার একটি প্রকাশ ঘটেছে, কেউ বলেছেন, জ্যামিতি তাঁর নকশা ও বিন্যাস, রেখা ও ফর্মকে গতিশীল করেছে। উভয় বক্তব্যই সঠিক। এ বিষয়টা তো স্পষ্ট যে, লোকজ মোটিফের বাইরে গিয়ে তিনি তাঁর জ্যামিতিক বিন্যাসকে যেমন কৌণিকতা, উল্লম্ব অথবা ত্রিভুজ বা অন্যান্য আকৃতিকে শাণিত একটি রূপ দিয়েছেন এবং যেসব ছবিতে এ জ্যামিতি বর্তমান, যেগুলোতে তিনি সমাবেশ ঘটিয়েছেন একাধিক চিন্তার, সেগুলো সমকালের নানা সমস্যা-সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত। তিনি যখন তাঁর জ্যামিতির ভিতর সূত্রগুলো তুলে আনতেন, সেটি হতো একটি

সচেতন প্রয়াস। তাঁর উদ্দেশ্য থাকত, লোকজ চিন্তার পরোক্ষে থাকা এসব নকশা-বিন্যাসে এ সময়ের কিছু ভাবনা-উদ্বেগ অস্থিরতাকে তুলে ধরা এবং তাদের একটি স্থির কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া। এ স্থির কেন্দ্রটি হবে নির্বাণের একটি ঠিকানা। কাইয়ুমের আধুনিকতা ছিল সময়কে নানা মাত্রায় দ্যোতনা দেওয়া। নিত্য-অনিত্য, শুভ-অশুভ এবং আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বগুলোকে সমকাল-চিরকালের নিরিখে পুনঃপরীক্ষা করা। এ জন্য তাঁর ছবিতে ঐতিহ্য এতখানি গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু ঐতিহ্য যদি বর্তমানকে ধারণ করতে পারে এবং বর্তমান ঐতিহ্যকে, তাহলে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতের ফয়সালা হয়ে যায়।

সুবীর চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেছি, আবারও করতে হচ্ছে কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগের জন্য। সুবীর বেঙ্গল গ্যালারির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়াতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। কাইয়ুম চৌধুরীর যাওয়ার কথা ছিল সেই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে, কিন্তু অস্ট্রেলীয় দূতাবাস তাঁকে ভিসা দেয়নি, সুবীর মাত্র দু'দিনের জন্য মেলবোর্ন থেকে ঢাকা এসে কাইয়ুম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছে, ভিসা জটিলতা নিরসন করেছে এবং ফিরে গেছে মেলবোর্নে। সেখানেই হঠাৎ তাঁর দেহাবসান। ঢাকায় তাঁর মরদেহ আনা হলে বেঙ্গল গ্যালারিতে সুবীরের স্মরণে একটি সভা হয়। সেখানে তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন কাইয়ুম চৌধুরী। সভা শেষে তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সুবীর আমার অনুজপ্রতিম, তাঁর বিদায়ে বড় একটি আঘাত পেয়েছিলাম। কাইয়ুম ভাই কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলেছিলেন, আমারও বোধহয় যাওয়ার সময় হলো।

কাইয়ুম চৌধুরীর অনেকগুলো প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল সুবীর। তাঁর কাজের অসম্ভব ভক্ত ছিলেন তিনি এবং অনেক প্রদর্শনীর ব্রোশিয়ারে কাইয়ুম ভাইকে নিয়ে লেখার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিত সুবীর। আমি আনন্দিত মনে লিখতাম, আর ভাবতাম, এত অফুরান প্রাণশক্তি কাইয়ুম ভাইয়ের, নিশ্চয় আরও প্রদর্শনী হবে। আবারও লিখব।

কিন্তু সুবীর নেই, কাইয়ুম ভাইও নেই। তাঁর কাজের প্রদর্শনী হয়তো হবে, কিন্তু আনন্দ নিয়ে আমি এর ব্রোশিয়ার লিখতে পারব না। তাঁর বয়স হয়েছিল, কিন্তু চলেই যে যাবেন, তা ভাবিনি।

তাঁকে নিয়ে লিখব এবং অতীত কাল ব্যবহার করব, এটিও ছিল অবাস্তব চিন্তা। অথচ এ লেখাটিতে তা-ই ঘটেছে। তারপরও নিজেকে সান্ত্বনা দেব, কাইয়ুম ভাই চলে গেছেন বটে, কিন্তু তিনি আছেন। তাঁর কাজ তাঁকে অমর করে রাখবে।

অন্যদিন, কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা, ১৬ এপ্রিল ২০১৫

পাঁচ পথিকৃৎ শিল্পী এবং একটি লুপ্ত ঐতিহ্য

১.

১৮ মে শুরু হতে যাওয়া পাঁচ শিল্পীর কাজ ও কালিঘাটের পটচিত্রের চিত্রপ্রদর্শনীটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রদর্শনী শুরুর দিনটি আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস হিসেবে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে। এবার জাদুঘর দিবসের স্লোগান হচ্ছে, 'সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নে জাদুঘর'। জাদুঘর সম্পর্কিত পুরনো একটি ধারণা হচ্ছে, এখানে সময় স্থবির এবং এর সম্পর্ক শুধু অতীতের সঙ্গে। পশ্চিমে এ ধারণাটি অনেকদিন আগে পাল্টে গেলেও এ উপমহাদেশে এখনও জাদুঘরকে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবেই সাধারণত দেখা হয়, সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুঁজতে কেউ আগ্রহী হন না। অথচ আমরা জানি, জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রত্নসামগ্রী ও ঐতিহাসিক নিদর্শন একটি সমাজের বিভিন্ন সময়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অন্যান্য অবস্থানে প্রতিফলন ঘটায়; ওই সমাজের অগ্রসরমানতা বা অনগ্রসরতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। তাছাড়া জাদুঘরকে এখন একটি 'কমিউনিটি স্পেস' বা সামাজিক কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এরকম নানা বিষয় নতুন করে ভাবার একটি সুযোগ এবারের আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস আমাদের করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এ বছর ঢাকা শহর তার ইতিহাসের চারশ বছর অতিক্রম করছে। একটি শহরের জন্য চারশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন জীবন কাটানো সহজ কথা নয়। মানুষের মতো জনপদেরও জীবন-মৃত্যু

আছে। ঢাকা অনেক সময় আক্রান্ত হয়েছে, ম্রিয়মাণ হয়েছে, কিন্তু টিকে থাকার সংগ্রামে বরাবরই জিতেছে। এ প্রদর্শনী ঢাকার অমেয় জীবনশক্তি এবং এর সংগ্রামমুখর ইতিহাসকে অভিবাদন জানানোর একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, জাতীয় জাদুঘর তার সংগ্রহে থাকা শিল্পকলার–বিশেষ করে চিত্রকলার মূল্যবান ভাণ্ডারটি ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, প্রদর্শনীটি সে লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের পথিকৃৎ আধুনিক শিল্পীসহ অনেক বরেণ্য শিল্পীর কাজ সংগৃহীত আছে। পাশাপাশি, উপমহাদেশের বিখ্যাত এমন দু'একজন শিল্পীর কাজ এবং ঐতিহ্যগত শিল্পধারার কিছু নমুনা সংরক্ষিত আছে, যাদের সঙ্গে চিত্রকলার দর্শক এবং শিক্ষার্থীদের পরিচয় শুধু এগুলোর ফটোগ্রাফি, পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে। এ প্রদর্শনীতে যামিনী রায়ের চারটি কাজ এবং কালীঘাটের পটচিত্রের নয়টি উজ্জ্বল নমুনা দেখতে পাওয়াটা দর্শকদের জন্য একটি বিরল অভিজ্ঞতা হবে। জাতীয় জাদুঘরের পক্ষে সংগৃহীত সকল ছবি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়– এজন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র একটি দালান বা বিশাল জায়গা, সুযোগ-সুবিধা ও লোকবলসহ আর্থিক সংগতি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এ উদ্যোগটি নিতে হবে, হয়তো জাদুঘরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র আধুনিক শিল্পকলা-জাদুঘর স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জলবায়ুগত ও অন্যান্য কারণে অনেক পুরনো কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মেরামত বা পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগেও জাদুঘর নিয়েছে। এ প্রদর্শনীতে কয়েকটি ছবি সফলভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি নতুনভাবে আমাদের শিল্প ঐতিহ্যকে মূল্যায়নের একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

২.

প্রদর্শনীতে কালীঘাটের পটচিত্র এবং যামিনী রায়ের ছবি ছাড়াও রয়েছে জয়নুল আবেদিনের জলরং, তেলরং, ড্রয়িং ওয়াশ ও কালি কলমের কিছু ড্রইং; কামরুল হাসানের কাঠখোদাই, তেলরং ও

জলরং-এর ছবি; সুলতানের কিছু দুর্লভ স্কেচ, জলরং ও ড্রইং এবং রশীদ চৌধুরীর কয়েকটি অসাধারণ ট্যাপেস্ট্রিসহ তাঁর কিছু জলরং ও ড্রইং। প্রদর্শিত শিল্পকর্মের সংখ্যা খুব বেশি নয়, ষাট থেকে সত্তরটি, কিন্তু সংখ্যার বিচার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে, দর্শকের জন্য এদের অনেকগুলোকে প্রথমবারের মতো দেখার সুযোগ। কয়েকটি কাজ আগে প্রদর্শিত হয়েছে, যদিও তেমন দীর্ঘমেয়াদে না। তবে অল্পপ্রদর্শিত হোক, অপ্রদর্শিতই হোক, ছবিগুলো সত্যিকার অর্থেই দুর্লভ। কালীঘাটের পটচিত্রগুলো পাওয়া গেছে দান হিসেবে। ১৯৭৯ সালে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে ছবিগুলোর সংগ্রাহক প্রয়াত এম এ ভার্ভিলের ইচ্ছা অনুযায়ী এগুলো জাতীয় জাদুঘরকে উপহার দেয়া হয়। যামিনী রায়ের চারটি ছবি মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের সৌজন্যে পাওয়ার ছবিগুলোর পিছনটা পিছনে কাঠ দিয়ে পুরো বন্ধ করা, ফলে দেওয়ালে ঝুলানো অবস্থায় ছবিগুলো বেশ নষ্ট হয়। এগুলো সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মোটামুটি পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এস এম সুলতানের ১৯৫৩ সালে করা অনেকগুলো ড্রইং ও স্কেচ সংগ্রহ করা হয়েছে এক পাকিস্তানি শিল্পসংগ্রাহকের কাছ থেকে। সুলতানের এত আগের কাজের নমুনা তেমন একটা দেখা যায় না। কামরুল হাসানের একটি ছবিতে মেরামতের চিহ্ন আছে। ছবিটিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের ওপর রাজাকারদের আক্রমণ ও অত্যাচারের কিছু দৃশ্য বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী– এতটাই বলিষ্ঠভাবে যে একদল রাজাকার তাঁর মণিপুরীপাড়াস্থ বাসায় ঢুকে ছবিটার ওপর আক্রমণ করেছিল। কয়েক জায়গায় কেটে ফেলা ছবিটা মেরামত হয় কামরুল হাসানের নিজের তত্ত্বাবধানে– তিনি কাটা জায়গাগুলো নতুন করে এঁকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া শিল্পী রশিদ চৌধুরীর ড্রইং বা তেলরঙেও যে অসামান্য দক্ষতা ছিল, তা শুধু তাঁর বয়নশিল্পের নমুনা দেখে হয়তো দর্শকের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ড্রইংগুলো দেখতে পাওয়াটা দর্শকের জন্য এক দুর্লভ সুযোগই বটে। জয়নুলের দুর্ভিক্ষ অথবা জলোচ্ছ্বাস বিষয়ক স্কেচের সঙ্গেই আমাদের কমবেশি পরিচয়। অথচ মুক্তিযুদ্ধও কী

ব্যাপক অভিঘাত রেখেছিল শিল্পীর জীবনে এবং তিনি আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের এ ঘটনাটি কতটা প্রত্যয়, গর্ব এবং মমতা নিয়ে দেখেছিলেন এবং একইভাবে কতটা ঘৃণা নিয়ে বর্বর পাকিস্তানিদের কাপুরুষতাকে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু করেছিলেন, ছবিগুলো তার প্রমাণ।

৩.

কালীঘাটের পটচিত্র কলকাতাকেন্দ্রিক একটি চিত্রচর্চা, যার শিল্পীরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে জীবিকার অন্বেষণে কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরের আশপাশে বসতি স্থাপন করা গ্রামীণ পটুয়া ও চিত্রকর। আঠারো শতকের শেষ থেকে নিয়ে উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত ব্যাপ্তি ছিল এ চিত্রচর্চার এবং এর শুরু থেকে শেষপর্যন্ত এর বিষয় আশয়ে নানা বৈচিত্র্য দেখা গেছে। এ সময়টা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশী শাসনের ভিত্তি ও ব্যাপ্তিকাল এবং কলকাতা ছিল এ উপনিবেশী শাসনের মূল প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। কলকাতার অর্থনৈতিক উন্নতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের নানা সুযোগ-সুবিধার কারণে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে কালীঘাটেরও উন্নতি ঘটে, যেহেতু নতুন বণিক ও ধনী শ্রেণির কাছে জাগ্রত কালী বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। কালীর ভক্তসংখ্যা বাড়তে থাকলে মন্দিরের চারপাশে জীবিকাসন্ধানী মানুষজনের ভিড় বাড়তে থাকে। একই সময়কালে গ্রামের অর্থনীতির, বিশেষ করে কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। কৃষক অসচ্ছল হতে থাকে। একসময় তারা গ্রামের পটুয়া ও চিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু সেই পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো সংগতি আর না থাকায় গ্রামের শিল্পীদের অবস্থাও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। তারা কলকাতায়, বিশেষ করে কালীঘাটে এসে মন্দির দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য দেবদেবীর ছবি এঁকে জীবিকার একটা পথ পায় এবং কয়েক পুরুষের চর্চায় কালীঘাটের পটচিত্র একটি ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে শুরুতে যেমন দেবদেবীর ছবি তারা আঁকতেন, ক্রমান্বয়ে শহুরে ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী সামাজিক বিষয়বস্তু, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সমাজের নানা অসংগতি নিয়েও তারা ছবি আঁকতে থাকেন। অবশ্য দুটি ধারাই

পাশাপাশি চর্চা করেছেন অনেক শিল্পী। জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া নয়টি পটচিত্র দেবদেবীদের নিয়ে। এসব দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন কালী, শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-যশোধা, গণেশ, গণেশজননী এবং কার্তিক। প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে দুটি কালীমূর্তির সঙ্গে আছে বলরাম সুভদ্রা এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের দৃশ্য, লক্ষ্মী এবং চতুরানণ রাবণের ছবি। কালীঘাটের পট যে কারণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তা ছিল উনিশ শতকের জনপ্রিয় কিছু বিষয়ক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক একটি চিত্রধারার প্রচলন এবং প্রথাগত লোক-আঙ্গিকের সঙ্গে সমকালীন নানা আঙ্গিক ও রং ব্যবহারের সমন্বয়ে নতুন একটি চিত্রভাষা নির্মাণ। একসময় পটচিত্র কাপড়ে আঁকা হলেও ইউরোপ থেকে আসা কাগজে ছবি আঁকা শুরু হলো। অস্বচ্ছ রঙের পরিবর্তে জলরং এবং পশ্চিমা ধারায় ছায়ার ব্যবহার ও রঙের গভীরতার তারতম্য ঘটিয়ে একটি ত্রিমাত্রিক আবহ সৃষ্টি হলো। প্রদর্শনীর নয়টি ছবিতে পটচিত্রের 'পপুলার' বা জনপ্রিয় কোনো উদাহরণ নেই, কিন্তু ছবিগুলো ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে পটচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা যাবে। পটশিল্পীরা মাটির পুতুল তৈরি করে সেগুলো থেকে যে অনেক সময় ছবি আঁকতেন অথবা তার রং ব্যবহারে যে মেটে রঙের পাশাপাশি উজ্জ্বল লাল, নীল অথবা কালোর ব্যবহারে সংগতির একটি নন্দনতত্ত্ব তৈরি করতেন, তা এ ছবিগুলো বেশ ভালোই তুলে ধরে। পাশাপাশি জরির দানা বা সোনালি চূর্ণ ব্যবহার করে ছবির স্থানবিশেষে একটি আলাদা মহিমা সৃষ্টির বিষয়টিও কয়েকটি ছবিতে লক্ষণীয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছবিগুলোর তুলি ব্যবহারে দৃঢ়তা এবং কুশলতার বিষয়টি। কালীঘাটের পটশিল্পীরা তুলিকে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লাগাতেন; মোটা দাগে একটি ছবি একবারেই এঁকে ফেলতেন। তাতে বোঝা যেত, তারা স্পষ্টতায় এবং একনিষ্ঠতায় শিল্পকে ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। কাগজে আঁকা প্রদর্শনীর ছবিগুলোকে একটু খেয়াল করে দেখলে প্রথমে পেন্সিলে পরিরেখা আঁকার বিষয় ধরা পড়বে। কিন্তু পেন্সিলের রেখা থেকে যে অনেক বলিষ্ঠ তুলির রেখা এবং মোটা দাগের পাশাপাশি সূক্ষ্ম কাজেও পটশিল্পীরা সমান দক্ষ ছিলেন, তাও চোখে পড়বে।

কালীঘাটের পটচিত্রের সময়কালে কলকাতায় যন্ত্র উৎপাদিত ছবির নকলের দিন শুরু হয়েছিল। সস্তায় কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি, ওলিওগ্রাফির সহজপ্রাপ্যতা পটচিত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কালীঘাটের পটচিত্রের দিন শেষ হয়ে গেলেও সমকালীন শিল্পকলায় এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। এ শিল্পের নারীমূর্তি ও প্রাণী (বিশেষ করে বিড়াল, চিংড়িমাছ) আঁকার স্টাইলটি অনেক মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, আধুনিক ভারতীয় শিল্পে কালীঘাটের ইতিবাচক ও প্রভাববিস্তারী একটি ভূমিকা ছিল। অন্য অনেকের মতো যামিনী রায়ের (১৮৮৭-১৯৭২) কাজেও এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বস্তুত তাঁর অনেক কাজে কালীঘাটের পটচিত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়।

অবশ্য এ প্রভাব যামিনী রায়ের কাজের শুরুতে আসেনি এসেছে অনেক পরে, তাঁর জীবনে মধ্য-তিরিশ পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় ফেরার মধ্য দিয়ে। ষোলো বছর বয়সে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন এবং শিল্প শিক্ষা শেষে যে ধরনের কাজ শুরু করেন, তাতে একাডেমিক ও পশ্চিম রীতির চর্চাই ছিল প্রধান। অনেকটা প্রভাববাদী ধারায় তিনি নিসর্গ এবং নারীর ছবি আঁকতেন; প্রতিকৃতিও আঁকতেন এবং একসময় ইউরোপীয় দু'এক শিল্পীর অনুকরণে আত্মপ্রতিকৃতিও এঁকেছেন। ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত নব্যবঙ্গীয় ধারাতেও তিনি চিত্রচর্চা করেছেন, কিন্তু স্থায়িভাবে কোনো ধারাকে গ্রহণ করতে তিনি উৎসাহ পাননি। তাঁর কাছে এগুলোকে অসম্পূর্ণ এবং জীবন থেকে বিচ্যুত মনে হতো। যে প্রাণিত সৃষ্টির জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন, তার খোঁজে তিনি আধুনিক শিল্পচর্চার বলয়ের বাইরে দৃষ্টি দিলেন এবং এজন্য খুব দূরেও তাঁকে যেতে হলো না। তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াটোরে ছেলেবেলায় যেসব গ্রামীণ চিত্রকর ও পটুয়াদের ছবি তিনি দেখেছেন, সেই জীবন্ত ঐতিহ্যে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজে পেলেন। লোকশিল্পের এ ঐতিহ্যটি ছিল প্রকৃত অর্থেই সামষ্টিক, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিস্তৃত ছিল, এবং প্রত্যেক নতুন শিল্পী তাতে নিজস্ব মেধা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পটুয়া ঐতিহ্য যামিনী রায়কে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করল প্রধানত এর জীবন-সংশ্লিষ্টতা

এবং মৌলিকত্বের কারণে। এ চর্চাটি জনজীবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত, এতে একদিকে প্রয়োজন, অন্যদিকে নন্দনচিন্তার সংযোগ ঘটেছে। তাছাড়া লোকশিল্পের শৈলী বা স্টাইলটি একেবারেই তার নিজস্ব। যামিনী রায় অনুভব করলেন, একজন গ্রামীণ পটুয়া যে রকম রং প্রস্তুত করা থেকে নিয়ে পট ও তুলি তৈরির সকল কাজই নিজে করেন, তাঁকেও তা করতে হবে। তিনি আনন্দের সঙ্গেই তা করেছেন। লোকশিল্পে স্থিত হওয়ার পিছনে তাঁর আরেকটি কারণ ছিল– তিনি দেখেছেন, লোকশিল্পের ফর্মটি খুবই বলিষ্ঠ; এতে রঙের ব্যবহারও আকর্ষণীয়। একদিকে পুরনো ও কিংবদন্তির নানা চরিত্র ও ঘটনা, অন্যদিকে জনজীবনের স্থানীয় গল্প-গাঁথার সমন্বয় ঘটে লোকশিল্পে। যামিনী রায় শুধু পটচিত্র নয়, নকশি কাঁথা এবং আল্পনা থেকেও নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যাকে 'স্থানীয় কল্পনার' অর্থবহ বিস্তার বললে ভুল বলা হয় না। আবার এদের ক্রমাগত ব্যবহারে যে সর্বজনীনতার অনুভবটির তৈরি হয়, তা-ও একই সঙ্গে হিসাবে রাখতে হয়।

পটচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য সংস্করণ কালীঘাটের পটচিত্রের সঙ্গে যামিনী রায়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি এ শিল্পে নান্দনিক শক্তি এবং জীবনের উত্তাপ দেখতে পেলেন। কালীঘাটের পটুয়ারা যে অঙ্গুর, বলিষ্ঠ রেখায় ছবি আঁকতেন, নারীমূর্তির একটি বিশেষ চিত্রায়নে পারদর্শিতা দেখাতেন (যাতে মাটির তৈরি পুতুলের মতো চোখ ও কান এবং সুডৌল অঙ্গসৌষ্ঠব প্রাধান্য পায়) মোটা দাগে অবয়বের পরিরেখা আঁকতেন এবং সূক্ষ্ম ডিটেইলের কাজের পরিবর্তে (যেমন হাতের আঙুল) আভাসধর্মী বা ইঙ্গিতময় কাজ করতেন, তার প্রয়োগ নিজের শিল্পে তিনি ঘটালেন। লোকশিল্পের আদলে কাজ করতে গিয়ে একদিকে যামিনী রায় যেমন শহুরে সংবেদনশীলতার এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিশীলতার প্রকাশ ঘটালেন, অন্যদিকে এর সহজ প্রকাশকে সরাসরি তাঁর কাজে নিয়ে আসার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি তাঁর ছবির অবয়ব থেকে অনাবশ্যক সব ডিটেইলের বিষয় মুছে ফেললেন এবং মৌলিক কিছু ফর্ম এবং বিন্যাসকে ধরে রাখা এবং কয়েকটি রঙের মধ্যে নিজের কাজকে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে তেল রঙের পরিবর্তে মৃত্তিকা-

জাত রং ব্যবহারে মনোযোগী হলেন এবং লাল, নীল, ধূসর ও হলুদ এবং সবুজসহ ছ'সাতটি রঙের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। পটশিল্পীদের মতো তিনি নিজেই গাছ গাছড়া, লতাপাতা ও ফুল থেকে রং আহরণ করতে শুরু করলেন। বস্তুত উদ্ভিদ থেকে আহরিত রং এবং চকখড়ি, প্রদীপের কালি ইত্যাদির সংমিশ্রণে যে রং তিনি তৈরি করতেন, তার ঔজ্জ্বল্য তাঁর ক্যানভাসকে একটি নিজস্ব সৌন্দর্য দিয়েছে।

ছবির বিষয় নির্ধারণেও যামিনী রায়কে লোকশিল্প অনেক সহায়তা করেছে। লোকশিল্পের প্রধান বিষয় মানুষ, তার প্রতিবেশ; মানুষের কল্পনার রাজ্য এবং তার ধর্মানুভূতি, ইতিহাসচেতনা ও পুরাণচিন্তা। তাঁর কাজেও পৌরাণিক নানা চরিত্র, রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প, রাধা-কৃষ্ণ ও গোপীনিরা, শিব, রাম ও বলরামসহ অন্যান্য দেবদেবী, এমনকি যীশুখ্রিস্ট স্থান পেয়েছেন। নারীমূর্তি ছাড়াও তাঁর কাজে গৃহপালিত প্রাণী এবং বাউল, সাঁওতাল ও মাল্লাদের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। যামিনী রায়ের ছবিতে আধুনিক জীবনযাত্রা এবং সমকালীন ইতিহাসের নানা টানাপোড়নের বর্ণনা অনেকটাই অনুপস্থিত। কল্লোলের যুগের গুরুত্বপূর্ণ দুই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে'র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকলেও যামিনী রায়ের শিল্পদৃষ্টি এঁদের মতো আধুনিকতার সমস্যায় আকীর্ণ ছিল না, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক অসংগতির কোনো চিত্রও তিনি তুলে ধরেননি। যামিনী রায়ের ছবিতে যে সময় তা এক নান্দনিক সময়হীনতায় স্থাপিত। হঠাৎ হঠাৎ কোনো দ্বন্দ্ব তাঁর ছবিতে উপস্থিত হলেও (যেমন কাঁকড়ার মুখে বিড়াল) তা কোনো বৃহত্তর দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয় না, বরং একটি তাৎক্ষণিকতায় এর সমাধান হয়ে যায়। ফলে এর নান্দনিক রূপটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

যামিনী রায়ের যে চারটি ছবি এ প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে, সেগুলো নারীমূর্তির। হাতের ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন অথবা সমর্পণের ভঙ্গি করছেন সুললিত ভঙ্গিমার এ নারীরা। ছবিগুলো কিছুটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের ঔজ্জল্য কমেছে, কিন্তু বোঝা যায়, রং ব্যবহারে কতটা যত্নশীল ছিলেন যামিনী রায়। ছবিগুলোতে নারী

অবয়ব এক বিশেষ স্টাইলাইজ ভঙ্গিতে আঁকা–সেই বলিষ্ঠ তুলি, সেই অভঙ্গুর পরিরেখা, সেই সুডৌল এবং সুষম বক্ররেখার প্রাণিত প্রয়োগ। শাড়ির নকশাতেও একটি সুষম বিন্যাস চোখে পড়ে, যেন নারীর পরিধেয় বস্ত্র তার ভিতরের সত্তাটিকে তুলে ধরেছে। মুখের আদল তৈরিতে যামিনী রায় বরাবরই যত্নশীল ছিলেন। এ ছবিগুলোতেও চোখের ইঙ্গিতময় উপস্থাপনা এবং শরীরের পরিপূর্ণ ভারসাম্য লক্ষণীয়। চারটি ছবিই পুনরাবৃত্তিমূলক। এ পুনরাবৃত্তি অবশ্য তাঁর ছবিতে আগাগোড়াই চোখে পড়বে। বস্তুত এজন্য তাঁর সমালোচনাও হয়েছে। এরকম সমালোচনার বিপরীতে দুটি কথা বলা যায়; লোকশিল্পের ফর্ম ও বিন্যাস মৌলিকভাবেই পুনরাবৃত্তিমূলক। এ শিল্পে ব্যক্তির শিল্পবৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে সমষ্টির শিল্পচিন্তাই প্রতিফলিত। আর যামিনী রায় নিজেই বলেছেন, যে ঐতিহ্যে তিনি কাজ করতেন, তাতে শিল্পের একক বিশিষ্টতার পরিবর্তে এর পিছনে সমবায়ী উদ্যোগের বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের পটশিল্পী যে কাজ করেন, তাতে প্রথাবদ্ধ শৈলীর প্রয়োগ দ্রুততার সাথে শেষ করাটা সহজ করে দেয়। তিনি নিজেও অসংখ্য কাজ করেছেন এবং চাইতেন তাঁর কাজ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যেন স্থান পায়। সেজন্যও পুনরাবৃত্তি শিল্পের প্রয়োগ।

৪.

এ প্রদর্শনীর প্রধান একটি আকর্ষণ হচ্ছে জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু ড্রইং এবং বিশাল ক্যানভাসে করা তাঁর তেলরং *তিতুমীরের কেল্লা*। মুক্তিযুদ্ধ জয়নুলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল কারণ শুধু বাঙালির নয়, পরাশক্তি বা উপনিবেশী শক্তির হাতে নিপীড়িত যেকোনো জনগোষ্ঠীর মুক্তিও তাঁর কাম্য ছিল। এজন্য প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। এ প্রদর্শনীতে একজন প্যালেস্টাইনি যোদ্ধার প্রতিকৃতি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর করা জয়নুলের স্কেচ ও ড্রইংগুলোতে তিনটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে– পাকিস্তানিদের হিংস্র আক্রমণ, বাঙালি যোদ্ধাদের প্রতিরোধ এবং যুদ্ধের বীভৎসতা ও ধ্বংসলীলা। পাকিস্তানিদের তিনি সরাসরি আঁকার পরিবর্তে, এঁকেছেন মেটোনিমির মাধ্যমে, যেমন একটি উদ্যত বুট, যা নিরীহ কিছু মানুষকে পিষে

দিতে চাইছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি এঁকেছেন তাদের শৌর্যবীর্য নিয়ে এবং যুদ্ধের বলি মানুষজনের ছবি আঁকায় জয়নুল বেশ স্পষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের সময় আঁকা একটি পোস্টারও স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। পাশাপাশি জলোচ্ছ্বাসের ছবি আছে, নিসর্গ দৃশ্য আছে, আছে এক নববধূর জলরঙে আঁকা এবং এক প্রসাধনরতা নারীর তেলরং ছবি। তিতুমীরের কেল্লার কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে একটি বিষয় এ প্রদর্শনী থেকে স্পষ্ট যে, জয়নুল ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সামাজিক দায়বদ্ধ একজন শিল্পী এবং সমাজবাস্তবতা ছিল তাঁর নান্দনিক চিন্তার ভিত্তি। এ শুধু কথার কথা ছিল না, বরং তাঁর শিল্পচর্চায় গতিশীলতা দিয়েছে।

জয়নুলের ছবি এক অন্তহীন সামাজিক দ্বান্দ্বিকতাকে তুলে ধরে। আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় অসম সেই সমাজব্যবস্থাকে, যা তৈরি করে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, শোষণ এবং বঞ্চনার একটি চিরন্তন কোলাজ। জয়নুলের ছবি আমাদের সচেতন করে দরিদ্র মানুষদের দ্বিমুখী বঞ্চনার বিষয়ে। এক. তাদের দারিদ্র্য এবং শ্রেণিগত শোষণ; দুই. তাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে এ পরাধীনতা মোচনের প্রত্যয় খুব তীব্রভাবে ফুটে ওঠে।

জয়নুলের ভিতরে ক্রিয়াশীল ছিল একটি দ্বন্দ্ব এবং সেটি স্পষ্ট হয় তাঁর বিষয় নির্বাচনে, তাঁর শৈলীগত প্রাধান্য নির্ধারণে। তিনি প্রাচ্যবাদী চিন্তার মিস্টিক প্রকাশে কখনো আবিষ্ট হননি। কারণ তাঁর ভিতরের দ্বন্দ্বটি তাতে মেটার সম্ভাবনা ছিল না। বাস্তবতার একটি চর্চায় বরং সেটি সম্ভব ছিল। এ দ্বন্দ্বটি ছিল তার মানুষ হিসেবে একটি অবস্থান গ্রহণ এবং শিল্পী হিসেবে একটি অবস্থান গ্রহণের মধ্যে। শিল্পী পারেন তাঁর একান্ত নিজস্ব নন্দনচিন্তায় মগ্ন হয়ে সৃষ্টিশীলতার চর্চা করে যেতে, যে সৃষ্টিশীলতায় প্রকট বাস্তবতা কখনো হানা দেবে না অথবা দিলেও তার প্রকাশটি হবে বড়জোর নমিত এবং সংযত। নাকি একজন শিল্পী অবতীর্ণ হবেন একজন সামাজিক যোদ্ধার ভূমিকায়? নাকি একটি মধ্যবর্তী পথ রয়েছে যেখানে শিল্পীর চিন্তা ধারণ করবে একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতা এবং নন্দনচিন্তার প্রগাঢ় উৎসার এবং একটি প্রভাবিত করবে অন্যটিকে?

জয়নুলের ছবি দেখে দর্শকরাই উপলব্ধি করবেন, তাঁর কাজে কোন চিন্তাটি প্রাধান্য পেয়েছে।

জয়নুলের ছবিতে দরিদ্র মানুষের কষ্টের জীবন বহুবার বিধৃত হয়েছে, কিন্তু কোনো আবেদন সঞ্চারিত হয় না ছবিগুলোতে, যেন তাদের করুণা করা হোক দরিদ্র মানুষ তা চায় না। বরং ক্রোধেরই সঞ্চার হয়। দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা এক একটি আয়নার মতো, যাতে ধরা পড়ে যত না মৃত্যু, ক্ষুধা এবং বঞ্চনার ছবি, তার থেকে বেশি মানুষের শঠতা এবং লালসার চিত্র এবং সেসব চিত্রে আমরা নিজেদেরই দেখি হঠাৎ করে। এমনকি মনপুরা বা ঘূর্ণিঝড়ের স্ক্রলচিত্রেও দর্শক করুণা করার সুযোগ পান না মৃত মানুষদেরকে। সেসব স্ক্রল তাদের বিশালতা নিয়ে জীবনেরই এক একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা তাদের ভিতরে প্রবেশ করি। একসময় মৃতদেহগুলো আমাদের মৃতদেহ হয়ে দেখা দেয়। কে করুণা করবে কাকে? এ প্রদর্শনীর জলোচ্ছ্বাসের ছবিটির কথাই ধরা যাক। এতে মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলোর মতোই, ব্যক্তি নয়, এমনকি মৃত বা নিপীড়িত ব্যক্তিরাও নয়, বরং সম্পূর্ণ মানবসমাজ উপস্থিত। মানবসমাজকেই শেষপর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয় যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় উপদ্রুতদের উপেক্ষা ও অবহেলার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব হারানোর জন্য।

প্রদর্শনীটি দেখে আমাদের একথা মনে হয় যে, জয়নুল আবেদিন তাঁর রাজনৈতিক বা সামাজিক বিশ্বাস সম্পর্কে একটি কথা না বললেও তাঁর ছবিগুলোই তা বলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও যে শিল্পী পঞ্চাশের মন্বন্তরে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত বা মৃতপ্রায় মানুষগুলোকে দেখে অনুভব করেছিলেন বিশাল ক্রোধ ও লজ্জা এবং তাঁর সৃজনশীল কলম বা কাঠকয়লা ঝলসে উঠেছিল সস্তা বোর্ড কাগজে অসামান্য কিছু শিল্প সৃষ্টির নিমিত্তে, সেই একই ক্রোধ দেখি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের স্কেচ ও ড্রইং-এ। কিন্তু একই সঙ্গে সাধারণ মানুষজন—যাদের নিম্নবর্গীয় বললে একটি রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় হয়তো দেয়া যায় তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর ক্যানভাসে।

জয়নুল বাস্তবকে পড়েছেন একজন নিবিষ্ট পড়ুয়ার মতো। তাঁর এ পঠনে সমাজের নানা উত্থান-পতন, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ছিল। তিনি পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ছাত্রজনতার নানা আন্দোলনকে সামনে থেকে দেখেছেন। তিনি সচেতন ছিলেন বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে এবং তাঁর সহানুভূতি ছিল নিম্নবর্গীয় সেই সংগ্রামী মানুষগুলোর প্রতি, ছিল সমর্থন এবং শ্রদ্ধা।

তিনি দেখেছেন কীভাবে দেশবিভাগ একটি পুরো জাতির ভিতরে বিভাজন এনে দেয় এবং মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দেশবিভাগের অনেক পরে, তিনি প্যালেস্টাইনের যোদ্ধাদের ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনে। সংগ্রামী নানা জাতির মুক্তিযুদ্ধের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। যদিও রাজনীতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কখনো জড়িত হননি—তাঁরও একটি রাজনীতি ছিল, যে রাজনীতির বিষয়-আশয় ছিল মানুষের সংগ্রামী জীবন ও তার নানা যুদ্ধ এবং সে ইতিহাসের পাত্রপাত্রী ছিল সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষ, যাদের জীবন আপাত এক নিস্তব্ধতার পিছনে এক প্রবল স্রোতের মতো বয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্রের ফেরিঘাটে অপেক্ষমাণ উদাসীন মানুষ ও ছেলেটি থেকে নিয়ে বন্দুক হাতে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা; প্রসাধনরতা মহিলা থেকে জলকে চলা গৃহবধূ—সবাই তাঁর রাজনীতির কুশীলব। কারণ তারাই তাঁর দেশ ও সময়ের রূপকার। কিন্তু তিনি কোনো সহজ সমাধানে বিন্যস্ত করতে চাননি তাদের জীবনকে, কোনো আশাবাদী চেতনার আবরণে আড়াল করতে চাননি তাদের জীবনযাপনের কষ্ট এবং সংগ্রামকে। বরং তিনি জোর দিয়েছেন তাদের বাস্তবতার ওপর, যে বাস্তবতা একসময় তাদের অন্তর্গত সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে নিজেদের একটি গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

৫.

কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) যে ছবিগুলো এ প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে, সেগুলোর ভিতর বিষয়গত বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি শৈলীগত পার্থক্যও রয়েছে। ১৯৭১ সালে কলকাতায় আঁকা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তিনটি ছবি এ প্রদর্শনীর বড় একটি আকর্ষণ।

জয়নুলের মতো কামরুলও প্রতীক ও মেটোনিমির ব্যবহার পছন্দ করতেন। তাঁর ছবিতে শকুনের ভূমিকাটি মানবতার বিপরীত, যেমন খেঁকশেয়াল বা নেকড়ে বাঘের। তিনটি ছবিতে শকুনের পাশাপাশি পেঁচা আছে; বিপন্ন মানুষ, ধর্ষিতা নারী এবং মানুষ, গরু-বাছুরের শবদেহ আছে। রাজাকারদের ছবির কথা আগেই বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কিছু কাঠখোদাই রয়েছে যার একটির বিষয়বস্তু মাৎস্যন্যায়। আরও আছে নিসর্গ, পাখি ও মোরগের ছবি। তবে নারীমূর্তির সংখ্যাও কম নয়। নগ্নবক্ষা নারীদের একটি সাবলীল ছবিও আছে। বস্তুত কামরুলের যেকোনো প্রদর্শনীতে নারীর উপস্থিতি বলতে গেলে অনিবার্য।

এ প্রদর্শনীটি আরেকবার এ সত্যকে দর্শকের কাছে তুলে ধরবে যে, কামরুল লোকশিল্প থেকে অনেক গ্রহণ করলেও ছিলেন অসম্ভব মৌলিক এবং সহজাত একজন শিল্পী।

কামরুল হাসান সহজাত ও সার্থক শিল্পী এবং সহজাত শিল্পের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য রীতিবহির্ভূত আচার-আচরণ এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবনার তাড়না– এ দুটিই পূর্ণমাত্রায় তাঁর শিল্পে বিদ্যমান। রং নিয়ে তিনি গবেষণা করেননি, যদিও সমালোচক দর্শকের একটি বড় অংশের ওই ধারণায় উপনীত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু গবেষণার যে জাগ্রত মানস বা অবচেতনের ওপর চেতন মনের প্রাধান্য থাকা দরকার সেটি সহজাত শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম দেখলে বোঝা যায়, তাঁর নির্মাণ কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি বা বিবেচনাপ্রসূত নয়, বরং একটি ভাবনার বিকাশের মুহূর্তে রঙের পিঠে রং লাগিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন; অনুভূতি সম্পূর্ণ ও সম্পৃক্ত থেকে গেছে, কোথাও কোনো বৈসাদৃশ্য দেখা যায়নি। যেমন– হলুদ রং দেশি পটুয়ারা বারবার ব্যবহার করে এসেছেন– গাঢ় ও উজ্জ্বল হলুদের বিকাশ দেখা যায়; কিন্তু তিনি কোনো সূক্ষ্ম চিন্তা থেকে ওই রংটি হাজির করেননি। হলুদের ভিতর যে আনন্দ উচ্ছ্বাস, জীবনের গূঢ় তাগিদ, প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার গাঢ়বদ্ধ প্রকাশ, সেটিকেই সার্বজনীন করেছেন মাত্র। ছবির পর ছবিতে কামরুল হাসান উজ্জ্বল, ঝকঝকে হলুদ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন পটভূমিতে

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করেছেন। তবে শুধু হলুদ নয়, হলুদের পাশে গাঢ় নীল, গাঢ় লালের পাশে কমলা বা ফিকে সবুজ– ইংরেজিতে যে রীতিকে বলে 'কনস্ট্রাস্ট প্যাটার্ন'– অনেকটাই তাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। প্রায়শ দেখা যায়, যেসব চিত্রে তিনি এ প্রকাশের আয়োজনকে যত বেশি স্বতঃপ্রবৃত্ত রেখেছেন তত বেশি তিনি সার্থক। অবশ্য আত্মসচেতন শিল্পী মাত্র যে সহজাত শিল্পী নন, একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না, আত্মসচেতনতা শিল্পেরই একটি প্রাথমিক বিবেচনা, কিন্তু তা যখন শিল্পের স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুভূতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানেই মুশকিল। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পে এ আত্মসচেতনতা ও স্বতঃপ্রবৃত্তি, চেতনা ও অবচেতনের দ্বন্দ্বে একটি ক্রমিক ডায়ালেকটিক তৈরি করে। এর সমাধান সহজলভ্য নয়; চেতন মনের যেকোনো সমাধান অবচেতনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া শক্ত। এ সমাধান অবচেতন মনে বিভিন্ন সত্তায় নিয়ত সংঘর্ষের মাধ্যমে, অনেক সময় শিল্পীর অজান্তেই হয়ে যায়। কামরুল হাসানের বৈশিষ্ট্য এ যে, আত্মসচেতনতা তাঁর প্রকাশের জন্য কোনো বাধা তো হয়নি, বরং সর্বত্র তাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

কামরুল হাসান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অন্য জায়গাতেও– মাটির সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় সংযোগ, তাকে তিনি অশেষ দরদ দিয়ে মূর্ত করেছেন তাঁর ছবির মাধ্যমে। বাংলাদেশ ও তার নিসর্গ, জলমানুষ, লোকাচার, লোকালয়, লোকালয়ের জীবন এক কথায় গণজীবনের বহমানতা, প্রতিবেশের বিচিত্র গতি, এসব অতি সাড়ম্বরে উপস্থাপিত তাঁর ছবিতে। মাটির অতি নিকটে তাঁর আসন; তাকে নির্দ্বিধায় গণশিল্পী আখ্যা দেওয়া যায়।

শিল্পী হিসেবে কামরুল হাসানের সার্থকতা তাঁর গণকেন্দ্রিক নির্বাচনে, তাঁর প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতায়, রঙের পরিপূর্ণ এবং নিত্যনতুন ব্যবহারে এবং তাঁর সঞ্চরণশীল মননশীলতায়। কামরুল হাসানের শিল্পীসত্তা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন চেতনার সমন্বয়ে, বিভিন্ন প্রতিবেশে, তার প্রকাশ বিভিন্ন মেরুতে। এর সব ক'টি নিয়েই তিনি। এর কোনো একটি চমৎকারিত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণের চমৎকারিত্ব। কিন্তু কামরুল হাসান আবার বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে

আছেন। তাঁকে আলাদা করে বিচার করে, বিভিন্ন শিল্প উপাদান আলাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে জানতে হলে তাঁর সকল প্রকাশভঙ্গির সাথে পরিচিত হতে হবে। যে নারীদেহ তাঁর চিত্রে দিয়েছে একই সঙ্গে গতি এবং স্থিতিশীলতা, সেই নারীদেহ সম্পর্কেই বলা যাক। সহজ অর্থে, কামরুল হাসান নারীর নগ্নতার প্রতি মনোযোগী। অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রের মতো, অনেকটা মোগল চিত্রকলার মতো, নারীদেহের সহজ শরীরি আকর্ষণ কামরুল হাসানের ছবিতে যেন আরও ব্যাপ্তি পেয়েছে। ফলে তাঁর ছবিতে নারীর উপস্থিতি প্রবল। নারীর বিশাল ও মোহনরূপ তাঁর ক্যানভাসকে বৈচিত্র্য দিয়েছে। প্রথমদিককার ছবিগুলোতে নারীদেহ কামরুল খুবই নিখুঁত ও নিয়মনিষ্ঠভাবে এঁকেছেন। এসব ছবিতে সমস্ত ক্যানভাসজুড়ে নারী প্রতিকৃতি রং ও রেখার সহযোগিতায় উদ্ভাসিত। পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে (ও ষাটের দশকে) নারী প্রতিকৃতিগুলো আধাজ্যামিতিক পদ্ধতিতে ও রেখায় ভাঙাচোরার মাধ্যমে উপস্থাপিত। এসব ছবিতে প্রথমেই যে বিষয়টি দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে সেটি হলো রং ও রেখার একাগ্রতা। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক যোগাযোগ ক্ষুণ্ন করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইচ্ছামতো উপস্থাপনায় তিনি নারী দেহকে স্টাডি করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ফিগারগুলো অতঃপর লীলায়িত এবং বিকশিত হয়েছে একই সঙ্গে।

কামরুল হাসানের সার্থকতার একটি বড় ভিত্তিভূমি রচনা করেছে তাঁর রেখাসৌষ্ঠব। তাঁর রেখাসৌষ্ঠব কাব্য সৃষ্টি করে। রেখায় জড়তা থাকলে, ড্রইং দুর্বল হলে কোনো নির্মাণ শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে না, যদিও দু'একটি ব্যতিক্রম বিরল নয়। কামরুল হাসান জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা (শুধু একক জীবন নয়, একের ভিতর দিয়ে বহু জীবন অথবা সামগ্রিক জীবনধারা) ব্যক্ত করেছেন তেল রং, জলরং, শুধু কালি ও কলম বা ওয়াশ অথবা কাঠখোদাইয়ের মাধ্যমে। তিনি নিজেকে, নিজের সময় ও দেশকে ধরে রেখেছেন শিল্পীর ব্যগ্র আঙুল দিয়ে, কিন্তু সাথে সাথে তাঁর ধ্যানধারণাকে সংযুক্ত করেছেন বৃহত্তর ধ্যানধারণার সঙ্গে। এ যে একাগ্রতা, তীক্ষ্ণতা, ঋজুতা আর বলিষ্ঠতা, এর সব ক'টি সম্পদ তাঁর শিল্পে ভাস্বর।

৬.

এস. এম. সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) কাজের যেসব নমুনা এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, তার বেশিরভাগই পুরনো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৫৩ সনে আঁকা অনেকগুলো কালি ও কলমের স্কেচ এবং ওয়াশ ছবির এবং দু'একটি জলরং ছবি এতে রয়েছে। এছাড়া ১৯৭০ সালে করা কিছু পেন্সিল স্কেচ এবং ১৯৫৮ সালে আঁকা পাহাড়ের ছবিও এ প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছে। এসব ছবি অবশ্যই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রধানত এদের ঐতিহাসিক একটি মূল্যের জন্য। কিন্তু একই সঙ্গে ছবি আঁকায় শিল্পীর দক্ষতার বিষয়টিও ছবিগুলো সপ্রমাণ করে। সুলতান বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন– এমন সব কাজ যাদের মনুমেন্টাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এসব ছবির পিছনে শিল্পীর যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত, তাতে বিশালতা, চরিত্রদের জীবন থেকে বড় হয়ে ওঠার ব্যাপারটি ছিল। কিন্তু তিনি আগাগোড়া বিশ্বাস করতেন, একজন শিল্পীকে ড্রইং-এ পারদর্শী হতে হবে। একটি পেন্সিল বা চকখড়ি দিয়ে আঙুলের এক টানে জীবন্ত ছবি আঁকার দক্ষতাটি তার থাকতে হবে। আশির দশকের শেষদিকে ঢাকার জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সুলতানের একটি বেশ বড় চিত্রপ্রদর্শনী হয়। ওই প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন তিনি অল্প কিছু কথা বলেছিলেন। তাঁর মূলকথা ছিল, একটা ছবিকে প্রথমে ছবি হয়ে উঠতে হবে, তাকে একটা বস্তু বা ভাবনা বা বিমূর্ত কোনো চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং এ প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একই সঙ্গে সূক্ষ্ম এবং সতেজ হতে হবে। ছবিতে শিল্পী যত নিজস্ব চিন্তা, আদর্শ, আনন্দ অথবা বিক্ষোভ ফুটিয়ে তুলুন না কেন, এর ভিত্তি হতে হবে ড্রইং। পিকাসো যেমন বলেছিলেন, আমাকে একটি ঘোড়া এঁকে দেখাও। সুলতান তাঁর কাজের ভিত্তি যে ড্রইং-এর ওপর স্থাপন করেছিলেন, তাতে সবসময় পরিপাটি সৃজনের বিষয়টি থাকত না। কিন্তু ড্রইং হতো সতেজ এবং সাবলীল। এ বিষয়টি এ প্রদর্শনী আরেকবার সপ্রমাণ করেছে।

একটু আগে শিল্পীর আদর্শবাদ ও চিন্তা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সুলতানের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র চিত্রভাষা নির্মাণে তাঁকে সাহায্য করেছিল। তিনি গ্রামবাংলার ছবিই আঁকতেন, বিশেষ করে কৃষক

এবং গ্রামের অন্যান্য মানুষদের জীবনকে ভিত্তি করে। বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে এবং যাদের এটি নেই, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়– তারা জানেন, গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী অভাব-অনটন, নানা ধরনের দুর্ভোগ, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের জন্য শহরের মানুষ যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়, তার অভাব। গ্রামের জীবনে যে দ্বন্দ্ব, তার নিচের দিকেই থাকে কৃষক ও প্রান্তবাসী মানুষজন– যাদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় নিম্নবর্গীয় বলে বর্ণনা করা হয়। গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত, যদিও তাদের শ্রম দিতে হয় ষোলো আনা; গ্রামের উন্নয়নে তারা সবসময় সুফলভোগীদের থেকে স্বতন্ত্র। কেউ যদি গ্রামের কৃষক তথা নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে ছবি আঁকেন, তাহলে তাদের কষ্টের জীবন, স্বাস্থ্যহীনতা এসব বিষয়ই প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু সুলতানের ছবিতে এ বাস্তব একেবারে বিপরীত। তাঁর গ্রামে দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, হানাহানি, চরদখল আছে; সেখানে সৌভ্রাতৃত্ব এবং সুপ্রতিবেশীত্ব যে সবখানেই বিরাজ করে তা-ও নয়। কিন্তু তাঁর কাজে সম্পন্নতার, স্বাস্থ্যের এবং আনন্দের ছবিটিই প্রাধান্য পায়। তাঁর কৃষক পেশিবহুল, তার হাতে পায়ে প্রচুর শক্তি, তার শরীর বলশালী। সুলতানের রমণীরাও বিশাল, তাদের স্বাস্থ্য ঈর্ষণীয়। তাদের স্তন ও নিতম্ব গুরুভার; যেসব নারী সন্তানের জন্য স্তন্য দেন, তারা এর মায়াময় চিরায়তরূপে প্রকাশিত। সন্তানরাও স্বাস্থ্যবান; এমনকি ঘরের বিড়ালটি, উঠানে বাঁধা গাভীটি– সকলেই যেন স্বাস্থ্যের একটা গোপন রহস্য জেনে সতেজ মহিমায় উপস্থিত। কৃষকদের ক্ষেতও সবুজ অথবা পাকা ফসলের ভারে আনত হলুদ; কৃষকের পুকুরে মাছ, গোলায় ধান। তার পাওয়ার আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

গ্রামের প্রচলিত চিত্রের বিপরীতে সুলতানের এ আদর্শিক ছবি যে চিন্তাটি আমাদের মধ্যে জাগায়, তা হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের মূলে প্রতিবাদী একটি সত্তার বলিষ্ঠ উপস্থিতি। তাঁর প্রতিবাদী বা দ্রোহী সত্তা একই সঙ্গে একটি স্বাপ্নিক দর্শনকে লালন করে, যার মূলে আছে মানবের কল্যাণচিন্তা। নিম্নবর্গীয় মানুষ কেন যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত হবে, পদদলিত হবে, কেন তাদের উত্থান হবে না। এ প্রশ্ন তাঁর ভিতরে সবসময় ক্রিয়াশীল ছিল। জীবনে ও বাস্তবে না হলেও তাঁর

নন্দনচিন্তা ও সমাজদর্শনের গভীরে তিনি তাই বিপরীত ছবিটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কৃষকের বিশালত্ব তাদের প্রতি তাঁর প্রত্যয়, ভালোবাসা এবং সার্বিক অর্থে গ্রামবাংলার উত্থানের তাঁর আদর্শচিন্তারই প্রতিফলন। এ বিশালতা এবং আদর্শচিন্তার যোগফল সুলতানের ক্যানভাসকে যে মহিমা দিয়েছে, তা অবশ্য তাঁর ক্ষুদ্রকায় কাজে, বিশেষ করে স্কেচ বা ড্রইং- এ দেখা যায় না। সেগুলোতে তাঁর শৈল্পিক দক্ষতা ও নিবিষ্টতার স্বাক্ষর থাকলেও সমগ্র সুলতানকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ প্রদর্শনী দেখে তাই দর্শকের পক্ষে সুলতানের সমগ্র রূপটা অনুভব করা সম্ভব হবে না। এজন্য তার বড় কাজগুলো দেখতে হবে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা রয়েছে। সুলতানের অনেক কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু কাজ নষ্ট হওয়ার পথে। তিনি চটের ক্যানভাসে, সস্তা কাগজে কাজ করতেন, তাঁর রং ও দামি বা উন্নত ছিল না অনেক সময়। ফলে বেশকিছু কাজ রং হারিয়ে বা রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিছু কিছু ছবির এমন দুরবস্থা যে, সেগুলোর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সেজন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন, যেখানে সংগ্রাহক থেকে নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি এবং জাতীয় জাদুঘর সুলতানের ছবি পুনরুদ্ধার ও মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে একত্রে কাজ করবে। তবে একথাও ঠিক, সুলতানের তেলরং ছবিগুলোতে উজ্জ্বলতা নেই; এক ধরনের চাপা বর্ণবিন্যাসে তিনি কাজ করতেন এবং সেখানে বাদামি, খয়েরি ও মেটে রঙের প্রাধান্য ছিল। তুলনায় তার জলরং ছবি বেশ উজ্জ্বল, বিশেষ করে নিসর্গ দৃশ্য রূপায়ণে। সুলতান নিসর্গেরই সন্তান ছিলেন। গ্রামের ছেলে ছিলেন, গ্রাম থেকে বেরিয়ে কলকাতা আর্ট কলেজ হয়ে ভারত ও পরে পাকিস্তান এবং অন্যান্য ক'টি দেশ ঘুরে ঢাকাতে কিছুদিন থাকলেন, তারপর ফিরে গেলেন নড়াইলে। সেখানে চিত্রানদীর পারে একটি ঘরে পশুপাখি সাপের সঙ্গে সংসার করলেন। নিসর্গের মূল রংগুলো তাঁর ক্যানভাসে মূর্ত হবে, সেটিই প্রত্যাশিত ছিল।

প্রদর্শনীটি সুলতান সম্পর্কে দর্শকের উৎসাহ জাগাবে। তাঁর ত্রিশ বছর বয়সের বেশকিছু চিত্রকর্ম দেখে তাঁর শিল্পকৃতী এবং বৃহৎ

জীবনের প্রতি তাঁর মোড় ফেরার বিষয়টিকে হয়তো অনুধাবন করা যাবে।

৭.

সুলতানের মতো রশীদ চৌধুরীরও (১৯৩২-১৯৮৬) জীবন ছিল বর্ণাঢ্য, তবে সুলতানের মতো বোহিমিয়ান তিনি ছিলেন না। বরং ব্যক্তি ও সংসারজীবন অনেক গোছানো ছিলেন, যেমন গোছানো ছিল তাঁর বয়নশিল্প ও চারুকাজ। তাঁরও শিল্প শিক্ষা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক। তবে সুলতান যেখানে কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়াশুনার পালা চুকাবার আগেই ভারত-পথিক হয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলেন, রশীদ চৌধুরী সেখানে পড়াশুনা শেষ করেই ইউরোপের পথে নেমেছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি স্পেনে যান ভাস্কর্য নিয়ে পড়াশোনা করতে, মাদ্রিদের সেন্ট্রাল স্কুল অফ ফাইন আর্টস-এ। রশীদ স্থাপত্যে যে শিক্ষা নেন, তার খুব ঘনিষ্ঠ প্রয়োগ করেননি। তাঁকে ভাস্কর হিসেবে কেউ বিবেচনা করবে না। তবে তার বয়নশিল্পের দিকে মনোযোগ নিয়ে তাকালে বোঝা যাবে, তাঁর বয়ন-বিন্যাস এবং নকশায় একটা স্থাপত্যসুলভ ভাব আছে। স্থাপত্যের যে গুণগুলো তিনি তাঁর বয়নের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসেন, সেগুলো হচ্ছে বয়ন-ক্ষেত্রের দার্ঢ্য, নকশার মধ্যে ঘনত্বের একটা আভাস, জ্যামিতিক বিন্যাস এবং নির্মাণের বিশালতা। এ প্রদর্শনীতে এমন কিছু বয়ন-নমুনা আছে, যেগুলো আগে প্রদর্শিত হয়নি। এগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের দাবিদার *উৎসবের হাতি* এবং *নবান্ন*। *উৎসবের হাতি* বড় কাজ এবং এ বয়নে লাল, সবুজ ইত্যাদি উজ্জ্বল রঙের পাশাপাশি খয়েরি ও মেটে রং ব্যবহার করেছেন শিল্পী। সমগ্র ট্যাপেস্ট্রিটি একটি আনন্দিত অনভূতিকেই তুলে ধরে, যেন উৎসবের মূল মেজাজটাই এর বয়ন-কৌশল এবং রঙের সম্মিলনে ওঠে এসেছে। এ দুই বড় কাজে ভাস্কর্যের আদলে তার ফিগার এবং জ্যামিতির বিন্যাস ব্যক্ত হয়। *নবান্নতে* অবশ্য রং অনেক নমিত, শুধু মাঝখানে এ দুই ছোপ সবুজ– 'টিয়ার সবুজ' ছাড়া। কিন্তু নবান্নর সময়টি প্রকৃতিতে উজ্জ্বল রঙের সময় নয়, বরং এক পরিপক্ক পাকা রং, হলুদ থেকে যা রাসেটের দিকে যায়, প্রকৃতিতে এসময় বিছিয়ে থাকে। তবে প্রকৃতিতে না হলেও নবান্নের মৌসুমে পাখিদের আনাগোনা বাড়ে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধান-চাল বা খুদ-কুড়ো পাখিদের টেনে আনে। টিয়াদের জন্যও সময়টা সুসময়। রশীদ চৌধুরী প্রকৃতির রং নির্বাচনের বাইরে যাননি, বরং এক ধরনের চিরন্তনবোধের মধ্য দিয়ে ঋতু, সময় ও লোকজীবনকে তিনি দেখেছেন। ট্যাপেস্ট্রিতে তিনি মাঝে মাঝে বাংলা ক্যালিগ্রাফির ঢঙে অক্ষরগুলো বিন্যাস করতেন। এ প্রদর্শনীতেও এর নমুনা দেখা যাবে। বলা যায়, রশীদ চৌধুরীর বয়নশিল্পের মূল আবহ, শৈলী টেকনিক-সবই ধরে রেখেছে প্রদর্শিত ট্যাপেস্ট্রিগুলো।

রশীদ চৌধুরী শুধু ভাস্কর্য নিয়েই পড়েননি, বরং এর সঙ্গে ফ্রেসকো নিয়েও পড়াশোনা করেছেন। স্পেন থেকে ১৯৫৮ সলে তিনি দেশে ফিরেছিলেন এবং কিছুদিন পর প্যারিস গেলেন একাডেমে অফ জুলিয়াতে ভাস্কর্য, ফ্রেসকো এবং ট্যাপেস্ট্রি পড়তে। দেখা যাচ্ছে ট্যাপেস্ট্রির আগে তিনি ৩ বা ৪টি মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; কিন্তু শেষমেষ মূল মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ট্যাপেস্ট্রিকে, তার কারণ এটিকে তিনি সম্পূর্ণ এবং সূক্ষ্ম একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে দেখতেন, যেখানে শিল্পের সঙ্গে কারুকলার একটা পরস্পর সম্পর্কিত টানাপোড়ন চলে। এ টানাপোড়নের একটি চমৎকার সমাধান অথবা ভারসাম্য তিনি করেছেন তাঁর ট্যাপেস্ট্রিতে। এখানে শুধু মেধা নয়, দক্ষতারও প্রয়োজন। এ দক্ষতা একজন বয়নশিল্পীর।

রশীদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রিতে প্রথাগত এবং আধুনিক তথা জ্যামিতিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিমূর্ত নকশার উপস্থিতি লক্ষণীয়। অনেক কাজেই তিনি জ্যামিতিক ফর্ম-বিন্যাসের পাশাপাশি অদ্ভুত বা পরাবাস্তবের চিত্রায়ন করেছেন। অনেক সময় ফিগারের জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন কিংবদন্তি অথবা লোকগল্পের। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার ফিগার ও ফর্মকে দেখেন—কখনো উল্লম্ব, কখনো আনুভূমিক, কখনো ওপর থেকে। কিন্তু সর্বত্র এদের ভিতর গতিশীলতার একটা আবহ তিনি তৈরি করেন। তাছাড়া ট্যাপেস্ট্রির নানা জায়গাকে তিনি কখনো শুধু রং দিয়ে ভরে, কখনো হালকা কিছু ফিগার বা ফর্মের আভাস দিয়ে ভরাট বা ভীড়াক্রান্ত জায়গার সঙ্গে একটা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেন। এতে চোখ কখনো এক জায়গায়

স্থির থাকে না। পুরো কাজজুড়ে যখন দৃষ্টি যেতে থাকে, ট্যাপেস্ট্রির শৈল্পিক উদ্দেশ্যটি তখন পূর্ণ হয়। তাছাড়া রশীদ চৌধুরী বয়নে যে ঘনত্ব বজায় রাখতেন, তা দর্শকের ইন্দ্রিয় প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে। এ বিষয়টি বয়নশিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ শিল্পের একটি প্রধান বিবেচনা হচ্ছে স্পর্শের বোধকে জাগ্রত করা– যেন দর্শক হাত দিয়ে– কাজটি ধরে দেখতে অনুভব করতে উৎসাহী হয়। নান্দনিকতার জন্য এ প্রতিক্রিয়া খুবই অর্থবহ।

আগেই বলেছি, রশীদ কুশলী শিল্পী ছিলেন। তিনি পশম ও রেশম দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করতেন, যদিও তুলার তৈরি সূতা এবং অন্যান্য তন্তুও তিনি কাজে লাগাতেন। ঢাকার মিরপুরে তিনি নিজ উদ্যোগে একটি বয়নশিল্প কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। সেটির বর্তমান অবস্থা কী, জানি না। কিন্তু উদ্যোগটি ছিল একজন নিবেদিত শিল্পীর। সেজন্যও তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এ প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া রশীদ চৌধুরীর ১৯৬০ সালের আঁকা একটি ড্রইং এবং একটি তেলরং উল্লেখযোগ্য। তেলরংটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি মেয়ে মাঠ থেকে গরু বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ বিষয়, কিন্তু ছবির ভিতরের ব্যাপ্তিটি, মানুষ ও প্রাণীর সম্পর্কের ভারসাম্য একটি গভীরতার দ্যোতনা দেয়, তাঁর অন্যান্য কাজের মতন।

৮.

এরকম একটি প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করব, আগামীতে এরকমের আরও একটি প্রদর্শনী আমরা দেখব এবং নিকট ভবিষ্যতে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক শিল্পকলা জাদুঘর পাব।

কিবরিয়া স্মরণে

মোহাম্মদ কিবরিয়া লোকান্তরিত হন ৭ জুন ২০১১ তারিখে এবং তাঁর তিরোধানের মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিক শিল্পের ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। যে পরিচ্ছেদে তিনি ছিলেন এক প্রধান চরিত্র। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনক্ষমতা দিয়ে যে শুধুই আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পের একটি আবহই তৈরি করেছেন তা নয়; একই সঙ্গে একে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও তিনি একটি বড় ভূমিকা রেখেছেন। কিবরিয়ার পরবর্তী চিত্রকলায় একটি শূন্যতা তাই থেকেই যাবে।

কিবরিয়ার শিল্প শিক্ষা শুরু হয় কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে। স্কুলটির ঝোঁক ছিল বাস্তববাদ এবং প্রথাগত চিত্র রচনার ওপর। নব্যবঙ্গীয় রীতির চিত্রচর্চা ও অনুচিত্রের ঐতিহ্যের প্রভাবও তাঁর ওপর পড়েছিল, যা তাঁকে রেখারও রঙের শক্তি এবং পরিসরের নানাবিধ মাত্রা সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ফরাসি প্রভাববাদীদের চিত্রকলাও ছিল তাঁর পছন্দের বিয়য়। তাদের থেকে নিসর্গের দ্যোতনাময় এবং ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রায়নের বিষয়টি এবং বস্তুর অন্তর্গত জীবন সম্পর্কে তিনি দীক্ষা পেয়েছিলেন। একসময় তিনি যামিনী রায়ের ছবির এবং তাঁর অনুসৃত বাংলার পট ঐতিহ্যের বিশেষ করে দ্বিমাত্রিকতার গুণগ্রাহী হন। এসব প্রভাব ও পছন্দ তিনি নিজের মতো করে কাজে লাগিয়েছেন, যা তাঁকে বস্তুর 'অভ্যন্তরীণ কাঠামো' অন্বেষণে সহায়তা করেছে।

১৯৫১ সালে বসবাসের জন্য ঢাকায় চলে এলে কিবরিয়া নিজস্ব একটি শৈলী তৈরিতে মনোনিবেশ করেন, যা একই সঙ্গে বিমূর্ততার প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং সময়ের ভঙ্গুর এবং স্থিতিহীনবোধ অনুভূতিগুলোকে তুলে ধরবে। বিমূর্ততাকে তিনি একটি কৌশল হিসেবে দেখেছিলেন, যার মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে উঁকি দেওয়া একজন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব ছিল। ১৯৫০-এর দশকে কিবরিয়া অবয়বধর্মিতা ও বিমূর্ততার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন। নিসর্গও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এর উপস্থাপনায় ধ্যানমগ্নতার একটি মাত্রা ছিল এবং তার শৈলী, ফর্ম ও বুনোটের সম্ভাবনাগুলো পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন। এ দুই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে তাঁর কাজের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫৯ সালে কিবরিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য জাপান যান। জাপানে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং কাঠখোদাই ও ছাপাই ছবির খুঁটিনাটি আয়ত্ত করেন। তাঁর পরিসর ও রেখা নির্মাণও হয়ে দাঁড়ায় বিচিত্র এবং তাঁর নির্মাণে আসে ভারসাম্য ও কাঠামোগত দৃঢ়তা। জাপান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর ক্যানভাসে আনুভূমিক বিস্তৃতি দেখা যেতে থাকে, যা সময় প্রবাহে অভিজ্ঞতার নির্যাস তৈরির একটি উদ্যোগেরই প্রতিরূপ। এসময় তার অবয়বে আসে ভাঙন, রচনায় আসে জ্যামিতি এবং গতিশীলতা, আর রঙে আসে স্থিরতা।

১৯৬০-এর দশকে যখন কিবরিয়ার ছবিতে প্রকাশবাদী পর্যায়টি শুরু হয়, তিনি তার 'অর্থময় আকার' নির্মাণের জন্য রং ও বুনোটের ওপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেন। নীল রংটির গুরুত্ব পায়, যা একাকীত্ব ও হতাশাকে প্রতিভাত করে। বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের চক্র যা অস্তিত্ববাদী চিন্তায় একটি 'অনতিক্রান্ত বৃত্তের' স্মারক, তার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। বৃদ্ধিকে ব্যাহত করা এ ক্ষয়কে বাঙ্ময় করে ধূসর, লাল, পিঙ্গল ও এরকম অন্যান্য রং। তাঁর কাজে ধ্যানমগ্নতা বাড়তে থাকে, যদিও স্মৃতিতে হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা আনন্দের প্রকাশও তিনি ঘটান, সোমাইয়া/বাদামি ও সবুজের নানা আভাসে।

কিবরিয়া অবশ্য হঠাৎ করেই বিমূর্ততায় পা রাখেননি। এ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ছিল এবং বিমূর্ততায় পৌঁছানোর আগে অনেকগুলো প্রশ্নেরও উত্তর তিনি খুঁজেছেন, যেমন : বিমূর্ততা কি শুধুমাত্র এক চিত্রকরসুলভ ভাষা? সময়ের চাহিদা, মহাযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর জটিল আবহের প্রতিচ্ছবি? বিমূর্ততার মধ্যে কিবরিয়া বাস্তবানুগ রূপায়ণের ভার লাঘব করতে পেরেছিলেন। বিমূর্ততা তাঁকে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা তৈরির একটা সুযোগ করে দেয়। তিনি রূপায়ণ থেকে বেশি উৎসাহী ছিলেন ব্যাখ্যা তৈরিতে; কাজেই চিত্রকরসুলভ ভাষাকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন জীবনের নানা জটিলতা ও পরস্পর বিরোধিতা তুলে ধারার পাশাপাশি, তাঁর শিল্প সৃষ্টির নিজস্বতাকে মূর্ত করার উপায় হিসেবে। বিমূর্ততা হচ্ছে আধুনিক জীবনের অর্থহীন, ক্লান্তিকর, পারক্যবোধ আক্রান্ত এবং নানান অনুপস্থিতিতে কাতর বাস্তবতার একটি প্রকাশ, কিন্তু এটি একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল স্বাধীনতার একটি ক্ষেত্রও বটে। হার্বার্ট রীড তাঁর 'আধুনিক শিল্পের দর্শন' বইতে লিখেছেন, 'বিমূর্ততা হচ্ছে শূন্যতার খাদের সামনে দাঁড়ানো মানুষের প্রতিক্রিয়া; জৈবিক নিয়মকে সন্দেহ বা অস্বীকার করে যে কেউ, তার প্রকাশ এবং এরকম অবস্থায় পড়া মানুষের মনের সৃষ্টিশীল স্বাধীনতাকে যা সত্যায়ন করে (১৯৬৭-৯৫)।' কিবরিয়া রীডের অনুরাগী ছিলেন এবং তিনিও বিশ্বাস করতেন, বিমূর্তায়ন প্রকৃতিকে অস্বীকার করে না, বরং প্রকৃতির শুদ্ধ আকারগুলো নতুন করে নির্মাণ করে। সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা হচ্ছে শূন্যতার কেন্দ্রে পা ফেলা এবং জীবনের উদ্‌যাপনে শামিল হওয়ার শক্তি। কিবরিয়ার ছবিতে বিমূর্তায়নকে তাই অনুপস্থিতি ও অনিশ্চয়তা এবং একই সঙ্গে উপস্থিতি ও সহমর্মিতার বিচারে ব্যাখ্যা করা যায়। অনুপস্থিতি শুধু যায় না, তার দিকেই আঙুল তোলে না, বরং কেন নেই, সে প্রশ্নেরও অবতারণা করে। যা নেই, কিবরিয়ার ছবি তা দেখায় এবং বিষাদের এক গভীর বোধ এবং পুরাতন সময়ের জন্য এক বিশাল কষ্ট খুব সহজেই অনুপস্থিতির বিষয়গুলোকে মূর্ত করে। যদি বাস্তববাদী কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপস্থিতি; বিমূর্ত ছবি দেখা তার বিপরীত।

বিমূর্ততার গভীরে যেতে গিয়ে কিবরিয়া ফর্ম বা আকারের নির্যাস অনুসন্ধান করেছেন, যে নির্যাসকে ক্লাইভ বেল 'অর্থময় আকার' বলে অভিহিত করেছেন। বেল-এর মতে আকার তখনই অর্থময় হয়, যখন তার পক্ষে প্রকাশ করার মতো কিছু থাকে। কিবরিয়ার অবশ্যই অনেক কিছুই প্রকাশ করার ছিল, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রং আকার ও বুনোট ব্যবহার করেছেন। বিমূর্তায়নের পথে অগ্রসর হলে তার আকারগুলো রচনার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ্ কাঠামোর এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক; এর জ্যামিতিক সংগঠন– যার ভিতর দিয়ে বিস্তৃত ছিল নানা রৈখিক ও পরিসরগত আয়োজন এবং দ্যোতনাময় রং সমষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। যেমন নীল রংটি, যা কিবরিয়ার বিশেষ প্রিয় ছিল, তাঁর ক্যানভাসে শুধু এজন্য উপস্থিত ছিল না যে, এটি সহজেই দুঃখ-হতাশাকে প্রকাশ করে, অথবা আকাশ বা সমুদ্রকে স্মরণে আনে। বরং এজন্যও যে, এ মাধ্যমে তিনি চেতনার ব্যাপক বিস্তৃতি এবং পরিচিত দিগন্ত ছাড়িয়ে মনের দূরবিস্তারী হওয়ার ক্ষমতাকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁর ধূসর, পিঙ্গল বা লাল রঙের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। কিন্তু প্রতিটি রং ব্যবহারের পিছনে কিবরিয়ার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। এ বিষয়ে তাঁর ভাবনাকে এলোমেলো হতে তিনি কখনো দিতেন না।

২.

কিবরিয়ার শিল্পীজীবনকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি যদিও একটির সঙ্গে আরেকটির সংযুক্তি ছিল একেবারে আলাদা খোপে যেগুলো ঢোকানো ছিল না। প্রথম পর্যায়টি শুরু হয় কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে তাঁর পাস করে বেরুনো থেকে নিয়ে ১৯৫৯ সালে তাঁর জাপান যাত্রা পর্যন্ত। এ পর্যায়ে তিনি রঙের ঐক্য নিয়ে ভেবেছেন এবং তাঁর কাজে প্রকাশের শক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তির বাইরের ও ভিতরের পৃথিবী সম্বন্ধে এবং মানুষ ও তার পরিবেশের জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে উৎসাহিত ছিলেন। এ পর্যায়ের তাঁর নিসর্গচিত্রে একটি সমাহিত ভাব, এমনকি ধ্যানমগ্নতাও লক্ষণীয়। এবং তাঁর অবয়বগুলোকে আমাদের সময়ের প্রতিধ্বনি করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের একটা সমুন্নতিও দিয়েছেন যদিও তাঁর কাজের মূল সুরটি বিষণ্ন, অথবা ভাবমগ্ন।

কিবরিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় ছিল জাপানে কাটানো দুটি বছর। এসময় তিনি পাথর ও কাঠখোদাইয়ের জটিল বিষয়গুলো আয়ত্ত করেছেন এবং পরিসরের বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। তিনি জাপানি জলরঙের স্বচ্ছতা এবং আলোময়তার প্রশংসা করতেন। এসময় তিনি বিমূর্ততার মৌলিক এবং অস্তিত্বধর্মী বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করেন এবং বস্তু ও আকারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিয়ে গবেষণা করেন। এ পর্যায়ে তাঁর পরিসর চিন্তাতেও পরিবর্তন ঘটে, পরিসর তার ব্যঞ্জনাময় তলদেশের সন্ধানী হয়। এর ফলে তাঁর কাজে এক ধরনের লিরিকধর্মিতা এবং একই সাথে সাংগখ শুদ্ধতার একটি মাত্রা আসে।

কিবরিয়ার তৃতীয় পর্যায়ের শুরু তিনি জাপান থেকে দেশে ফিরে আসার পর। এ সময় তিনি তাঁর অর্থময় আকারের সন্ধান আরও গতিশীল করে তোলেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আবেগগত এবং দৃষ্টিগত অভিজ্ঞতা একটি আকৃতি দেওয়ার সম্ভাবনাটি দেখতে পেয়েছিলেন। যাতে সেগুলো প্রাত্যহিকতার মাত্রা ছেড়ে একটা সমুন্নতির সন্ধান পায়। তার আকারগুলোকে আরও বেশি গতিশীল এবং বিস্তৃত করার নতুন সম্ভাবনা তিনি বিমূর্তায়নে দেখতে পান। তাছাড়া হার্বার্ট রীড কথিত পারস্পরিক টেনশনের বিষয়গুলো প্রকাশে বিমূর্ততাকে তিনি একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেগুলোর মধ্যে আছে উপস্থিতি-অনুপস্থিতি, হতাশা-উচ্ছ্বাস এবং জীবন-মৃত্যুর মতো বৈপরীত্য। এ পর্যায়টি কিবরিয়ার জীবনে সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে জটিলও, যেহেতু এ সময়কালে তাঁর বিশ্ব ও সমাজে ঘটে গেছে বিশাল অভিঘাতের নানা ঘটনা। যেমন ইতিহাসের নানা পালাবদল, প্রযুক্তির বিকাশ, বিশ্বায়নের আবির্ভাব ও বিকাশ এবং শিল্পসাহিত্য ও স্থাপত্যে আধুনিক যুগের কল্পিত অবসান ও উত্তরাধুনিক যুগের পরিবর্তনের আত্মপ্রকাশ। কিবরিয়ার কাজে এসব ঘটনার উত্তেজনা অথবা প্রত্যাশা এবং পরিবর্তনের কোনো সরাসরি ছায়াপাত হয়নি। কিন্তু তাঁর কাজেও এসেছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তন এসেছে অনেক ভাবে, তবে প্রধানত তাঁর ছবির ভাষাতে ক্রমাগত পরিশীলিত একটি মেজাজের উপস্থিতিতে।

কিবরিয়ার চতুর্থ পর্যায়ের সূত্রপাত ১৯৯৮ সালে তাঁর গুরুতর অসুস্থ হওয়া ও সেরে ওঠার পর। তাঁর অসুস্থতা এমনই ছিল যে, ডাক্তাররাও তা থেকে মুক্তির আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হলেন, জীবনেও ফিরলেন এবং চিত্রচর্চাও শুরু করলেন। এ প্রায় অলৌকিক অভিজ্ঞতাটি তাঁর জন্য ছিল পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তিনি ক্ষয় থেকে বৃদ্ধি, অবসাদ-ক্লান্তি-কষ্ট থেকে স্বস্তি ও আনন্দে পা বাড়ালেন। তাঁর পুরনো ভাষা বা বোধের বিষয়গুলো যে তিনি ছেড়ে দিলেন, তা নয়; কিন্তু এক সহজ নিরুদ্বিগ্ন সৌন্দর্যের প্রকাশ তার ছবিতে দেখা গেল। ১৯৯৮ এর পর তিনি প্যাপিয়ের-কোলের মাধ্যমে যে কিছু কাজ করেছেন, তাতে এক কৌতুকের একটা মাত্রাও দৃশ্যমান। তাঁর রং হয়ে দাঁড়াল আরও জীবন্ত। তবে তাঁর কাজে, এমনকি তাঁর শেষ কাজগুলোতেও সমাহিত ভাবের বিষয়টি অনুপস্থিত নয়। একধরনের স্থিরতা এবং নির্জন অনুভবেরও দেখা মেলে সেসব কাজে।

২০০৪ সালে আমি কিবরিয়ার ওপর একটি বই লিখি, যা প্রকাশ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সেই বইতে আমি লিখেছিলাম, কিবরিয়া পরবর্তী চিত্রভাষায়, বার বার তাঁর উদ্ধৃতি থাকবে, তাঁর কাজের কাছে সে ভাষা ফিরে যাবে। এখন, তাঁর তিরোধানের পর, একথাটাও আমি বলতে পারি চিত্রভাষাকে তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে হবে, তার প্রভাব বলয় থেকে বেরুতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের থেকে তিনি একটি আশা করতেন। এবং এটি সফলভাবে করা গেলে তাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প

চল্লিশ বছর ধরে লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ এবং তাঁর প্রতিটি বই উপন্যাস, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী পড়ার জন্য পাঠক উন্মুখ হয়ে থাকত। শরীরে কঠিন ব্যাধি নিয়েও তিনি লিখেছেন এবং শেষ স্বদেশ ভ্রমণে এরকম একটা আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, সুস্থ হয়ে তিনি দেশে ফিরবেন, নিয়মিত লেখালেখি শুরু করবেন। হুমায়ূনকে 'জনপ্রিয়' লেখক হিসেবে বর্ণনা করতেই অনেকে পছন্দ করতেন, কেউ এ 'জনপ্রিয়' কথাটিকে একটু তীর্যকভাবে উপস্থাপিত করতেন, এ কথা প্রমাণ করতে যে, জনপ্রিয়তা আর মেধা এক জিনিস নয়; যে হুমায়ূন জনপ্রিয় বটে তবে উঁচুদরের লেখক নন। তবে এটি যে সঠিক মূল্যায়ন নয় তাঁর সম্বন্ধে, এতো তাঁর কয়েকটি বাছাই উপন্যাস পড়লেই পরিষ্কার হয়। এবং শুধু বাছাই কয়েকটি উপন্যাসই বা কেন বলি, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও যখন তিনি পাঠককে সম্মোহিত করে জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানব মনে, নানা জটিলতা, সমকালীন নানা অনাচার বিচ্যুতি এবং জটিলতা অথবা মানুষের প্রেম-বিদ্রোহ-সফলতা-অসাফল্যের গল্প শোনান, তখন তাঁকে কোন বিচারেই তো 'নিচুদরের' বলা যায় না। যে উপন্যাস একবার পড়তে বসলে শেষ না করা পর্যন্ত রাখা যায় না, তাকে উঁচু-নিচুর বিভাজনে ফেলে বিচার করার কোনো অর্থ হয় না। তাঁর পাঠকেরা তাঁকে চেনেন কথার জাদুকর হিসেবে। তাদের বিচারে বহু আগেই তিনি উতরে গেছেন এবং এ পাঠক শুধু বাংলাদেশেরই নয় পশ্চিমবঙ্গেও আছে। কলকাতার ছোট কাগজ রিভিউ প্রিভিউ-

তে (৫ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা বর্ষ ১৪১৯) অরুণাভ দাস তাঁর 'উতলধারা শ্রাবণরাতে চলে গেলেন হিম' স্মরণপ্রবন্ধে লিখেছেন, "বছরের পর বছর একটা করে হিমুর বই বেরোয় আর আমরা পাগলের মতো কিনতে ছুটে যাই। হিমু-পাগলের এ দলটা ক্রমশ ভারী হতে হতে জনসমুদ্রের মতো পাঠকসমুদ্রে পরিণত হয়"(৩৭)। তবে উঁচু-নিচু বিভাজনের একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন আরেক লেখক চন্দন আনোয়ার তাঁর "হুমায়ূন আহমেদ : জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মৃত্যু ও দু'একটি ভাবনা" নিবন্ধে নিবন্ধের কথাটি হলো "অনেক সিরিয়াস সাহিত্য যেমন পাঠকের অভাবে হারিয়ে যায়, তেমন আবার জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ হবার দৃষ্টান্তের অভাব নেই"(৪০)। তিনি হুমায়ূনকে এ দ্বিতীয় ধারার সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচনা করে যে মন্তব্য করেছেন, সেগুলো হুমায়ূনের প্রতিভাকে একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে। এখানে একটি উদ্ধৃতি, কিছুটা দীর্ঘ হলেও গুরুত্বপূর্ণ :

এতটা শক্তি ও সামর্থ্য রাখেন যে লেখক, তাঁর দেশ ও জাতির প্রাণের মানুষে পরিণত হয়েছেন যে লেখক, তিনি এবং তাঁর লেখাকে কী করে সিরিয়াস সাহিত্য নয় বলে দূরে ঠেলি। নিজের কাছে সৎ থাকতে হলে স্বীকার করতেই হবে, সিরিয়াস বা ক্লাসিক সাহিত্য হচ্ছে না বলে মোটের উপরে হুমায়ুন আহমেদকে প্রত্যাখ্যান, তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য ও অবহেলাই করে আসছে সিরিয়াস সাহিত্যের মুষ্টিমেয় লেখক, পাঠক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপকরা। সারা বছরে যে লেখকের বই ১০০ জন পাঠকের কাছে যায় না বা পাঠক গ্রহণ করে না, আর যে লেখকের একটি বই-ই ২৫ লাখ পাঠকের কাছে পৌঁছায়; এ দুই লেখকের তুলনা করা উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্ন কার কাছে করা যায়? ...সাহিত্য যদি মানুষের জন্য হয়, তবে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিতবোদ্ধার কাছে নয়, তৃণমূল মানুষের কাছে, সব বয়সের সব মত-পথের মানুষের কাছে লেখকের লেখাটি পৌঁছাতে হবে, মানুষকে পড়তে বাধ্য করতে হবে। (৪৩)

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় তফাৎ হলো, পড়ার সংস্কৃতিটাকে আমরা যখন বিসর্জন দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে

সেটিকে শুধু টিকিয়েই রাখেনি উজ্জীবিতও করছে। শুধু একটি মাত্র ছোটকাগজে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যে দুটি 'উঁচুমানের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো– আমি নিশ্চিত, আরও অনেক লেখা সেখানকার পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে–তাতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায়, সিরিয়াস পাঠক শুধু নয়, সিরিয়াস লেখকও সেখানে আছেন, যারা সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং পাঠকদের জানা ও বোঝার পরিধিটা ক্রমাগত বাড়ান। হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য পাঠক আছেন বাংলাদেশে, কিন্তু তাঁর লেখালেখি নিয়ে গবেষণা হয়নি, প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখা হয়নি। যদি শরৎচন্দ্রকে জনপ্রিয় লেখক হিসেবে বিবেচনা করেও তার ওপর সিরিয়াস (অর্থাৎ গবেষণামূলক) প্রবন্ধ করা যায়, এমফিল পিএইচডি গবেষণা করা যায়, তাহলে হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখি নিয়ে নিধেন পক্ষে দু'তিনখানা সিরিয়াস প্রবন্ধ তো ছাপা হতে পারত। বহুদেশে এখন সাহিত্য বিভাগগুলোতে কালচারাল স্টাডিজ অথবা সংস্কৃতি পঠন এটি বিষয় হিসেবে চালু হয়েছে। সখ্যত গঠনে জনপ্রিয় সাহিত্যকে নতুনভাবে দেখা হচ্ছে আর উত্তরাধুনিক সাহিত্য বিচারে জনপ্রিয় সাহিত্যকে তা মোটামুটি মূলধারার সাহিত্যের পাশে রেখেই পড়া হচ্ছে। সংস্কৃতি পঠনে সাহিত্যের পিছনে সামাজিক শক্তি, সমাজ সংগঠন এবং অর্থনীতির রাজনীতির প্রভাবকে খতিয়ে দেখা হয়, সাহিত্যের দৃশ্যময়তা, পৃথিবীতে এর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। একদিন হয়তো এরকম উদ্যোগ বাংলাদেশেও নেওয়া হবে এবং সাহিত্যপাঠে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। তখন হুমায়ূনকে নিয়ে নতুন করে যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে সে পর্যন্ত হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্মের নিশ্চয় নানা মূল্যায়ন হবে, সেরকম একটি মূল্যায়ন হতে পারে তার লেখালেখির একটি উপেক্ষিত অঞ্চল নিয়ে। এবং এ অঞ্চলটি হচ্ছে ছোটগল্প। বহুদিন থেকেই আমি তাঁর ছোটগল্পের একজন উৎসাহী পাঠক। নানা পত্রপত্রিকা ও সংকলনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটগল্প এবং দুই নির্বাচিত সংকলনে সংযুক্ত তাঁর আশিটির মতো ছোটগল্প পড়ে আমার মনে হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ছোটগল্প লেখকদের একজন হুমায়ূন আহমেদ। এবং যেসব সমালোচক

তাঁকে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলোর জন্য উচ্চমূল্য দিতে রাজি নন, তারাও তাঁর ছোটগল্পগুলোর জন্য তাঁকে সেই মূল্য, অথবা সিরিয়াস লেখকের উত্তরীয় পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। ১৯৯২ সালে কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'গল্পসমগ্র' এবং ২০১২ সালে সালেহ চৌধুরীর সম্পাদনায় অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত 'বাছাই গল্প' প্রধানত আমার বিবেচনা। তবে অন্যান্য সংকলন ও পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া গল্পগুলোও একই সঙ্গে আমরা মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত। আমি এরকম একটি দাবিও করতে পারি যে, হুমায়ুন যদি শুধু ছোটগল্প লিখতেন, একটিও উপন্যাস না লিখতেন, তাহলেও তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটা মর্যাদার জায়গা পাঠকরা দিত।

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্মাণ। বিশ্বসাহিত্যে যেসব ছোটগল্প একটা স্থায়ী আসন পেয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প, সেগুলোর ভিতর অভিন্ন যে কিছু সূত্রের দেখা পাওয়া যায় এবং তাদের কাহিনী রেখাবিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ এবং ঘটনার পরম্পরাও অভিঘাত সৃষ্টিতে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, হুমায়ূনের অনেক ছোটগল্পেও তা দেখা যায়। এসব ছোটগল্পের সঙ্গে মোঘল অথবা দক্ষিণ ভারতীয় অনুচিত্রের তুলনা করা যায়। অনুচিত্র কলেবরে ছোট হলেও এর দেখা ও দেখানোর জগৎটি মোটেও ক্ষুদ্র নয়, এর চিন্তাভাবনা অথবা বোধের জগতের গভীরতাও সামান্য নয়। একটি অনুচিত্রের বিন্দুতে জীবনি ও কল্পনার সিন্ধুদর্শন সম্ভব। ছোটগল্পেও তাই। পরিসরে অবশ্যই ছোট, কিন্তু ছোটগল্পের পৃথিবীতে বৈচিত্র্য, জীবনবোধ, বাস্তব-অবাস্তব অথবা বাস্তবের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক বড় মাত্রায় বিন্যস্ত হতে পারে। হুমায়ূন আহমেদের 'শিকার', 'খাদক', 'উনিশশ্শ একাত্তর' অথবা 'অপেক্ষা' মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার গল্প, কিন্তু এসব গল্পের ভিতরের বিস্তারটি অনেক পরিব্যাপ্ত। এটি সম্ভব হয়েছে গল্পকারের সংবেদী মন, তার দৃষ্টির গভীরতা ও স্বচ্ছতা এবং বর্ণনার কুহুক সৃষ্টির ক্ষমতার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের 'ওপেন-এন্ডেড' অথবা উন্মুক্ত সমাপ্তির চরিত্রের আবশ্যকতার কথা বলেছেন। ছোটগল্প যেন শেষ হয়েও

শেষ হয়নি, এরকম একটি অনুভূতি পাঠকের মনে রেখে যায়, যাতে গল্পের শেষে সে বইটি বন্ধ করে চলে না যায়, বরং গল্পটি নিয়ে ভাবতে বসে। এর যে পরিণতিটি লেখক দিয়েছেন, তার বাইরে গিয়ে বিকল্প অনেক পরিণতির কথা সে ভেবে নিতে পারে। সেরকম সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। আমার মনে হয়েছে হুমায়ূন আমমেদ এ উন্মুক্ত-সমাপ্তির এক কুশলী নির্মাতা। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প এর সমাপ্তিতে একটি চমক রেখে যায়, একটা আক্ষেপ, একটি দীর্ঘশ্বাস অথবা একটা উদ্বেগ রেখে যায়। কোনো কোনো গল্পে তৃপ্তিও থাকে, আনন্দ থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এ সমাপ্তি কোনো দৃঢ় সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়ে যায় না, বরং পাঠককে গল্পের জীবনে ডুবিয়ে চমৎকৃত করে, স্তম্ভিত করে, অবশ করে অথবা পুলকিত করে। হুমায়ূনের গল্পে কাহিনী রেখা এগোয় নিজস্ব এক গতিধারায়, এর পথটি আগে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না। মোপাসাঁর গল্পের শেষে দুর্দান্ত কিছু চমক অপেক্ষা করে পাঠকের জন্য। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন মোপাসাঁর একটি গল্প আমাদের পাঠ্য ছিল। সেটা পড়াতেন যে স্যার, তিনি বলতেন এ চমকের জন্য মোপাসাঁর এটি গল্প দু'বার পড়তে আগ্রহী হয় পাঠক। তিনি নিজে কোনো কোনো গল্প চার-পাঁচবার পড়েছেন বলে স্যার জানিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদের অনেক গল্প আমি একাধিকবার পড়েছি। প্রতিবারই শেষের চমক অথবা ঘটনার হঠাৎ কোনো মোড় ফেরা অথবা কোনো তীব্র পর্যবেক্ষণ নতুন করে ধরা পড়েছে। 'খাদক' গল্পটির কথাই ধরা যাক। দরিদ্র একজন মানুষ, খেয়েই যে জীবিকা নির্বাহ করে। তাকে খেতে হয় এবং প্রচুর খেতে হয়, যেহেতু তাকে নিয়ে বাজি ধরা হয়। অথচ খাদকের সন্তানেরা থাকে প্রায় অভুক্তই। লেখক যেদিন খাদকের খাদ্যগ্রহণ চ্যালেঞ্জটি পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি দেখছেন, এ খাদ্যগ্রহণ ব্যাপারটি কত নির্মম। বাজিতে জিততে হলে তাকে সব খাবার শেষ করতে হবে। সে কি পারবে তার অভুক্ত সন্তানের মুখে এক টুকরা মাংস তুলে দিতে? লেখক নিজেই বলছেন, না, বাস্তবে তা হবে না। একটি সাধারণ ঘটনার গল্প, অথচ কী অসাধারণ এর পর্যবেক্ষণ শক্তি। একটা হাহাকার তুলে গল্পটি শেষ হয় কিন্তু শেষ হওয়ার আগে

খাদকের জীবনের ভয়ানক মানবিক দিকটার ওপর যে তীর্যক আলোটি পড়ে, তা গল্পটিকে অসাধারণ একটি স্তরে উন্নীত করে।

ছোটগল্পগুলোতে হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, যেহেতু তাঁর মন পড়ে থাকে সাধারণ মানুষের জীবনে। এসব সাধারণ মানুষ নিতান্তই সাধারণ একজন গৃহকর্মী, একজন স্কুল শিক্ষক, একজন জনপ্রিয় গুণীন, একজন দরিদ্র বাবা। তাদের জীবনের গল্পগুলোও সাধারণ। সেগুলোর পিছনে কোনো ঘটনার ডামাডোল নেই, বিশাল বিশাল সব প্রস্তুতির ব্যাপার নেই, জীবনের চাইতে বড় বড় সব মানুষের আনাগোনা নেই। অথচ এ সামান্য গল্পগুলোই শুধু বলার কুশলতার জন্য একটা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি পায়। 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটির কথা বলা যায়।

একজন সামান্য মানুষ তার কাঁধে ভার নিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞের বিচার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব। সমাজ নির্বোধ, ভালোবাসাহীন, ক্ষমতাসীনরা আপসে ব্যস্ত, কিন্তু সব বাধা তুচ্ছ করে মানুষটি এগিয়ে যায়। তার সংগ্রাম একটি গোটা জাতির সংগ্রামের প্রতীকী মর্যাদা পায়। আমরা জানি, জলিল সাহেব তার জীবনকালে বিচার দেখে যেতে পারবেন না। কিন্তু গল্প শেষের চমকটি আমাদের নিজের, তাকে নিয়ে নয়। একে তো অনেক বছর পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক হাজার স্বাক্ষর জলিল সাহেব পেলেন, ফলে জাতি হিসেবে আমরা কাঠগড়ায় উঠলাম, তার ওপর লেখককে যখন জলিল সাহেবের মেয়ে জানাল, তার বাবা বলে গেছেন তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য। লেখক একদিন এগিয়ে আসলেন, লেখক তখন নিজেকেই কাঠগড়ায় তুললেন। এ চমকটি গ্লানির এবং লজ্জার। এটি একদিকে আমাদের বিবশ করে দেয়, অন্যদিকে বিবেকের ঘরে মৌমাছি পাঠায়।

একজন ছোটগল্পকারের বড় যে গুণটি থাকা উচিত, তা হচ্ছে এক অসম্ভব পরিমিতিবোধ। কতটা বলতে হবে, কতটা উহ্য রাখতে হবে, কতটা সামনে আনতে হবে অথবা কতটা পিছনে, এই জ্ঞানটি তাঁর অবচেতনই উৎপন্ন হতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে, একটি

অপ্রয়োজনীয় চরিত্র একটি ছোটগল্পের অকালপ্রয়াণ ঘটাতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ রসায়নের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছোটগল্পের এসব রসায়ন জানতেন একটা সহজাত প্রজ্ঞা থেকে। তাঁর ছোটগল্পগুলো অসম্ভব সুনির্মিত—যেখানে গাঁথুনি সেখানে গাঁথুনি, যেখানে দেওয়াল সেখানে দেওয়াল, আর যেখানে চাল সেখানে চাল। গল্প লিখছেন না যেন গল্পের বাসা বানাচ্ছেন। তাঁর গল্পগুলোতে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং জীবন্ত তাদের আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-হতাশা-প্রত্যাশা নিয়ে। হুমায়ূন তাঁর অভিজ্ঞতার অঞ্চলেই গল্পগুলো সাজান—সেসব গ্রামেই অথবা শহরেই স্থাপিত হোক অথবা পানিতে। চরিত্রদের হয়ে ওঠা সেজন্য তাঁর এবং একটু বিস্তারে আমাদের— অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই। হুমায়ূনের পর্যবেক্ষণের এক দারুণ ক্ষমতা ছিল। একটি মেঘলা দিন, একটি চাঁদময় রাত অথবা খোলামাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস— এসবের বর্ণনায় তাঁর যে শক্তি, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সেরকম প্রতিদিনের ভাষায় (যার ভিতর ছিল আঞ্চলিক ভাষাও), ছোট ছোট টানে, তিনি মানুষে মানুষে সংসারের অন্য মানুষদের এসব সম্পর্ক উন্মোচন করাটা কঠিন হলেও হুমায়ূন অবলীলায় তা করতেন। চরিত্রদের তিনি গোড়া থেকেই খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে তৈরি করতেন – হিমুর মতো চরিত্রেরও একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে একজন হিমু বাস করে, হয়তো একজন মিসির আলীও। ছোটগল্পে হিমু অথবা মিছির আলীর অল্পস্বল্প উপস্থিতি বেশ কয়েকটি চরিত্রে এবং অনেক চরিত্রের খামখেয়ালিপনা অথবা আপাত যুক্তিমনস্কতা হিমু অথবা মিছির আলীকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার মানুষের চরিত্রের জটিলতা, আপাত বিরোধ এবং নানা মাত্রায় তাদের প্রকাশ সেই 'নন্দিত নরক' থেকেই আমরা দেখে আসছি। তবে উপন্যাসে যতটা সময় নিয়ে, কিছুটা রয়ে সয়ে তিনি তাঁর চরিত্রকে প্রকাশ করতে পারতেন, ছোটগল্পে সেরকম বিলাস তাঁর সম্ভব ছিল না। কিন্তু কয়েকটি বর্ণনা অথবা বিবরণে তিনি যেভাবে এক একটি স্বয়ম্ভূ চরিত্র তৈরি করতেন, যাদের ভোলা পাঠকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে বোঝা যায় ছোটগল্পে তিনি কতটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন এবং এ সাহিত্যশ্রেণিতে তাঁর কতটা অধিকার ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে হুমায়ূন আহমেদের বাবা শহিদ হয়েছিলেন। জীবনের শুরুতেই তিনি বাবাকে হারিয়েছিলেন। হয়তো সেজন্য মুক্তিযুদ্ধ তাঁর অনেক গল্পে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে এবং হয়তো সেজন্য বাবা ও ছেলের মধ্যে এক অদ্ভুত, মায়াময় সম্পর্ক তিনি গল্পে তৈরি করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি দেশে ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে ছিলেন না, তাঁর বাবার অনুপস্থিতি ছিল তাঁর জীবনজুড়ে। এজন্য উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি—এই দুই প্রেক্ষাপটেই মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে তিনি সাজান, বাবা-ছেলের সম্পর্ককে সাজান। মুক্তিযুদ্ধ কিছু গল্পের পুরো জমিনজুড়ে দীপ্যমান, কিন্তু গল্পে আছে উল্লেখ হিসেবে, গল্পের পটভূমিতে অথবা এর গভীরে বয়ে চলা একটি অন্তর্লীন স্রোতের মতো এবং যখনই মুক্তিযুদ্ধ প্রধান ঘটনা হিসেবে দেখা দেয় তাঁর কোনো গল্পে, হুমায়ূন চলে যান সাধারণ মানুষের জীবনে, কারণ সেখানেই নিহিত আছে মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি। তাঁর গল্পে সকলের চেনা যোদ্ধা বা নায়কেরা নেই, আছেন সাধারণ মানুষজন, যাদের জীবনের ওপর দিয়ে একটা ঝড়ের মতো বয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ অথবা যাদের জীবনকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে এ যুদ্ধ। ফলে হুমায়ূনের বর্ণনায় মুক্তিযুদ্ধ এক অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়।

ছোটগল্পের দুটি ধারা আমাদের সাহিত্যে বিদ্যমান। এর একটি হলো 'লেখার' ঐতিহ্যে সমর্পিত, অন্যটি 'বলার' ঐতিহ্যে। আমাদের দেশে গল্প লেখার ঐতিহ্যটি সাম্প্রতিক, কিন্তু বলার ঐতিহ্যটি দীর্ঘকালীন। এখনও এদেশের অর্ধেকের মতো মানুষ নিরক্ষর, ফলে লেখার ঐতিহ্যটি তাদের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। কিন্তু বলার ঐতিহ্যে তারা স্বতন্ত্র অংশ নিতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ গল্প বলার ঐতিহ্যে নিজেকে স্থাপন করেছেন; গল্প কথকদের মেজাজ, ভঙ্গি এবং শৈলী, শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অনিবার্যতা এবং শ্রোতাকে গল্পের প্রয়োজনীয় একটি অংশ ভাবার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং হালকা চাল, হাস্যরস, শব্দ নিয়ে খেলা করা ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন। এজন্য পাঠক খুব সহজেই তাঁর গল্পের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়তে হয় এবং সে তাঁকে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে পায়। গল্পকথকের শক্তিগুলো হুমায়ূন নিজের

ভিতরে সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। প্রতিটি গল্পে তাই এত চুম্বকি আকর্ষণের এতটা টানের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে, তাঁর উপন্যাসের ভিড়ে যেন ছোটগল্পগুলো হারিয়ে না যায়। এসব গল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদ—এগুলোর তুল্য তেমন বেশি গল্প লেখা হয়নি আমাদের সময়ে। তাঁর ছোটগল্পের ওপর গবেষকদেরও অনুসন্ধানী দৃষ্টি পড়া উচিত, যাতে তার উৎকর্ষের রসায়নটি চিহ্নিত করা যায়, তাঁর গল্পপ্রতিভাকে উদ্‌যাপন করা যায়।

প্রসঙ্গ শেক্সপীয়র

১.

শেক্সপীয়রকে নিয়ে প্রতিবছরই দু'তিনটি ভালো বই লেখা হয়। অনেক বইয়ের ভিড়ে যেগুলোকে আলাদা করা যায়। এমনিতে সারা বিশ্বে একাডেমিক শেক্সপীয়র চর্চা থেকে প্রচুর মূল্যবান প্রবন্ধ এবং অভিসন্দর্ভ তৈরি হয়, যদিও সাধারণ পাঠকের জন্য সেগুলো সহজলভ্য নয়। বইয়ের দোকান থেকে কেনা যায় অথবা লাইব্রেরি থেকে ধার নেওয়া যায়, তেমন বইয়ের সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু ওই ভালো বই বলতে শেষপর্যন্ত হাতে গোনা দুটি কি তিনটি। গত বছর বেরিয়েছিল হ্যারল্ড ব্লুম-এর 'দি ইনভেনশন অফ দি হিউম্যান (রিভারহেড বুকস, নিউইয়র্ক)। এ বছর একটি চটি বই, হিউ কুয়ার্শির 'সেকেন্ড থটস অ্যাবাউট ওথেলো (ইন্টারন্যাশনাল শেক্সপীয়র অ্যাসোসিয়েশন, স্ট্রাটফোর্ড আপন-অ্যাভন, ইংল্যান্ড)। একেবারে ভিন্ন দুই মেরুর দুই লেখকের দুই বই, প্রথাগত অর্থে সাহিত্য সমালোচনা নয়, বলা যায় ব্যক্তিগত শেক্সপীয়র চিন্তার প্রকাশ এ দুটি বই। হয়তো সেজন্য পড়তে ভালো লেগেছে। সাহিত্য সমালোচনা, বিশেষ করে সাহিত্যতত্ত্ব-আশ্রয়ী সমালোচনা, আজকাল যেন কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলছে। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাহিত্যটা যেন গৌণ হয়ে পড়ছে। কথার ধার, খানিকটা ওপর চালাকি এবং বিস্তর দর্শন ও বিশ্লেষণের আয়োজনে অনেক সময় বোঝা যায় না সমালোচকের উদ্দেশ্যটা কী। 'দি টেম্পেস্ট' নাটকে যৌনতার উপস্থাপনের ওপর একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম

'শেক্সপীয়র'স ট্রিটমেন্ট অফ সেক্সুয়ালিটি' নামের একটি বইতে, যাতে নাটকটি থেকে একটা পঙ্‌ক্তিও উদ্ধৃত করেননি লেখক। শুধু বিশাল বিশাল তত্ত্বের ঘনঘটা। বেচারা প্রসপেরো অথবা ক্যালিবান– কেউ নিজস্ব পরিচিতিতে দাঁড়াতেই পারেনি। বরং ফ্রয়েড সাহেব ছিলেন আধখানা প্রবন্ধ জুড়ে।

যাহোক, ব্লুম ও কোয়ার্শি সে তুলনায় অনেকটাই অ-অ্যাকাডেমিক, যদিও ব্লুম বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক, অসম্ভব মননশীল সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি বিখ্যাত। ইয়েট্‌স, শেলী, ব্লেইক এবং শেক্সপীয়রকে নিয়ে তিনি যেসব বই লিখেছেন সেগুলো ইতোমধ্যে ক্ল্যাসিক মর্যাদা অর্জন করেছে। এছাড়াও ব্লুমের আরও বই আছে এবং তাঁর দৃষ্টির গভীরতা, তাঁর যুক্তির অখণ্ডতা, তাঁর ভাষার স্বচ্ছতা এবং অনুভবের তীব্রতা পাঠক মাত্রকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু ইদানিং ব্লুমের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন আসছে বলে মনে হচ্ছে।

এখন তিনি অ্যাকাডেমিক গবেষণার পদ্ধতিকে একেবারেই আমল দিতে চান না। একটা গবেষণামূলক কাজে যেসব প্রয়োজনীয় উপাদান অনুষঙ্গ থাকে টিকা, পাদটিকা, গ্রন্থপঞ্জি, উদ্ধৃতির সঠিকতা ইত্যাদিকে তিনি মোটেও গুরুত্ব দেন না। সেটাও তেমন সমস্যা হয় না ব্লুমের লেখার ক্ষেত্রে— তাঁর চিন্তাভাবনা এতই মৌলিক যে, পাঠকের বিবেচনায় সেটিই বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সমস্যা হয় যখন দেখা যায় তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা এমন সব রক্ষণশীলতাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে যেগুলোর পিছনে যুক্তির চাইতে ব্যক্তিগত বিশ্বাসটাই বড় অথবা নিজের যুক্তি ও বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসতে সেগুলো মোটেও উৎসাহী নয়। কয়েক বছর আগে 'দি ওয়েস্টার্ন ক্যান' নামে একটি বই লিখে তিনি অনেকের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। বইটিতে ব্লুমের যুক্তি ছিল এ যে মৃত, শ্বেতাঙ্গ, ইউরোপীয় পুরুষ লেখকদের বাইরে উপন্যাসের গ্রেট ট্রাডিশনটির কোনো অস্তিত্ব নেই। নারী অথবা এথনিক লেখকদের ভূমিকাকে তিনি মোটেও স্বীকার করতে রাজি নন। এত যে ভারতীয় লেখকরা ইংরেজি উপন্যাস লিখছেন, সালমান রুশদীর আগেও

আরকে নারায়ণ, মূল্‌ক্ রাজ আনন্দ অথবা অনীতা দেশাইয়ের মতো লেখকরা নিজেদের জন্য একটা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন ইংরেজি ভাষার উপন্যাস ঐতিহ্য, ব্লুমের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তাছাড়া সারা বিশ্বে যে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদে চর্চা হচ্ছে সেটি ব্লুমের বিবেচনায় একেবারে অপ্রয়োজনীয়। এসব বিপরীত চিন্তা, যুক্তি এবং ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়েই ব্লুম লিখেছেন তাঁর 'দি ওয়েস্টার্ন ক্যানন'। কিন্তু বইটি পড়তে বসলে ফেলে রাখা যায় না। নিজের টেনে দেওয়া চৌহদ্দিতে ব্লুম অপ্রতিদ্বন্দ্বি, অদ্বিতীয়। একই ব্যাপার ঘটেছে 'দি ইনভেনশন অফ দি হিউম্যান'-এ।

এ বইটি নিয়েও বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। তার কারণ ব্লুমের কয়েকটি সিদ্ধান্ত, এবং তার সমালোচনা পদ্ধতি অথবা পদ্ধতির অভাব, ব্লুমের মৃত শেক্সপীয়র মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানবের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির অন্তর্গত সত্তা এবং মানব হবার শর্তগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এসবের উদ্গাতাও তিনি। শেক্সপীয়রের নাটক সমগ্র আমাদের জন্য একটি ধর্মগ্রন্থের মতো, যদিও এখানে ধর্মগ্রন্থটি সেকুল্যার, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের নয়। এ মহাগ্রন্থ থেকে মানুষ জানতে পারে তার ভাষা, তার মনস্তত্ত্বেরও জটিল সূত্রগুলো, ইতিহাস এবং তার পুরাণ। ব্লুমের এ মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে শেক্সপীয়রের নাটককেন্দ্রিক হলেও অচিরেই তিনি নাটকের বাইরে গিয়ে মানুষের বাস্তবতায় পা রাখেন এবং বলেন, শেক্সপীয়রের নাটকগুলো হচ্ছে আমাদের সকলের জীবনের চাকা, আমাদের জীবনকে তারা সচল রাখে এবং আমাদের শেখায় আমরা সময়ের হাতে অথবা প্রেম অথবা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক কিনা অথবা আমাদের পিতামাতা অথবা নিজেদের হাতে হাস্যকর চরিত্র কিনা তা জানতে। অর্থাৎ শেক্সপীয়র যে আমাদের জীবনের গুরুতরভাবে প্রাসঙ্গিক, তাকে ছাড়া যে আমাদের চলে না—এ কথাটি তিনি জোর দিয়ে বলেন। ব্লুমের বিশ্বাস মতে আধুনিক মানুষ শেক্সপীয়রের সৃষ্টি, যেহেতু তিনি আবিষ্কার করেছেন মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ।

'দি ইনভেনশন অফ দি হিউম্যান'-এ ব্লুম যে শেক্সপীয়রের সকল নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা নয়। শেক্সপীয়রের গোড়ার

দিকের নাটকগুলোকে-ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি-তিনি বাতিল করে দেন, কারণ সেগুলো 'অপরিণত' যদিও পরবর্তীতে কী মহৎ শিল্পকর্ম রচনা করবেন শেক্সপীয়র তার ইঙ্গিত এসব নাটকে ছিল বলে এদের প্রশংসাও করেছেন ব্লুম। মোটামুটি 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপাট্রা' থেকে নিয়ে 'কিং জন' পর্যন্ত ব্লুমের বিচরণ। কিন্তু তাঁর আলোচনা নাটকের সবকিছুর চাইতে চরিত্রটাই বড়। কাহিনী কোনো ব্যাপার নয়, নাটকের কাঠামো অথবা ঘটনাপ্রবাহ মূল্যবান নয়, চরিত্রই আসল। এ চরিত্র বর্ণনায় ব্লুম প্রায়শই আতিশয্যের আশ্রয় নেয়। যেমন, ইয়াগো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ইয়াগোর আগে, সাহিত্যে অথবা জীবনে, অপ-তথ্য প্রদানের কাজটি অথবা চিত্তবিক্ষপ্তির এবং উন্মত্ততার বিষয়গুলো এরকম শিল্পে পরিণত করতে পেরেছিল কজন?" কজন করেছিল সেকথা ব্লুম কী করে জানবেন, আমরাই বা কী করে জানব, যদি আমরা সর্বজ্ঞ না হই। এরকম মানুষ যদি থেকে থাকে পঞ্চদশ শতকে, তাহলে তাদের খবর আমাদের কাছে কিভাবে পৌছাবে? যদি শুধু সাহিত্যের কথা বলতেন ব্লুম, তাহলে সমস্যা ছিল না– ইয়াগোর মতো চরিত্রের সাক্ষাৎ বাস্তবিকই ঘটেনি আমাদের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু জীবনে? আমার সামান্য অভিজ্ঞতা তো বরং বলে, ইয়াগোকে লজ্জা দিতে পারে এরকম চরিত্র সব যুগে সব দেশে আছে। হিটলারের জার্মানিতে ছিল, এখন বলকানে আছে, ইয়াগোরা লন্ডনে টোকিও কলকাতাতে আছে, আমাদের ঢাকাতেও আছে।

ব্লুমের বইটি যদি কেউ সাহিত্য সমালোচনা অথবা শেক্সপীয়র চর্চার একটি পণ্ডিতি উদাহরণ হিসেবে পড়েন তাহলে সেই আনন্দটুকু পাওয়া যাবে না, যা পাওয়া যাবে একে সৃষ্টিশীল একটি বই হিসেবে পড়লে, আমার কাছে 'দি ইনভেনশন অফ দি হিউম্যান' একটি ফিকশনের আমেজ নিয়ে ধরা দিয়েছে। শেক্সপীয়রের স্পর্শে যেন ব্লুমের ভিতরে একটি সৃষ্টিশীলতার দরজা খুলে গেছে। চরিত্রগুলোকে তিনি এমন আবেগ নিয়ে দেখেছেন, যেন এগুলো তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। এবং আসলে অনেকটা তাই। ব্লুমের বর্ণিত হ্যামলেট, কিং লিয়র, ফলস্টাফ অথবা রোসালিন্ড পুরোপুরি শেক্সপীয়র নয়। ব্লুম তাদের ভিতর এমন অনেক ব্যাপ্তি অথবা তীব্রতা অথবা গভীরতা আবিষ্কার করেন, যা হয়তো তাদের সেই মাত্রায় নেই। ব্লুম প্রচণ্ডভাবে শেক্সপীয়র অনুরাগী,

তাঁর লেখাতে ভক্তি এসেছে প্রবলভাবে। পাঠকদের তিনি চান তাঁর মতো ভক্ত সেজে যেতে, তাঁর নিজের বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করতে। কিন্তু সচেতন পাঠক কীভাবে সেটি করেন।

ফিকশন না হয়ে যদি সাহিত্য সমালোচনা হয়, তাহলে ব্লুমের এ বইটির অনেক পর্যক্ষেণ মন্তব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের মন্তব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ থেকে যায়। যেমন ম্যাকবেথ চরিত্রটি নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমি সুর মেলাতে পারি না। আমার এখনও ধারণা, ম্যাকবেথের চরিত্রটি অনেক দুর্বল—বস্তুত গল্পটিও দুর্বল। এ চরিত্রকে হ্যামলেট বা কিং লিয়রের সঙ্গে একাসন দিতে আমি রাজি নই। ম্যাকবেথ ও বিশেষ করে লেডি ম্যাকবেথ নাটকের চরিত্র হিসেবে বেশ যুৎসই। একটা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক ঝড় লেডি ম্যাকবেথের ওপর দিয়ে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাপবোধের তাড়নায় সে ঘুমের মধ্যে হাঁটে, হাত ধুয়েই চলে রক্ত সাফ করার জন্য। কিন্তু ওই চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুতেই লিয়রের অথবা হ্যামলেটের স্তরের নয়। অথচ ব্লুম এ আগে থেকেই সাবধান করে দেন, বিশ্বাসে মিলায় শেক্সপীয়র, তর্কে বহুদূর। এ প্রশ্নহীন বিশ্বাস একজন আধুনিক পাঠকের থাকবে, এটি কি করে ধারণা করেন ব্লুম? আর মাত্র কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এরকম একটি ধারণায় পৌঁছে যাওয়া যে, শেক্সপীয়র মানবের আবিষ্কর্তা—এ ব্যাপারটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আর শেক্সপীয়রের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্লুম আরও যে কাজ করেছেন, তা রীতিমত পীড়াদায়ক। শেক্সপীয়রের সকল লেখককে তিনি একে একে উড়িয়ে দিয়েছেন শুধু ক্রিস্টেফোর মার্লো ছাড়া। টমাস কিড, বেন জনসন, জন ওয়েবস্টার, টমাস মিডলটন, জর্জ চ্যাপম্যান— কেউ বাদ যাননি। যেন এঁদের বাতিল প্রমাণ করতে পারলে শেক্সপীয়র আরও উচ্চতা পেয়ে যাবেন। ধারণা হিসেবে এটি যে খুব সেকেলে, সেটি ব্লুম হয়তো খেয়াল করেননি।

কিন্তু ব্লুমের লেখার একটা বৈশিষ্ট্য হলো এ যে, তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে করতে, মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়েই যেতে হয়,

থেমে যাওয়া যায় না। তাঁর লেখায় এখনও সেই জাদুটা আছে যা খুব মৌলিক ধরনের লেখকদের থাকে।

২.

ব্লুমের ৭৪৫ পৃষ্ঠার বইয়ের পর কুয়ার্শির ২৫ পৃষ্ঠার মনোগ্রাফটি হাতে তুলে নিলে তাদের ভিতর মৌলিক কিছু পার্থক্যের বিষয়টা যেন এমনিতেই বুঝে নেওয়া যায়। হিউ কুয়ার্শির চিন্তায় race এবং ethnicity-এর বিষয়গুলো এতটা জায়গা জুড়ে থাকে যতটা জায়গা জুড়ে ব্লুমের চিন্তায় সেগুলো অনুপস্থিত। কুয়ার্শির অনেক মন্তব্যে ব্লুম নিশ্চয় অবাক হবেন এবং নিজের চিন্তার সঙ্গে মেলাতে গেলে হোঁচট খাবেন। তবুও কুয়ার্শির বক্তব্যে অযৌক্তিক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা করা যদিও নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি ওথেলো নিয়ে লেখা এ মনোগ্রাফে।

সেগুলো নিয়ে কিছু বলার আগে শুরুতেই কুয়ার্শির পরিচয়টা দেওয়া যাক। হিউ কুয়ার্শির বাবা ছিলেন ঘানার একজন কূটনীতিক। জন্মসূত্রে তিনি আফ্রিকান, এবং কৃষ্ণবর্ণ। তবে পড়াশুনা করেছেন নামি দামি প্রতিষ্ঠানে, অক্সফোর্ড থেকে বিএ পাস করেছেন। রয়াল শেক্সপীয়র কোম্পানিতে তিনিই প্রথম কৃষ্ণকায় অভিনেতা, যিনি নানা শ্বেত-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৮০-এর দশকে কুয়ার্শি হটস্পার, এন্টনি, ব্যাংকুও এবং টাইবাল্টের মতো চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন, যদিও ঐতিহ্যগতভাবে এগুলোতে সাদা অভিনেতারাই অভিনয় করেছেন। কুয়ার্শির অভিনয় খুব প্রাঞ্জল এবং আবেগ থেকে বুদ্ধিটা তিনি বেশি ব্যবহার করেন তাঁর অভিনয়ে। তবে অনেক চরিত্রে অভিনয় করলেও কুয়াশি ওথেলোর ভূমিকায় কখনো মঞ্চে নামেননি– ওথেলো কালো মানুষ, কুয়ার্শিও কালো, কাজেই এ ভূমিকায় তাঁরই নামার কথা প্রথমে। কিন্তু কুয়ার্শি তা করেননি। 'ওথেলো সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি তার কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমেই তাঁর বক্তব্য হচ্ছে : শেক্সপীয়র সম্পর্কে একটা অনুভক্তি তার শক্তি এবং দুর্বলতাকে বুঝতে অক্ষম করে রেখেছে এক বিশাল শ্রেণির পাঠক-সমালোচককে। শেক্সপীয়রের অনেক চিত্রকল্প বর্ণনা ইত্যাদিতে শুধু দুর্বলতা নয়,

প্রসাদও রয়েছে, যার কিছু তুলনা কুয়ার্শি নিজে দিয়েছেন। এ জন্য ওথেলো নিয়ে এমনকি বর্তমান সময়ের পাঠকরাও নির্মোহ বিচার করতে পারেন না।

কুয়ার্শির মতে, শেক্সপীয়র যখন সিনথিওর গল্পটি গ্রহণ করলেন এবং একে নিজের মতো করে সাজালেন– যে গল্পের নায়ক ঈর্ষান্ধ, স্ত্রী স্তাবক মূঢ়, তখনি তিনি একটি বর্ণবাদী প্রথাকে সমর্থন দিলেন। অভিনয় প্রথা এবং প্রথাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ বর্ণবাদী চিন্তাটিকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছে। কুয়ার্শি স্বীকার করেন যে, ওথেলোর ঈর্ষা অথবা তার উন্মত্ত আচরণকে তার বর্ণের ইতিহাস থেকে হয়তো কোনোকালই আলাদা করা যাবে না –ওথেলো কালো ছিল বলেই এরকম করেছে, এ ধারণাটা পাল্টানো কঠিন হবে: তবুও বর্ণবাদের বাইরে গিয়ে ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়তো সম্ভব, যার জন্য নাটকটির সযত্ন সম্পাদনা এবং এর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গঠন প্রয়োজন হবে।

কুয়ার্শি একজন অভিনেতা হিসেবে ওথেলো নাটকের অভিনয় এবং এর সমালোচনার ইতিহাসটি তাঁর আলোচনার প্রেক্ষাপটে রাখেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান যে, আদিতে যেমন তাঁর নিজের সময়েতেও তেমনি, কালো মানুষদের সম্পর্কে সাদা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ঋজুতা আছে, একটি প্রথাগত চিন্তা আছে, যা থেকে বেরিয়ে আসাটা খুবই কঠিন। কালোরা উন্মত্ত হয়, তাদের আবেগ অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাদের বুদ্ধিগত পরিপক্কতা সাদাদের তুলনায় কম–এসব স্টিরিও টাইপ চিন্তার পাশাপাশি কালোদের সামাজিক আচরণ, হাঁটাচলা, এসব নিয়েও সাদা মানুষের কিছু স্থির ধারণা বর্তমান, যা ওথেলোর চরিত্রকে একটি কুটুরিতে বন্দী করে রাখে। সাদা অভিনেতারা এজন্য ওথেলোর চরিত্রে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অভিনয় করেন, যা ন্যাক্কারজনক। এমনকি লরেন্স ওলিভিয়ের ও তার অভিনয়টি 'বিশ্বাসযোগ্য' করে তোলার জন্য ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কালোদের চালচলন, এমনকি কথা বলার ভঙ্গিও রপ্ত করেছেন। কিন্তু এন্টনিও এবং ফস্টাদের দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের অভিনয়ের জন্য তিনি বাড়তি কোনো প্রস্তুতি নেননি। যেন এসব চরিত্র স্বাভাবিক, ওথেলো অস্বাভাবিক।

কুয়ার্শি অনেক অভিনেতা এবং নাট্যসমালোচকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কালোদের সম্পর্কে একটি গভীর prejudice তাদের মধ্যে কাজ করেছে এবং এখনও করছে, যা অবাক করার মতো। তবে কুয়ার্শি কালোদের নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন negrobilia, শেক্সপীয়রের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন। 'ওথেলো'র অনেক আগে থেকেই এ ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে কালো রং পাপ ও লজ্জার প্রতীক। এমনকি বাইবেলেও তা আছে (জেনেসিস ৯:২১ থেকে কুয়ার্শি উদ্ধৃতি দেন, যেখানে হ্যাম তার পিতা নোয়া এবং ঈশ্বরকে অস্বীকার করছে এবং বলা হচ্ছে তার চেহারা কালো, তার কাজ রক্তক্ষয়ী। কুয়ার্শির আক্ষেপ, শেক্সপীয়র এত আধুনিক হয়েও এত সহজে প্রথাগত চিন্তার ফাঁদে পড়ে গেলেন। তাঁর কাছেও কালো মানে অশুভ, পাপ এবং স্খলন। 'ওথেলো'-এর দর্শক এটি আশাও করে। তবে শেক্সপীয়র ওথেলোকে ঈর্ষান্বিত করে, তার মনস্তত্ত্বকে প্রবল করে তার মানবিক দিকটিও ভালোভাবে ফুটিয়ে দিয়েছেন। তারপরও একজন অভিনেতা হিসেবে প্রথমদিকের উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, নৈতিক, প্রেমিক ওথেলোর সঙ্গে শেষের উন্মাদ এবং ঈর্ষান্ধ ওথেলোর মধ্যে ফাঁকটা কুয়ার্শি মানতে পারেন না, সেটি শুধু চরিত্রগত হলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তার পিছনে যে বর্ণবাদী প্রথা ও ইতিহাস রয়েছে, তাকে মেনে নিতেই কষ্ট হয় কুয়ার্শির এবং সচেতন যেকোনো পাঠকের।

৩.

এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্লুম যদি লিখতেন, তাহলে এ সম্ভব আকর্ষণীয় হতে পারত তার লেখাটি, কিন্তু ব্লুম কী লিখবেন সেরকম লেখা। 'দি ওয়েস্টার্ন ক্যানন'- এর লেখক হিসেবে তাঁর পক্ষে সেটি যে সম্ভব, মনে হয় না।

সংবাদ সাময়িকী, ৩ জুন ১৯৯৯

রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা

১৯২১ সালে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ শিল্প বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যা এ বছরই *বিশ্বভারতী*- তে 'The Meaning of Art' নামে প্রকাশিত হয়। কার্জন হলে দেওয়া ওই ভাষণটি তিনি দেন ইংরেজিতে এবং রবীন্দ্রনাথের স্বল্প প্রচারিত অন্যান্য ভাষণের মতো এটিও পাঠক ও শিল্পবোদ্ধাদের অগোচরেই রয়ে যায় দীর্ঘদিন। ১৯৬৯ সালে ভারতের ললিতকলা একাডেমি এ ভাষণটি একটি চটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করলে এটি সহজলভ্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বা নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই এ ভাষণটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেননি। অথচ তিনটি কারণে এ বক্তৃতাটি রবীন্দ্রনাথের ছবির অনুরাগীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য। প্রথমত, এটি রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পভাবনার একটি ধ্রুপদী প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, 'ভারতীয় শিল্প' বলতে ওই সময় যে শিল্পচর্চাকে বোঝানো হতো এবং উৎসাহিত করা হতো, রবীন্দ্রনাথ এ ভাষণে তাঁর বিপরীতে একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন, যা তাঁর কালের বিচারে রীতিমতো বৈপ্লবিক। তবে তৃতীয় কারণটি আরও বেশি বৈপ্লবিক; ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেন, "আমাদের এখন বুক বেঁধে দুঃসাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে, সকল ঝুঁকির মুখেও উন্মুক্ত পথে নামতে হবে, মানুষের চিত্তের বিশাল ভুবনে অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ক্ষুদ্র সমালোচকদের অশুচি নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার করতে হবে

এবং তাঁরা যখন আমাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের শিল্পীদের বাচ্চা ছেলেদের মতো ভালোভাবে চলতে এবং স্কুলের চৌকাঠ না মাড়াতে পরামর্শ দেন, তখন তাদের নিয়ে অট্টহাসি করতে হবে।" এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ডাক, এ শিল্প-প্রচলণ ভাঙার নতুন নতুন শিল্পধারা সৃষ্টির আহ্বান এবং প্রণোদনা— এসবই এক নতুন নন্দনচিন্তার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধে তিনি তাঁর সময় থেকে অনেক এগিয়ে গিয়ে শিল্পের সম্ভাবনার দিগন্তকে বিস্তৃত করেছিলেন। এবং বড় কথা, শুধু তত্ত্বে নয়, নিজের কাজে এ প্রাগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ধ্রুপদী একটি ভূমি থেকে চলতে শুরু করে একেবারে আধুনিক নিরীক্ষাধর্মিতাকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিজের কাজে তার চর্চা করা— এ আপাত বিপরীত কিন্তু ঐতিহ্য পরম্পরায়-অনিবার্য বিষয়টি 'শিল্পের ভাবার্থ'-কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন খাটো করে দেখেননি— শিল্পের পিছনে কার্যকর শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহ্যিক নন্দনচিন্তাকে তিনি আধুনিকতার জানালা দিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বস্তুত বাস্তবতা এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের পাশাপাশি চিরায়ত কিছু চিন্তাভাবনা ও বোধ-অনুভূতিকে তিনি যথাযথ স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐতিহ্য জড় কোনো উত্তরাধিকার ছিল না, তা ছিল সচল এবং গতিময় এক ইতিহাস পরম্পরার নাম। মানুষের সঙ্গে তার ইতিহাসের একটি অনিবার্যতার সুতায় বাঁধা এবং সেই ইতিহাস যদি জীবন্ত হয়, তাহলে তার অতীত এবং বর্তমান হয় পরস্পর ক্রিয়াশীল। তবে এ পরম্পরায় তখনই ছেদ পড়ে যখন কোনো আরোপিত ভাবনাচিন্তার আলোকে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে দেখা শুরু হয়। যদি 'ভারতীয় ঐতিহ্য' বলতে একটি বিশেষ সময়ের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় অথবা বহিঃস্থ্ কোনো চিন্তার অনুসরণে তাকে সাজানো হয়, তাহলে ওই ঐতিহ্যটি একটি জড় ইতিহাস পিণ্ড হয়ে দেখা যাবে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সময়ে শিল্পকলায় 'ভারতীয় শিল্প' বলতে যে বিষয়বস্তু এবং স্টাইলের প্রাধান্য দেখা যেত, তাতে অনেক কিছুই আরোপিত এবং সময় নির্দিষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের এ বিশেষ শ্রেণিকরণ মেনে নিতে পারেননি। 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধে তিনি তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণটি শুরু করেছিলেন অথর্ববেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, শেষ করেছেন তাঁর সময়ের শিল্পীদের প্রচলণ ভাঙার ডাক জানিয়ে। "প্রথাগত কোন টাইপকে সকল সময় সশঙ্কাভাবে মেনে নেওয়া অপরিপক্কতার একটি চিহ্ন" তিনি জানান। তাহলে তো প্রশ্ন উঠতে পারে, বেদ-এর ঐতিহ্যে যিনি এতটাই স্থিত যে একের পর এক বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে শিল্পকলা বিষয়ে একটি ভাষণ তাঁকে শুরু করতে হয়, তিনি কিভাবে প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার ডাক দেন? এ প্রশ্নটির উত্তর অবশ্য সহজেই দেওয়া যায়– বলা যায়, প্রথা ও ঐতিহ্যকে তিনি এক করে দেখেননি। প্রাণহীন ঐতিহ্যের প্রধান শক্তি, তার কালোত্তীর্ণ গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে শিল্পসৃষ্টির আদি অনুপ্রেরণাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কোনো আধ্যাত্মিক বা শাস্ত্রীয় পাঠকে প্রধান করতে চাননি। প্রথম উদ্ধৃতিতে আছে সত্য, ধর্ম ও কর্ম, শ্রম ও রীতির কথা, কিন্তু এগুলোর উৎস যে মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত আতিশয্যে, "উচ্ছিষ্টে' – তাই উদ্ধৃতির মর্মার্থ। রবীন্দনাথ এ চিন্তাটিই একটি গানে প্রকাশ করেছেন, 'আমার জীবনপাত্র উচ্চলিয়া মাধুরী করেছ দান।' মানুষের শান্ত জীবনে যখন অনন্তের উপহার জমে, তখন ওই 'উচ্ছিষ্টের' সৃষ্টি, এ আতিশয্যই শিল্প সৃষ্টির মূল। এ 'উচ্ছলিত মাধুরীতে মানুষের চির অনিষ্ট রূপকল্পটি লুকিয়ে থাকে– তাকে খুঁজে বের করে দৃশ্যমান করাই শিল্পের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে একটি উদ্ধৃতিতে আনন্দ ও তপস্যার উল্লেখ করেছেন, অথবা উল্লেখ করার জন্য উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মের সৃষ্টিশীল প্রকাশের জন্য আনন্দের স্বাধীনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তপস্যার শৃঙ্খলা, কিন্তু একটু পরেই এ তপস্যার ব্যাপারটিকে তিনি শিল্পীর ধ্যানের বিষয়ে পরিণত করেন। শিল্পকে তিনি অভিহিত করেন মায়া বলে, কিন্তু মায়ার একটি বিপজ্জনক দিকও আছে: "মায়া যা, তা-ই। মায়া কখনো নিজের অনির্দিষ্টতার কথা গোপন করে না, তার নিজের সংজ্ঞাকে পর্যন্ত সে বিদ্রূপ করে এবং এর সতত পরিবর্তনশীল উড়ালের মাধ্যমে এক বিশাল লুকোচুরি খেলা খেলে যায়।" যদি শিল্পী তাঁর নিজের অনুধাবনের বিষয়টিকে এ পরিবর্তনশীল আত্মচিত্রকল্পের

সঙ্গে সমান্তরাল রাখতে চান, তাহলে তাঁকে ধ্যান করতে হবে। তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে অনুধাবনের বিষয় ও মুহূর্তগুলোর ওপর, মায়াকে তাঁর শিল্পের পরিমণ্ডলে এনে স্থাপন করতে হবে অভিজ্ঞতার ভিতরে। তাহলেই অবস্তুকে পরিণত করা যাবে, জড় জীবনে ছন্দের সঞ্চার করা যাবে।

এ ভাষণ/প্রবন্ধে শিল্প-ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু চিন্তা তুলে এনেছেন–এর একটি হলো ছন্দ, অন্যটি বাস্তবতা। ছন্দ ও বাস্তবতার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সাযুজ্য না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এগুলো এভাবে পরস্পরাভুক্ত হয়েছে। "বিমূর্ত সত্য হয় বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু শিল্পের বিষয় হচ্ছে বাস্তব পৃথিবী", একথা বলার পর তিনি জানান, বাস্তব পৃথিবীর একটি উপাদানের সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য হচ্ছে ছন্দগত পার্থক্য। সোনা থেকে পারদের পার্থক্য হচ্ছে এ দুটোর আণবিক কাঠামোর অন্তর্গত ছন্দের তারতম্য। তাহলে ছন্দ জিনিসটা কি? রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মতে, ছন্দ হচ্ছে বস্তুর অন্তর্গত সৃষ্টিশীল বিন্যাসের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। একটি পাথরের ভিতরের জীবনটি ছন্দময়, যদিও তার বহিরঙ্গ জড়। শিল্পীর হাতে ছন্দ হচ্ছে তার সৃষ্টিশীল শক্তি। এ ছন্দ একটি গতির নাম, যা শিল্পীর অন্তর্গত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনায় ছন্দ একটি সৃষ্টিশীল প্রকাশ।

বাস্তবতার ব্যাখ্যাটি খুব যত্ন করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ কীটস-এর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কীটসের প্রবচনসুলভ 'সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য' ছিল তাঁর প্রিয় উদ্ধৃতি। 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধটি তৈরি করার সময় আরেকবার কীটসকে তাঁর মনে পড়েছে এবং এরকম একটি দায়িত্ববোধ তাঁর মধ্যে কাজ করেছে যে, একজন প্রিয় কবির প্রবচনধর্মী বক্তব্যকে তাঁর একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যদি সত্য ও সুন্দর সমার্থক হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন রাখেন, তাহলে জীবনের আপাত অসুন্দর বস্তুগুলো সত্য কী? এ সত্য হচ্ছে তাদের বাস্তবতা এবং বাস্তবতা যতই অপ্রিয় হোক, অপ্রিয়তার ধারণাটি যেহেতু সত্য,

তা মানুষের মনে নিশ্চয়তার সৌন্দর্য উৎপাদন করে। "জীবনের নৈরাশ্যপীড়িত বিয়োগান্ত ঘটনাগুলোকে, রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পারিভাষিক অর্থে সুন্দর বলা যাবে না। কিন্তু শিল্পের প্রেক্ষাপটে যখন এদের দেখা যায় তখন তাদের বাস্তবতা বলতে অমোঘতার জন্য তারা আমাদের আনন্দ দেয়।" রবীন্দ্রনাথের কাছে এ আনন্দই সুন্দর।

তবে বাস্তবতা বলতে রবীন্দ্রনাথ সেই যথার্থতাকে বুঝেননি যা বন্দি করে রাখে ক্যাসেরা। ক্যাসেরার বাস্তবটি নিষ্ক্রিয়, কারণ সেখানে ক্রিয়ার অংশটি কেউ তৈরি করে না– আগে থেকেই তা দেওয়া থাকে। আর শিল্পের বাস্তবতাটি সক্রিয় কারণ শিল্পী বাস্তবের ভিতর থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বস্তুর নিজস্ব ব্যাখ্যা দেন। ইউরোপীয় শিল্পীর বাস্তববোধ ও প্রাচ্যের একজন শিল্পীর বাস্তববোধের মধ্যে একটি পার্থক্যও এ প্রসঙ্গ তিনি টানেন। বিখ্যাত ভাস্কর রঁদার জন্য বাস্তবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো "অপূর্ণতার বাঁধন থেকে মুক্তির জন্য অসম্পূর্ণের নিরন্তর সংগ্রাম, অথচ প্রাচ্যের স্বভাবগত অন্তর্বীক্ষণধর্মী শিল্পীর কাছে বাস্তবতা ধরা দেয় এক পরিপূর্ণ আদর্শ প্রতিরূপে।"

বাস্তবতা ও তার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতঃপর 'ইন্ডিয়ান আর্ট' অথবা ভারতীয় শিল্প নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্প প্রবক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন কলকাতা আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ, সেই সময় (বস্তুত তারও আগে থেকেই) অধ্যক্ষ ইবি হ্যাভেলের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় তিনি ভারত শিল্পের একটি নিজস্ব পরিচিতি উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা প্রধানত ছিল পশ্চিমা শিল্পের বহিরঙ্গতার বিপরীতে ভারত শিল্পের ছন্দময় অন্তর্লীনতা এবং আবেগকে তুলে ধরা দেশজ পরিচিতিটিকে প্রধান করা ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাণ থেকে বিষয় সংগ্রহ করা এবং স্টাইলের দিক থেকে প্রকাশধর্মিতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের ভাবার্থকে ফুটিয়ে তোলা–এসবই ছিল ইন্ডিয়ান আর্টের বৈশিষ্ট্য। রাজারা রবি বর্মার ছবিতে ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাণ একটি

পাকাপোক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করে নিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল স্কুল'-এর কাজে (সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিত হালদার, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল বসু এবং আরও কয়েকজন শিল্পী ছিলেন এ স্কুলের চর্চাকারী।) এর ব্যবহার শুরু হলো তবে, 'বেঙ্গল স্কুল' প্রধানত স্টাইলের স্বাতন্ত্র্যের কারণে রবি বর্মার কাজ থেকে অনেক দূরে এবং অনেক বেশি উচ্চতায় চলে গেল। অবনীন্দ্রনাথ মোঘল ও পাহাড়ি অনুচিত্র ও প্রাচীন ভারতীয় দেওয়ালচিত্র, জাপানি ও চীনা জলরং পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটালেন তাঁর কাজে। বর্ণলেপনেও প্রাচ্যদেশীয় কায়দাকে প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশকে নানা "ভারতীয় দৃশ্যকল্প ও স্টাইলের মাধ্যমে সমর্থন দেওয়া হলো, অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গিমা ও ভাবের পরিমণ্ডলে শিল্পকে তা আটকে দিল।" 'ভারতীয় শিল্পের ষড়ঙ্গ" প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যেখানে নিজেই প্রাচীন শিল্পের জঙ্গমতাকে প্রশংসা করেছেন, সেখানে তাঁর 'ভারতীয় শিল্প' একটা সময় শিল্পের প্রকাশকে একটি চৌহদ্দির প্রত্যাশার মধ্যে স্থাপন করে কিছুটা আড়ষ্ট করে ফেলল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কার ভারতীয় শিল্প-বিতর্ক সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। সিস্টার নিবেদিতা, ইবি হ্যাভেল, একে কুমার স্বামী এবং কাকুজো ওয়াকুরা নানা দিক থেকে এ বিতর্কে প্রাণ যোগাচ্ছিলেন। হ্যাভেল ও কুমার স্বামী শিল্পের 'পশ্চিম পক্ষপাতিত্ব' ঘোঁচাতে ছিলেন বদ্ধপরিকর, ওয়াকুরা বিশ্বাস করতেন 'এশিয়া এক' এবং এশীয় ঐতিহ্যও এক' এবং নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন হিন্দুধর্ম ও পুরাণ থেকে নিয়ে জাতীয়তাবাদের একটা অংশগ্রহণ থাকা চাই শিল্পে। রবীন্দ্রনাথ এ বিতর্কের পিছনের আবেগটা খাটো করে দেখেননি। কিন্তু যে ভারতীয় শিল্পের চর্চা শুরু হলো, তার ভিতর একটি সঙ্কীর্ণতা তিনি আবিষ্কার করলেন। যা দেশ-কাল-পাত্রে শিল্পকে বন্দী করে রাখতে উৎসাহী। 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ভারতীয় শিল্প বলতে যদি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মেজাজের ওপর নির্ভরশীল কিছু সত্যের কথা বলতে হয়, তাহলে ঠিকই আছে; কিন্তু একই সঙ্গে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মানব সংস্কৃতিতে চূড়ান্ত জাতিভেদ বলে কিছু নেই।' কাজেই

শিল্পকে দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ লেবেল পরিয়ে দিলে এর বিশ্বজনীন মাত্রা ও আবেদনকেই খর্ব করা হয়। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকেই ক্রমাগত গ্রহণ করছে এবং এ চিরন্তন দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই প্রতিটি সংস্কৃতি উন্নত হচ্ছে। পশ্চিম থেকে কিছু নিলেই যে দেশীয় সংস্কৃতি বা শিল্প বিনষ্ট হবে, তা তো নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শুধু মধ্যমানের মেধা যাদের, তারাই গ্রহণ করাকে ভয় পায়।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর চিত্রকলায় এক আধুনিক, বিশ্বজনীন মনন ও মানসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, বাস্তব ও পরাবাস্তবের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, কিন্তু কখনো এ মূল্য বিচারে যাননি কোন্‌টা অন্যের। তাঁর চিত্রকলার গুণগত উৎকর্ষের বিচারটি ভিন্ন, কিন্তু এর প্রস্তাবনাটি বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রনাথ যখন নিসর্গ দৃশ্য আঁকেন, তখন তাতে দেশের ও দেশজ প্রকৃতির ছায়াটি সহজেই খুঁজে নেওয়া যায়; কিন্তু "দেশের নিসর্গই শুধু আঁকব, আঁকছি" – এরকম ঘোষণা দিয়ে তিনি আঁকেননি। কাজেই তাতে প্রকৃতির মেজাজ, তার ভিতরের স্পেস, তার ব্যাপ্তি, তার আবেগ-অনুভব, সবই প্রকৃত-আরোপিত নয়। প্রকৃত বলেই তার প্রয়োগযোগ্যতা সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথ যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর ছবিতে, তাতেও এক সর্বজনীন ও সৃষ্টিশীল প্রণোদনাই প্রথম। ফর্ম ভেঙে, রংকে নানাভাবে ব্যবহার করে, রেখার আঁকিবুকিতে এবং রঙের সঙ্গে রেখার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্রভাষা ও চিত্রকর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন। সত্যি যে, তাঁর ড্রইং ছিল দুর্বল, বর্ণবিন্যাসও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল (কোনো কোনো সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি আধুনিক, একই সঙ্গে ভারতীয় এবং সর্বজনীন— যেমনটি হওয়ার কথা শিল্পের)।

লক্ষণীয় যে, 'শিল্পের ভাবার্থ' ভাষণ/প্রবন্ধটি সময় শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বগত এবং জ্ঞানগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সময়চর্চা তখনও শুরু হয়নি। এর কয়েক বছর পর থেকে নিয়মিত ছবি আঁকা শুরু করেন তিনি। কিন্তু ১৯২০-এর দশকের শুরুতেই দেওয়া এ ভাষণটি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছবি কী বৈশিষ্ট্যকে

নিজের বলে গ্রহণ করবে। অনেক কিছুর সাথে যে কৌতুক ও ঠাট্টার কথাটি রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন, তার প্রকাশ সমসাময়িক ভারতীয় কোনো শিল্পীর কাজে (যেমন পরাবাস্তববাদের প্রথমদিকে চর্চাকারীদের কাজে) রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান চিন্তা এর সমন্বয়ধর্মিতা, যা নিছক 'ভারতীয়' এবং সেজন্য সীমাবদ্ধ কোনো শিল্পকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। 'শিল্পের ভাবার্থ' প্রবন্ধে/ভাষণে তিনি তাঁর নন্দনচিন্তার আধুনিকতা ও তাঁর ইতিহাস দর্শনের পরিব্যাপ্ত একটি প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার ছায়া পড়েছে তাঁর নিজের কাজে।

আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ

এমন একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার আলোচনায় যে, স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ রূপায়ণ অথবা প্রতিফলন হয়নি শিল্প-সাহিত্যে। পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবগুলো অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মহৎ সৃষ্টির পিছনে-ফরাসি বিপ্লব অথবা রুশ বিপ্লবের রয়েছে এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়নি কিন্তু একটি সীমিত ভূগোলে ভয়ানক তোলপাড় তুলেছে তেমন জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলিও জন্ম দিয়েছে ধ্রুপদ সাহিত্যের, প্রাণস্পর্শ শিল্পের। আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, লাতিন আমেরিকার বামপন্থি বিপ্লব অথবা ষাটের দশকে ইউরোপে দ্রুত ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক-আদর্শিক পটপরিবর্তনের উদাহরণ আমাদের জীবনকাল থেকে সংগৃহীত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে যদি সেই নিরিখে বিচার করি আমরা, তাহলে এর বিশালতাকে ওই ঘটনার বহিঃস্থ একজন প্রত্যক্ষদর্শীও স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী শিল্প-সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ কেন উপস্থিত নয়, যতটা থাকা উচিত ছিল, অন্তত অনেক পাঠক সমালোচক যা মনে করেন, সেই প্রশ্নটি অবধারিতভাবেই উচ্চারিত হয় এবং আমাদের একটি শূন্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

এ অভিযোগের দুটি দিক আছে। প্রথমত, অভিযোগকারীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হচ্ছে না, মুক্তিযুদ্ধের

প্রতিফলন ও রূপায়ণ হচ্ছে না আমাদের শিল্প-সাহিত্যে। এ বিচারটিতে যে বিষয়টি প্রাধান্য পায়, তা একটি পরিমাণগত ধারণা : 'যথেষ্ট' বলতে কতটা বা কী পরিমাণ, এটি নির্ধারণের দায়িত্ব এসে পড়ে অভিযোগকারীর ওপর। যারা এ মত পোষণ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধ মোটেও অবহেলিত হয়নি সাহিত্যে ও শিল্পে, তারা এ পরিমাণগত ধারণাটিকে গ্রহণ করতে রাজি হন না। তারা বরং বলেন যে, আমাদের নাটক যেমন মুক্তিযুদ্ধের ফসল, তার প্রত্যক্ষ অবদান এবং শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সুনির্দিষ্ট, ভাস্কর্যের কথা তারা উল্লেখ করেন, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত একটি শিল্প-মাধ্যম হিসেবে সংহতি অর্জন করেছে স্বাধীন বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে প্রচুর বইপত্র, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি লেখা হয়েছে, সেসবও, তাদের মতে, পরিমাণগত ধারণাটিকে দুর্বল প্রমাণিত করে। তবে অভিযোগের দ্বিতীয় যে দিকটি নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়, তা হচ্ছে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতির গুণগত বিচারটি। মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে দেখা হচ্ছে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে; মুক্তিযুদ্ধের কোন বিষয়টি কোন পদ্ধতিতে একজন কবি, ঔপন্যাসিক অথবা চিত্রকর তার কাজে প্রকাশ করেছেন– এ বিবেচনাটি যদি প্রধান হয়, তাহলে পরিমাণ-চিন্তাটি গৌণ হয়ে যায়। আমাদের দেশে এ দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়েছে কম এবং হলেও পদ্ধতিগত কোনো শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা হয়নি। এজন্য এখনও সাহিত্য ও শিল্পবিচার, বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট বৃত্তেই আবর্তিত হচ্ছে।

পদ্ধতিগত যে শৃঙ্খলার কথা বলা হলো, এটি তৈরি হয় তাত্ত্বিক একটি ভূমি থেকে। 'তাত্ত্বিক' কথাটি কিছুটা ভীতিপ্রদ এবং সন্দেহজনক আমাদের সময়ে : কিন্তু তত্ত্বকে বিনির্মাণ করলে কিছু শনাক্তযোগ্য চিন্তার সমাবেশ চোখে পড়ে, যেগুলো ব্যাখ্যা অথবা ভাবনার জন্য একটি সম্ভাবনাময় জগৎ সৃষ্টি করে। যেকোনো তত্ত্বেও কিছু অভিন্ন উপাদান থাকে, যারা একাধিক চিন্তাকে একটি সংহত রূপদান করে; কিন্তু তাই বলে ওই চিন্তাগুলো যে সহজে নিষ্পত্তিযোগ্য অথবা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, তা নয়। একটি চিন্তা

ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হতে হতে অতি সূক্ষ্ম, বিমূর্ত রূপ ধারণ করে; কিন্তু তত্ত্ব এ বিমূর্তায়নের অতীত একটি সংহতির সম্ভাবনাকে মূর্ত করে। মুক্তিযুদ্ধ শিল্প-সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়, হতে পারে, হওয়া উচিত–এবং না হলে, সকল ক্ষেত্রে কেন নয়, এর একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান আমরা করতে পারতাম। এখনও করতে পারি, কারণ যেকোনো ইতিহাসের মতো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটিও সময়ের সঙ্গে আরও সমৃদ্ধ হয়, এ ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আরও বেশি অনুসন্ধিৎসু হয়। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় চল্লিশ বছর পার হওয়ার মধ্যে একটি নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বও রচিত হয়েছে ওই ঘটনা এবং এ সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যা ইতিহাস বিচারের জন্য প্রয়োজনীয়।

যদি তেমন একটি তাত্ত্বিক বিচার আমরা এ মুহূর্তে করতে চাই, তাহলে তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমতঃ ইতিহাস বিচারের অন্যতম প্রধান যে শর্ত, বস্তুনিষ্ঠতা, আমাদের তা অর্জন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড ঘটনা, তার আবেগ বিশাল, তার আবেদন বিদ্যুৎস্পর্শী। এ ঘটনাটি নিয়ে লিখতে গেলে যেমন অতি সহজেই আবেগের সঞ্চারণ ও সংক্রমণ হতে পারে, সমালোচককেও তেমনি এক ধরনের আবেগধর্মিতা আক্রমণ করতে পারে? বাস্তবকে অস্বীকার করার অথবা বাস্তবকে পাল্টে দেওয়ার এবং নিজের আবেগের ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করার মাধ্যমে একজন লেখক মুক্তিযুদ্ধকে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার আওতায় নিয়ে আসতে পারেন। আবার একজন সমালোচকও নিজস্ব একটি আবেগ থেকে অনেক বস্তুনিষ্ঠ লেখাকে অবমূল্যায়ন করতে পারেন, যদি ওই লেখায় তাঁর নিজস্ব আবেগটি প্রতিফলিত না হয়। বস্তুনিষ্ঠতা, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর দূরত্বকে অনুধাবন করার ক্ষমতা– এসব সাহিত্য ও শিল্পবিচারের দিকনির্দেশক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা অনেক সময় এড়িয়ে যাই–প্রধানত আমাদের অধৈর্য এবং অস্থিরতার জন্য, তাহলো মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমাদের যুগের একটি কালিক ও স্থানিক দূরত্বের বাস্তবতাটি। নব্য ইতিহাসবিদরা বিশ্বাস করেন, কোন মানুষই আসলে ইতিহাসের

বাইরে থাকতে পারে না, এজন্য ইতিহাসে বাইরের দৃষ্টি বলতে যে ধারণাটি প্রচলিত, তা আসলে একটি ভনিতামাত্র। নব্য ইতিহাসবাদীরা রৈখিক ইতিহাস থেকেও ঘটনা ও প্রবণতা প্রধান ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব দেন এবং তারা ইতিহাসের ক্রমপরম্পরাকে একটি অর্পিত, সাজানো ডায়েরি বলে মনে করে। নব্য ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের মনে হতে পারে, স্বাধীনতার এত বছর পরও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখার স্বল্পতা বা শিল্প-সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ ঈপ্সিত পর্যায়ে কেন পৌঁছেনি, সেটি নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ মুক্তিযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি এবং সময়ের ক্রমিকতা একটি বিভ্রান্তি মাত্র। কাজেই নব্য ইতিহাসবিদ বলবেন আমাদের ভাবা উচিত মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রবণতা ও ঘটনাগুলো নিয়ে। গত একুশ বছরের ঘটনাপরম্পরাকেও সেক্ষেত্রে আমরা একটু নিস্পৃহ চোখে দেখব; কারণ জীবন যেহেতু গতিশীল, ঘটনাক্রম প্রতিদিনই বিস্মৃত হচ্ছে, আরও হবে। এসব ঘটনার মুখ্য বিন্যাসটি ধরাই হবে আমাদের কাজ। কিন্তু প্রথাগত অথবা নব্য ইতিহাসবিদ, যে ব্যাখ্যাতেই আমরা যাই না কেন, আমাদের মানতে হবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনো লেখা অপেক্ষা মুক্তিযুদ্ধের দূরবর্তী সময়ের কোনো লেখায় আমরা যে বর্ণনা বা বিশ্লেষণ পাব, তাতে প্রেক্ষাপটটি হবে অনেক বেশি অর্থবহ, কারণ এক ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি, যা শুধু সময়ই আমাদের দিতে পারে, আমরা অর্জন করব। মুক্তিযুদ্ধের একুশ বছরে বহু ঘটনা ঘটেছে, বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সেগুলো উনিশ'শ বাহাত্তরে জানা আমাদের সম্ভব ছিল না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, আমাদের অন্বেষণের ভূমি বিস্তৃত হয়েছে। এ অধিকতর সমৃদ্ধ ইতিহাস-জ্ঞান নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সন্নিকটবর্তী হলে আমাদের একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাববোধ কিছুটা হলেও জাগ্রত হয়।

আমাদের কালের অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করলে এ কালিক তফাৎটুকু আমাদের আবেগকে পরিশুদ্ধ করতেই বরং সহায়তা করে। আমরা এ সময়ে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা অতীতের নিরিখে বিচার করি। অথচ ওই অতীত আমাদের কাছে কখনো নির্বাপিত অথবা মৃত নয়, বরং ঘটমান বর্তমানেই একটি প্রতিরূদ্ধ

প। কিন্তু একটু ভিন্নভাবে ঘটনাটি দেখলে, এ নতুন শতকে এসে, স্বাধীনতার এত বছর পর কেন হঠাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত লেখালেখি হচ্ছে, তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও আমরা দিতে পারি। আমরা বলতে পারি, এ নতুন আগ্রহের জন্য কালিক একটি দূরত্বের প্রয়োজন ছিল, যে দূরত্বে প্রতিটি ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিচার করতে পারি।

তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদের গোচরে রাখতে হবে, যদি একটি তাত্ত্বিক বিচার আমরা প্রয়োগ করতে চাই শিল্প-সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সেটি হলো : মুক্তিযুদ্ধ কী শুধু বিষয় নির্মাণ করেছে সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে, নাকি প্রকাশের ক্ষেত্রেও নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে, নতুন একটি 'ফর্ম' সে উপহার দিয়েছে, অথবা প্রচলিত ফর্মকে নতুন করে বিন্যস্ত করেছে, যে বিষয়ে একটি দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং সে অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যকে নতুনভাবে মূল্যায়ন। এ বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি আমাদের সাহিত্য বা শিল্প আলোচনায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ যতটা না বিষয় সৃষ্টি করেছে, তার থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে প্রকাশের মাধ্যমগুলো, তাদের টেকনিক, অন্তর্গত খুঁটিনাটি। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়গৌরব অনস্বীকার্য, আরাধ্য। কিন্তু একধরনের সীমাবদ্ধতাও সেখানে আছে। নাইজেরীয় নাট্যকার কবি ওল সোয়িঙ্কা একবার বলেছিলেন, বায়াফ্রা যুদ্ধ নিয়ে, যে যুদ্ধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে, আবেগগতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যে এ যুদ্ধের আসলে একটিই গল্প। শোষণ, বঞ্চনা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-হত্যা, নির্যাতন-পরাজয়, বিজয়। বায়াফ্রাবাসীরা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের চিন্তার ও চেতনার মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়নি তারা। সোয়িঙ্কা বেশি লেখেননি এ যুদ্ধ নিয়ে– কিন্তু অসামান্য একটি নাটকের নাম তো আমরা জানি, 'ম্যাডমেন অ্যান্ড স্পেশালিস্টস'– যেখানে বায়াফ্রার রক্তপাত, উপনিবেশী নিষ্ঠুরতা, ভণ্ডামি এবং মানুষের প্রতিরোধের প্রসঙ্গগুলো বর্ণিত হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোয়িঙ্কার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং শাণিত বুদ্ধির বিষয়গুলো। একটি সাক্ষাৎকারে যখন সোয়িঙ্কা বলেন, তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে ততটা লেখেননি, কারণ একটি লেখাই প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে অন্যান্য লেখার। কারণ

আবারো তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধের গল্প তো থাকে একটাই। তবে ওই একটি গল্পের যে কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, কত বিবিধ প্রকাশ হতে পারে, তা আমরা জানি। কাজেই বিষয়গৌরবের যে অহংকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা করি, সেটি যথার্থ। কিন্তু ফর্মের বিষয়টি সহজে আমাদের চিন্তায় আসে না। অথচ, মুক্তিযুদ্ধ একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর প্রকাশ-চেতনাকে পরিবর্তিত করতে পারে, তাতে যোগান দিতে পারে নতুন কোনো উপাদানের। সোয়িঙ্কার কথায় ফিরে যাই আমরা। সোয়িঙ্কা বরাবরই ছিলেন মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ, সাধারণ জীবন থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর সৃষ্টির উপাদান, প্রকাশের অস্ত্র। কিন্তু বায়াফ্রা যুদ্ধ যখন তাঁকে বিচলিত করল, তিনি মানুষের ভিতরে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তিকে কাছ থেকে দেখতে থাকলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন, জনজীবনের ও জনমানুষের কল্পনার, যাকে আমরা ফোক ইমাজিনেশন বলি, একটি শক্তি থাকে এসব পরস্পরবিরোধী বিষয়কে মেলানোর। মাহাত্ম্যের পাশে পাশবিকতা কেন সহ-অবস্থিত, এর উত্তর ওই ফোক ইমাজিনেশন থেকে পাওয়া যায়, যেখানে এ উভয় পক্ষ এমনভাবে প্রতীকায়িত হয় যে তাদের আলাদা করে দেখার কোনো প্রয়োজন থাকে না। সোয়িঙ্কার নাটক যখন এসব বিষয়কে, প্রতীককে ধারণ করছে, তিনি বুঝতে পারলেন ওই বিষয়ের উপস্থাপনাটিও হতে হবে ভিন্ন। তাঁর নাটকে ফোক ফর্ম-এর ব্যবহার নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সোয়িঙ্কা নিজে যে আভাস দিয়েছেন এদের অনিবার্যতার বিষয়ে, সেটি খুব তলিয়ে দেখা হয়নি। বায়াফ্রা যুদ্ধের আগে এবং পরে তাঁর লেখায় জীবনকে দেখার ভিন্নতা আছে। বলা যায়, তাঁর মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে প্রকাশের ক্ষেত্রে জনজীবনের, ফোক ইমাজিনেশনের অনেক গভীরে নিয়ে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের কিছু প্রভাব প্রত্যক্ষ, সচেতন; তার অনেকটাই আবার থাকে আমাদের অবচেতনে, সামষ্টিক অবচেতনে এবং এর স্থায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদি। বাংলাদেশের নাটকের আত্মপ্রকাশ, নবপর্যায়ে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রত্যক্ষভাবে ধারণ করেছে এবং এ প্রভাবে বিষয়ও নির্ধারিত এবং নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু অসচেতন প্রভাবটি এসেছে জীবনকে দূরবিস্তারী দৃষ্টি দিয়ে দেখার মধ্যে। এ যে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নাটকে লোকজ ফর্মকে ধরে রাখার প্রবণতা,

ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া এসব মুক্তিযুদ্ধের পরোক্ষ অবদান। আমাদের কি মনে পড়ে না, একাত্তরের নয় মাস আমরা প্রধানত কোথায় ছিলাম? এক কোটির মতো মানুষ ছিল ভারতে উদ্বাস্তু; আর আমরা বাকিরা ছিলাম নিজ দেশে পরবাসী উদ্বাস্তু। আমরা ফিরে গিয়েছিলাম গ্রামে, আমাদের আদি উৎসে। এবং সেখানে অর্জন করেছিলাম বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার প্রেরণা। নাটক যদি উৎসে ফিরে যায়, লোকজ মনীষার অন্বেষণ করে প্রকাশের দীপ্তি, তাকে আমরা অভিহিত করব মুক্তিযুদ্ধের ওই আদিতে প্রত্যাবর্তন হিসেবে।

আমাদের সাহিত্যে-উপন্যাসে কবিতায়, গল্পে মুক্তিযুদ্ধ এ প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, উভয় প্রভাব বিস্তৃত করেছে। একটি উপন্যাসের কথা আমার এ মুহূর্তে মনে পড়েছে, সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী', যা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। সৈয়দ হকের ভিতর মুক্তিযুদ্ধ একটি ভিন্ন প্রভাব ফেলেছে, তাঁর নির্মাণকালকে তিনি বিশ্বাস করেছেন ওই যুদ্ধের রুদ্ধশ্বাস, তীব্র এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী শক্তির কাছে। তাঁর উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়েছে একটি অনুচ্ছেদে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো অনুচ্ছেদ নেই– এমনি ঠাসবুনোনী তার গঠন। পাঠক থামেন না; থামার কোনো প্রয়োজনও থাকে না।

মুক্তিযুদ্ধের শ্রুতি, বিস্তৃতি, তার শক্তি ক্রিয়া করতে থাকে তার স্নায়ুতে। এ ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া, তাকে ধারণ করে উপন্যাস। ঐ উপন্যাসটিকে আমি খুবই গুরুত্ব দিই। এ কারণে যে এটির বিষয়গুণ যতটা আকর্ষণীয়, তার থেকেও এর প্রকাশ বিশিষ্টতা; মুক্তিযুদ্ধ যে, ফর্ম-চিন্তাকে স্পর্শ করে তাকে বদলে দিতে চায়, এ তারই প্রমাণ। আরেকটি বড় কাজ হুমায়ূন আহমেদের 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প' এক বিশাল ক্যানভাসে মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং পাঠককে আরেকবার মুক্তিযুদ্ধের সময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধ যখন সৃষ্টিশীলতার অঞ্চলে প্রবেশ করে, অনেক অসম্ভব তখন সম্ভব হতে পারে। সংগীতের ক্ষেত্রে এটি আমরা বিশেষভাবে

প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে গানগুলো গাইতাম, মুখে মুখে ফিরত সারা বাংলায়, তারা যেমন কোনো অসাধারণ সৃষ্টি ছিল না সংগীতের শুদ্ধ বিচারে। গানের ভাষা অনেক সময় ছিল দুর্বল; দু'একটি গানের গীতিকার ব্যাকরণ মানতেও অনীহা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটি বাহ্য হয়ে যায় গানের আবেগের কাছে। যে উন্মাদনা এবং প্রেরণা তারা সৃষ্টি করেছিল, তার তুল্য কিছু আমরা আর দেখি না। এখন, এতদিন পর, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সরকার যখন প্রায় সবগুলো গানকে কার্যত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, অনেকবার অনুশোচনা করতে দেখি এ নিয়ে। কিন্তু এসব গানের একটি নির্দিষ্ট কার্যকারিতা থাকে। মুক্তিযুদ্ধকে যদি আমরা চিরকালের একটি সংগ্রাম হিসেবে দেখি, যার আদি এবং অন্ত নেই। তবুও, সেই গানগুলোকে একসময় তারিখ সম্বলিত হতে হয়। এটি এজন্য হয় যে, প্রকাশের এমন স্থিতিস্থাপকতা তাদের নেই যে, প্রতীকী মুক্তিযুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে বৈধ হবে, সমান উন্মাদনা সৃষ্টি করবে। এ হচ্ছে এসব সৃষ্টির প্রকাশগত সমস্যা। কিন্তু তারা চিরায়ত এবং চির প্রাসঙ্গিক থাকে মানুষের আবেগের কাছে। আবেগ যতদিন কাজ করবে মানুষের মধ্যে, ততদিন তারা থাকবে বৈধ প্রাসঙ্গিক।

মুক্তিযুদ্ধ ও সৃষ্টিশীলতার আলোচনায় আমাদের আবার ফিরে আসতে হয় এ দ্বিবিধ চিন্তার পরিমণ্ডলে। একদিকে আবেগ, অন্যদিকে আবেগ-উত্তীর্ণ, প্রকাশনির্ভর বিশিষ্টতা। যে শিল্প এ দুটোকে সমানভাবে ধারণ করতে পারবে, তা-ই হবে চিরকালীন, চিরায়ত। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে প্রথম দিকটি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, দ্বিতীয়টি ততটা পায়নি। প্রকাশের উৎকর্ষ, ফর্ম-এর গভীরে মুক্তিযুদ্ধের মানসিক বৌদ্ধিক দিকগুলোর প্রতিফলন, আমরা করতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধ যে কত বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হতে পারে, একজন ভারতীয় ঔপন্যাসিক তা দেখিয়েছেন। রোহিনতন মিস্ত্রী নামক এক তরুণ ঔপন্যাসিক ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখেছেন, 'সাচ এ রং জার্নি' নামে। উপন্যাস শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরও শুরু এবং শুরু প্রধান চরিত্রের যাত্রার। উপন্যাসের শেষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শেষ এবং মিস্ত্রীর চরিত্রেরও আসে একটি পরিণতি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে যদি একজন ভারতীয় ঔপন্যাসিক এরূপ প্রতীকীভাবে তার মূল ঘটনার সম্পূরক, পরিপূরক এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আমরা কেন পারব না? তার থেকেও নতুন উপায়ে?

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা : ক্লেদজ কুসুম

১.

'ছিন্নপত্র'-এ শাহজাদপুর থেকে জুন ১৮৯১ সালে লেখা একটি চিঠি সংকলিত আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বপ্নদৃশ্য বর্ণনা করছেন। অদ্ভুত সেই স্বপ্নে তিনি দেখছেন, "এক দল অদ্ভুত লোক এসেছে.... তারা মানুষকেও বড় করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্য উমেদার হয়েছেন; তারা এঁদের মাথায় কী-একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুঁস করে লম্বা হয়ে উঠছেন।" তারপর কে একজন প্রস্তাব করেছে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে, যে বাড়িটাও উঁচু করা যাক। মঙ্গোলিয়ান চেহারার লোকগুলো বাড়ি খানিকটা ভেঙে বলল, এখন এত টাকা না দিলে কাজে হাত দেবে না। তাতে সরকার আপত্তি জানালে, "তারা চটে উঠল– বাড়িটা সমস্ত এ একরকম বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে।" স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এ মঙ্গোলিয়ান চেহারার মানুষগুলো শয়তান; কলকাতায় শয়তানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, "সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠাবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকীয় কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।"

'ছিন্নপত্র'-এ এ চিঠিটি আমরা একটু ব্যতিক্রমী বলে শনাক্ত করতে পারি। খেলাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন একটি স্বপ্ন, আর

সেই স্বপ্নে চলছে মানুষের, বস্তুর, দালানের, শহরের নানা ফর্মের ভাংচুর। মেয়েরা লম্বা হয়ে যাচ্ছে হুঁশ করে। দালান বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। আর শহরে চলছে নারকীয় শ্রীবৃদ্ধি। শহরের সঙ্গে নরক এবং এসবের সঙ্গে শয়তানের একটি যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে এবং এ উপাদানগুলো, তাদের ভিতরকার এ সম্পর্কগুলো, আমাদের কাছে কিন্তু নিতান্ত কৌতুকের বশে নির্ণীত বলে মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, পুরো স্বপ্নটিই একটি খেলার বিষয়। বরং রোমান্টিক কবির বিপন্ন এবং বিপদগ্রস্ত জগৎটি যখন বাস্তবতার কঠিন আঘাতে আহত এবং অরক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন অশুভের আগমনে শঙ্কিত সেই কবির কাছে অনিবার্য একটি চিত্রকল্প বলে মনে হয় ওই স্বপ্নটি। এ চিত্রকল্পের চরিত্রটি আবার এমন যে, এটি সহজেই প্রতীকী একটি স্তরে বিন্যস্ত হতে পারে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসি কবিতায় নব্য রোমান্টিকতা দেখা দিয়েছিল প্রধানত চিত্রময়তা, আবেগধর্মিতা এবং শুভ-অশুভের দ্বান্দ্বিক অবস্থাননির্ভর ভাবনার পুনরুত্থানের কারণে। প্রতীকবাদ বলে যে আন্দোলনটি এখন ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেই প্রতীকবাদ ওই নব্য-রোমান্টিকতাকে অবলম্বন করেছিল, বাস্তবতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আর বোদলেয়ারের মতো আহত রোমান্টিকরা (বাইরে যে পরিচিতিই তাঁরা গ্রহণ করুন না কেন) অশুভকে দেখেছেন অশুভরূপেই— আতঙ্কিত হয়েছেন, আকর্ষণবোধ করেছেন। কিন্তু অশুভের টানে পঙ্কে তলিয়ে যাবার আগে নির্বাণের উপায় অন্বেষণ করেছেন আরেকবার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন তার অশুভকে, অনেকটা বোদলেয়ারের মতো। তাঁর 'ছিন্নপত্র'-এর ওই পত্রে, স্বপ্নেই তিনি অনুভব করেছেন, অশুভের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চিত্তকে শুচি করতে হবে। তাই তিনি বড়দাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছেন উপাসনা করতে ওই স্বপ্নে। *ছিন্নপত্র-এর রচনার সময়কাল,* 'ছিন্নপত্র'-পটভূমি, এর চিন্তাভাবনা ও দর্শন, এর Transcedence-এর প্রয়াস সবই আমাদের কাছে গুরুত্ববহ মনে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তখন ঘটে যাচ্ছে নানা ওলট-পালট, প্রধানত শোকের ও বিচ্ছেদের নানা ঘটনা। স্ত্রীকে হারিয়েছেন,

হৃদয়ের দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। জমিদারি দেখাশোনার নামে বেরিয়ে পড়েছেন পদ্মা, আত্রাই ও গড়াইয়ের বিস্তীর্ণ জলপথে, ঘুরে বেড়িয়েছেন বোটে করে। কত রাত তাঁর কেটেছে একা, ঐ নৌকোয়। সেসবের কত বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন তাঁর চিঠিগুলোতে। পদ্মার ওপর বিস্তীর্ণ আকাশ, সেখানে অন্ধকার জমেছে কৃষ্ণপক্ষের। রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারের ভিতর দেখেছেন আরও অন্ধকার। হয়তো একটি স্তর ভেদ করে জেগে উঠেছে আরেকটি স্তর, হয়তো এক স্তর থেকে আরেকটিকে আলাদা করেছে হালকা ও সূক্ষ্ম একটি রেখা, যা আলোরও নয়, অন্ধকারেরও নয়। ঐ সূক্ষ্ম সাদার ঘের, যা পদ্মার ওপর বস্তুর সঙ্গে বস্তুর প্রভেদ রেখা অথবা এক অস্তিত্বের সঙ্গে অন্য অস্তিত্বের বিভাজন টান, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ এ বিভোরেখা ব্যবহার করেনি চিত্রকলায় এবং 'ছিন্নপত্র' পড়লে আমাদের মনে হয়, তিনি ধার নিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে। কিন্তু বড় কথা এই, 'ছিন্নপত্র' তথা উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবাস, আসলেই অপরিহার্য ছিল চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের জন্য, আরও সিকি শতাব্দী পরে।

২.

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আঁকার খাতা ছিল একসময়। বাল্যকালে সেটি তিনি হারিয়েছিলেন। একসময় যৌবনে যে কিছু ছবি এঁকেছিলেন এবং সেগুলোও হারিয়েছিলেন যথারীতি, সে খবর রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন আমাদের। এ কথা ঠিক নয়, যেমন অনেকে বলে থাকেন, যে পাণ্ডুলিপির আঁকাজোঁকা থেকে জন্ম নিয়েছে রবীন্দ্র চিত্রকলা। তার আগে ছবি আঁকার ঐ দু'টো উদাহরণ বাদ দিলেও দেখা যাবে, যেমন 'ছিন্নপত্রের' নানা চিঠিতে আমরা পাই, ছবি আঁকার মালমসলা, নানা বিষয়বস্তু, ফর্ম এমনকি ফর্মের ভাংচুর, সবই প্রস্তুত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কুড়ির দশকের আঁকা ছবির সঙ্গে গত শতাব্দীর শেষ দশকের কিছু অনুধাবন, কিছু ফর্ম-ভাবনা এবং ফর্মা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে তাহলে মিলে যায়? রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, অনেকে বলেন, তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একটি নেশা, যে ষাটোত্তর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ খেয়ালের বশে শিশুর মতো ছবি

আঁকতে বসলেন। আর যেকোনো ধরনের কাগজই থাকুক হাতের কাছে রঙে রেখায় সেসব ভরিয়ে তুললেন। ঐ 'শিশু-সদৃশ' কথাটি বস্তুত প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্র চিত্র সমালোচনায়; এতটাই যে, শেষপর্যন্ত কুমার স্বামীকে বলতে হয়েছে, রবীন্দ্র চিত্রকলা, 'শিশুসুলভ নয় শিশুশোভন'। আমাদের অবশ্য বিশ্বাস এ যে, রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করলেও প্রস্তুতি চলেছে দীর্ঘদিন; যে, তাঁর চিত্রকলা আসলে তাঁর কবিতার পরিপূরক, যে তাঁর ছবি আঁকার জন্য সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়–সে সময়ে একান্ত নিজস্ব চিত্রভাবনাটি (যাতে আছে বিষয়বস্তু ও ফর্ম উভয়ই) তাঁর ঋদ্ধি পেয়েছে– যে সময়টি ছিল গত শতাব্দীর শেষ দশক। রবীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে সমৃদ্ধ খাতাটি ছিল ঐ পদ্মা-গড়াই-আত্রাই-এর নদী অঞ্চল। আর 'ছিন্নপত্র'-এর ছবিগুলোতে তিনি নামহীন অথচ স্বাক্ষরযুক্ত নানা ছবি এঁকে গেছেন।

আমার আরেকটি অনুধাবন এ যে, আহত রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ অশুভকে কবিতায় ঠিক ওইভাবে নিয়ে আসতে পারতেন না। যেভাবে বোদলেয়ার পেরেছেন। বোদলেয়ারের অমঙ্গলবোধ বাস্তবতার পঙ্ক থেকে জন্মানো। কিন্তু একসময় সেটি পঙ্কজের শুভ্রতা এবং আকর্ষণ নিয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অশুভ চিন্তায় এ শেষোক্ত সম্ভাবনা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ছিল এক জায়গায়, যেখানে প্রতীকের বহু স্তরবিন্যাস বুদ্ধিকে আমন্ত্রণ জানাবে তার অর্থ উদ্ধারের জন্য। কবিতার আবেগ সেখানে সফল হবে না, ঐ পাঠোদ্ধারে এবং সে ছিল চিত্রকলা।

রবীন্দ্রনাথে চিত্রকলা তাঁর Fleurs Du Mal, তাঁর ক্লেদজ কুসুম, অশুভের ফুল।

৩.

লক্ষণীয়, চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ যে শান্তি মননের সন্ধান করে, তার প্রয়োগ প্রত্যাশা করেন, তার উৎসার কামনা করেন, ততটা কবিতায় তিনি করেন না। রবীন্দ্রনাথ হাস্য-কৌতুকের অনেক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু Satire বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কবিতায় ছিল তাঁর

অনাগ্রহ। Satire-এর সঙ্গে রোমান্টিকতার মিল নেই। রোমান্টিকতা কল্পনার অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। Satire কল্পনাকে খণ্ড খণ্ড বিভাজনে উপস্থাপিত করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা অখণ্ড কল্পনাকে জাগ্রত করে না। ব্যঙ্গ কবিতার মতো তা কল্পনাকে স্থানীয়, সীমাবদ্ধ এবং আত্মদর্শী করে। আত্মবিশ্লেষী এবং তীর্যক করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার কল্পনার এ বিনির্মাণ, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের দ্বান্দ্বিকতা এবং বাস্তবের গূঢ় অভ্যন্তরে একটি অতি বাস্তব অন্বেষণ আমাদের সহজেই চোখে পড়ে। অশুভ তার চিত্রকলার এক বিষয়- ভয়ানক কুশ্রী ভাঙ্গাচুরা মুখশ্রী, অতিকায় কৌণিক, জ্যামিতিক নির্মাণের প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু, সরীসৃপ ও শ্বাপদ এবং মানুষের উলম্ব অবস্থান ও অন্ধকার নারী প্রতীমা—এসবের সম্মিলিত রূপ হচ্ছে এক অস্বস্তিকর, আলোহীন, শ্রীহীন পৃথিবীর। কিন্তু এজন্য রবীন্দ্রনাথ এ পৃথিবী বাতিল করে দিচ্ছেন না। বরং এক তীব্র আকর্ষণ আমরা বোধ করি এ জগতের প্রতি, যেমন অনুভব করি নিষিদ্ধ কোনো বস্তুর প্রতি। এ আকর্ষণের যদি কারণ খুঁজতে যাই আমরা, তাহলে দেখতে পাব, মানুষের মনের গহীন অবচেতনে যে চিত্রকল্পগুলো আছে, তাদের মধ্যে হয়তো নেই কোনো কার্যকরণ সূত্র, অথবা তার হয়ে ওঠার জ্যামিতিতেই বিশ্বাসী নয়। সেই অপ্রকাশযোগ্য, প্রায় অনুভব না করার মতো চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাগজে, কালি-কলমে অথবা জলরঙে তুলে আনেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির রংগুলো কিন্তু লালচে-বাদামি একটি কালি রঙের প্রাধান্য তাতে দেখা যায়, যে রং আমাদের অবচেতনের, শঙ্কার, উচ্ছ্বাসের। একধরনের মনোক্রোমাটিক বিষয়াবলি বলা যায় এ রংটির প্রাদুর্ভাবকে। কিন্তু যতই আকর্ষণীয় হোক অবচেতনের এসব চিত্রকল্প, রঙের এ একক বিশিষ্টতা অশুভকে কখনো এভাবে এত সহজে মানুষের অনুভবে তিনি আসতে দিতে পারেন না। তার জন্য অনেকগুলো বুদ্ধির দেওয়াল তিনি তুলতে চেয়েছেন। তার একটি হচ্ছে তাঁর জ্যামিতি।

৪.

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রায়শই জমিনটি আলোকিত। ফিগার/ফিগারগুলো অন্ধকার। অবশ্য ফুল বা পাখির চিত্র এর উল্টোটি

দেখা যায়। পটভূমির অন্ধকার থেকে ফিগারের বা বস্তুর অন্ধকারকে আলাদা করার জন্য একটি সূক্ষ্ম সাদা রেখায় তিনি ফিগার বা বস্তুকে ঘের দিয়ে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে আলো, যা আপাতদৃষ্টিতে নিসর্গ থেকে সঞ্চারিত, তা কিন্তু নিসর্গের নয়, আবার যে অন্ধকারে তিনি আচ্ছন্ন করে দেন মানুষ, পাখি, জন্তু ও প্রকৃতিকে, তাও প্রাকৃতিক নয়। আলো ও অন্ধকার উভয়ই অতি প্রাকৃতিক, এদের উৎস অন্যকোনো জগতে, অন্যকোনো অনুভবের দেশে।

এ অন্ধকার মানুষের প্রবৃত্তি তাঁর atavistic, শ্বাপদ চেতনের। এ আলো মানুষের ভিতরের। এ আলোতে এ সময়ের শুচি হয়, কিন্তু এতে বাস্তবতার ক্লেদও দৃষ্টিমান হয়। যে আলো ও অন্ধকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবিত হয়েছিলেন, যাদের আবিষ্কার করে তিনি মানুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, কবিতা থেকেও চিত্রকলায় তাদেরকে তিনি অনেক সহজে অনেক নিশ্চিন্তে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঐ আলো-অন্ধকারে তো মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অধিকার। অথচ এদের চরিত্রটি এমন নয় যে সহজে বুঝে ফেলা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ আবার নির্ভর করেছেন– আবেগের ওপর নয় বুদ্ধির ওপর, এবং তিনি মুখ্য করেছেন জ্যামিতিকে। শিল্পের সবচেয়ে অন্তর্গত, সবচেয়ে জটিল অথবা বিমূর্ত অথবা সবচেয়ে চিরায়ত বিন্যাসটিকে ধরে রাখতে পারে একমাত্র জ্যামিতি। পিকাসোর জ্যামিতি আমাদের খুব শক্তিশালী মনে হয়, মনে হয় পৃথিবীর সকল জ্যামিতি যেন এখানে। কিন্তু জ্যামিতি দ্য ভিঞ্চির ছিল, টিশিয়ানেরও ছিল, ভ্যান গগেরও ছিল– আধুনিক চিত্রকলার তো জ্যামিতি মৌল একটি নির্মাণ ও প্রকাশ শর্ত। দ্য ভিঞ্চির জ্যামিতি ছিল ফিগারের সঙ্গে ভূমির সম্পর্কে, টিশিয়ানের ছিল ফিগারের বহিঃস্থ পৃথিবীর সঙ্গে তার ভিতরের পৃথিবীর। রবীন্দ্রনাথের ছিল বস্তুর কর্মের সঙ্গে তার সারাৎসার বা essence -এর কখনো এর প্রকাশ হয়েছে 'জ্যামিতিক' – জ্যামিতি আর কীভাবে আসতে পারে! কিন্তু অন্যত্র এ প্রকাশ দু'একটি পৌনঃপুনিক মোটিফ-এ এসেছে (যেমন– পুঞ্জিত গাছ,

উলম্ব ফিগার, দুটো ফিগারের interclocking curve) এসেছে অতি প্রাকৃতিক আলোকের প্রক্ষেপণে, অন্ধকারের স্তরবিন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি শুধু ফর্মে, বস্তু বা ফিগারের পরিগৃহীতরূপে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জ্যামিতি প্রথমত অনুভবের, অর্থাৎ বস্তুর a priori যে চিন্তা, যা থেকে ঐ বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি হতে পারে– আবার না হতে পারে, চিত্রকল্পে থাকে জ্যামিতি। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে সুমিত্রি বা Symmetry-এর অভাব দেখা যায়। ওই অভাব প্রথাগত জ্যামিতি চিন্তাকে অতিক্রম করে একটি মৌল জ্যামিতি চিন্তা যা ফর্মের বিন্যাসকে বিশ্বস্ত করবে কখনো জটিল, কখনোবা পরস্পরবিরোধী, বহু ভাবনার কাছে। সাধারণ একটি প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় শুভ-অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গলকে যে দৈত্যের কাঠামোয় বন্দি করা হয়, তা চিত্রকলায় কিভাবে আসে? এর উত্তর খুব সহজ নয়, তবে এ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অনুসন্ধানে পড়ে যে, তাঁদের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জ্যামিতিতে। প্রায়শই তাঁর ছবিতে যে উলম্ব ফিগার হু হু করে ওঠে যায় উপরের দিকে এবং প্রতি তুলনায় আভূমি বিছিয়ে থাকে জমি, প্রেক্ষাপট, একে অপরের আড়াআড়ি ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে ছবির এ দুই প্রধান পক্ষ, তাতে বিপরীত দুটি চেতনাও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ছবির প্রায় মাঝখানে, যেভাবে তারা পরস্পর সংলগ্ন, সেখানে আমাদের চোখ যায়। আর ঐ স্পেসটুকুতে আমরা দেখি বহু বিচিত্র রেখার খেলা এবং ক্ষেত্রের সৃষ্টি। তাঁর অনেক ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে সাধারণ দর্শকের অস্বস্তি ছিল– ঐ যে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, সরীসৃপ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, সেসব ঠিক কোন পায়রার খোপে ফেলে বিচার করা হবে, এ নিয়ে দ্বিধা ছিল কিন্তু আমরা দেখি, এমন জীবজন্তু পাখি যখনই আঁকেন রবীন্দ্রনাথ, তার চিত্রময়তা হয় তিরোহিত, যার বিপরীত ঘটে কবিতায়। কিন্তু নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে দেখলে আমরা আবিষ্কার করব, ওইসব জন্তু-জানোয়ার আসলে অপার সম্ভাবনাময় নয়। বরং তারা নির্ধারিত, সীমাবদ্ধ তাদের জ্যামিতিক গঠনে। জ্যামিতি যখন প্রকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তা আবেগকে আশ্রয় করে ঋদ্ধি পায় না কখনো– তার জন্য প্রয়োজন মননের, যুক্তির, পারম্পর্য, কার্যকারণ ও বৈজ্ঞানিক সূত্রের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলায়, এভাবে

তার অশুভের ফুলকে পাঁচটি বা সাতটি পাপড়িতে সাজান, জ্যামিতি এখানে তার প্রধান সহায়ক এবং এ জ্যামিতিক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের জানান যে, অশুভ আসলে অনন্ত নয়।

জ্যামিতি নিয়ন্ত্রণ করে রবীন্দ্রনাথের অনেক ফিগার, তাঁর মুখ্য ফর্ম ও আঙ্গিক এবং সেই জ্যামিতিতে থাকে কিছু বাণী, কিছু দর্শন। 'ছিন্নপত্র'-এর ওই পত্রটির মতো, জ্যামিতি প্রকাশ করে অশুভকেও। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ জ্যামিতিকে ব্যবহার করলেও অনন্তের আগমন ঘটে আনন্দ ও আলোকের মধ্য দিয়ে।

অরুন্ধতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আবু সায়ীদ আয়ূব তাঁর 'দি ইনথেটিক ফিলোসফি অফ ট্যাগোর' প্রবন্ধে বেশ সুষ্ঠুভাবেই বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো নন্দনতত্ত্ববিদ ছিলেন না, যেমন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, যার 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলিতে' সৌন্দর্য ও শিল্প বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত সূত্রবদ্ধ করার একটি সচেতন প্রয়াস আমরা লক্ষ করি এবং যার শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে নিজস্ব শিল্পকর্মের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত থিওরি বা তত্ত্বের, অর্থাৎ জ্ঞানচিন্তার বিমূর্ত সামান্যীকরণের বিষয়ে, বরাবরই সাবধান ছিলেন– সেটি তার লেখালেখিতেই প্রকাশিত। সেজন্য সৌন্দর্য বিষয়ে কোনো বিমূর্ত/দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন– এটিও আয়ূবের ধারণা। আয়ূব প্রস্তাবিত এ সম্ভাবনাটি আমরাও সাধারণভাবে গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু যদি সৌন্দর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য, ব্যাখ্যা উদ্ধৃতি বা বিশ্লেষণকে আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ করি, তাহলে আয়ূবের সাথে দ্বিমত পোষণের কিছু অবকাশ থেকেই যাবে। আয়ূব বলেন, রবীন্দ্রনাথ শিল্প বিষয়ে সংকলিত বা মৌলিক মত আগ্রহী ছিলেন না; কিন্তু সৌন্দর্য বিষয়ে মৌলিক মত প্রতিষ্ঠার অবকাশ রবীন্দ্রনাথের মতো ভাবাদর্শী ও রোমান্টিক কবির পক্ষে কতটা ছিল, সে প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। উপনিষদ থেকে শুরু করে ভারতীয় রসবাদ, উনিশ শতকী সৌন্দর্যচিন্তা বিশেষ করে ওয়াল্টার পেটার, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং কলাকৈবল্যবাদী-রোমান্টিক ঐতিহ্যে যার শিকড় ছিল প্রোথিত, তিনি তার বাইরে এসে বৈপ্লবিক কোনো নন্দনচিন্তা

উপহার দেবেন এমনটি ভাবা সহজ নয়। বাস্তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই– তিনি বিভিন্ন সময়ে সৌন্দর্য সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন, যার মৌলিকতত্ত্ব অন্বেষণ করতে হলে ওই ঐতিহ্যের গোড়াতেই আমাদের পৌঁছাতে হবে। তারপরও রবীন্দ্রনাথ অনেক তত্ত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের মনে হয়, আয়ূব কথিত 'থিওরি'কে রবীন্দ্রনাথ যদি 'ঘৃণা'ও করে থাকেন, তাঁর নিজের লেখালেখিতে ওই থিওরির কোনো কমতি নেই। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ থিওরির আকর্ষণেই হয়তো পা দিয়েছেন। সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁর তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার উল্লেখ আমরা করতে পারি, যেগুলোতে থিওরি তৈরির পক্ষে একটি উৎসাহী প্রবণতা লক্ষ করা যায় এগুলো হলো, ১২৯১-এর আষাঢ়ে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সৌন্দর্য ও প্রেম' এবং ১৩১৩-১৩১৪ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এর দুটি সংখ্যায় 'সৌন্দর্যবোধ' (পৌষ ১৩১৩) ও 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (বৈশাখ, ১৩১৪)। এ তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বিষয়ে কী অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সে বিবেচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি সম্পর্কিত প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি প্রয়োজন।

২.

আয়ূব যে বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ করেছেন, যাদের প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তায়, যেগুলোর কোনো কোনোটি যেমন প্লেটো এবং হেগেল, বিপরীত অবস্থানেই দাঁড়িয়ে যায় অনেক সময় বিশেষ করে প্লেটো যেখানে বলেন, সুন্দর একটি স্বাধিষ্ঠিত সত্য, যেখানে অসুন্দর অনুপস্থিত, সেখানে হেগেল সুন্দরকে একটি ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখেছেন, যার পিছনে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এদের থেকে সেটুকুই গ্রহণ করেছিলেন, যেটুকু তাঁর চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এ অর্থে তাঁর সৌন্দর্যচিন্তা কিছুটা হলেও সংকলিত, তবে এ সংকলনের মাধ্যমে তিনি যে নির্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি অর্থময় রূপ আমরা তাঁর লেখালেখি থেকে পেয়ে যাই। একে হয়তো প্রকৃত অর্থে থিওরি বলা যাবে না, কিন্তু এর একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্য রয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "শিল্পশাস্ত্রে মত এবং মন্ত্র দুটোই স্থান পেয়েছে, মতকে ইচ্ছে করলে শিল্পী বর্জন করতে পারেন,

কিন্তু মন্ত্রকে ঠেলে ফেলা চলে না।" রবীন্দ্রনাথের অনুভবে নানা নন্দন চিন্তাবিদের চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল মন্ত্রের শক্তি নিয়ে, মতের সামান্যতা নিয়ে নয়। এজন্য এদের সংকলিত তাত্ত্বিক মূল্যটি অগ্রাহ্য করা যায় না।

আমাদের মনে এ পর্যায়ে যে প্রশ্নটি জাগে সেটি এরকম: রবীন্দ্রনাথের সংকলন গঠন তাকে যে মন্ত্রের সন্ধান দিয়েছিল, তার প্রভাব কিছু মৌলিক চিন্তা—মত নয়, চিন্তা—তিনি কি রেখে যাননি আমাদের জন্য?

আমরা জানি, এ প্রশ্নের উত্তরটি সদর্থক, কিন্তু এদের খুঁজতে গেলে তাঁর সৌন্দর্য বিষয়ক রচনাগুলো যতটা আমাদের সাহায্য করে, তার থেকে বেশি তাঁর সাহিত্য, সংগীত এবং তাঁর চিত্রকলা। যদি তাঁর রচনায় প্রবন্ধে আমরা তত্ত্বের সন্ধান করতে যাই, তাহলে আয়ূবের দ্ব্যর্থবোধক দোদুল্যমানতায় আমাদের পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিশুদ্ধ আর্ট হচ্ছে ছবি এবং গান, সাহিত্য নয়। অথচ চিত্রকলা অর্থে ছবিতে তিনি নিজের বিশুদ্ধ আর্টের ভাবনাগুলো বজায় রাখেননি এবং সাহিত্যে তিনি 'বিশুদ্ধ আর্ট'-এর তুলনা রহিত চর্চা করে গেছেন। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে তিনি যা বলেছেন, তার প্রকাশ তাঁর সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলায় ঘটেনি। কথাটি ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় যে, তাঁর সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলার স্বয়ম্ভূ চরিত্রটি তাঁর নিজস্ব থিওরিসমূহের বাইরে এসে ভিন্ন একটি নান্দনিকতা উৎপাদন করে। যদিও এবং এ বিষয়টি মনে না রাখলে আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা থেকে যাবে— রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তাগুলো একটি গভীর স্তরে, গূঢ়ার্থগতভাবে, যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, তাঁর সৃষ্টিশীলতা, সার্বিক অর্থে, তাকে লালন করেছিল।

এ পর্যায়ে এ আলোচনার মূল বক্তব্যটি এভাবে বলা যায়: নন্দনতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ পরস্পর সম্পূরক হলেও অনেক সময় তাঁরা ভিন্ন পথে পা রেখেছেন। এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে—চিত্রকলায়—তাঁদের মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হয়েছে। এর কারণ, নন্দনতত্ত্ববিদ হিসেবে শিল্পের যে সামূহিকতা তিনি কামনা

করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য হবে 'সৌন্দর্য উদ্রেক' করা, অথবা 'বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা' ইত্যাদি। শিল্পী হিসেবে এ সামূহিক প্রয়াসটি তিনি অনেক সময় নিতে পারেননি। তাঁর চিত্রকলায় তিনি রীতিমতো কুরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন; জীবনের বাস্তবতাকে দেখেছেন উনিশ শতকি বাস্তবতার ঐতিহ্যে, যার সাথে তাঁর ছোটগল্পে উপস্থাপিত জীবনচিত্রের যোগাযোগ ঘটালে প্রকাশটি হয়ে ওঠে মনোবাস্তবিকও– তাকে তিনি নন্দনতত্ত্ব চিন্তায় অনেকবারই খারিজ করে দিয়েছেন।

থিওরি প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে একটি জটিল থিওরি প্রস্তাবনার অবতারণা করতে চাই। পশ্চিমের উত্তর–কাঠামোবাদী চিন্তায়, বিশেষ করে রোলাঁ বার্থ ও জাক দেরিদার লেখালেখিতে এরকম একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, একজন লেখকের লিখিত গ্রন্থ একসময় একটি স্বয়ম্ভূ চরিত্র অর্জন করতে পারে। একটি পুস্তককে যদি ওয়ার্ক বলা যায়, তাহলে সেটি হয় সীমিত, কিন্তু গ্রন্থ অসীম। এর কোনো বিরতি চিহ্ন নেই, কারণ তা লেখকের অভিজ্ঞতার একটি নিকষিত রূপ, তার অভিজ্ঞতার মতোই বহুবিধ, চলমান এবং অনেক সময় আত্মবিরোধী। বার্থ বলেন, একটি গ্রন্থ অন্য একটি গ্রন্থের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত এবং দুটি গ্রন্থের পরস্পর সংলগ্নতা অর্থকে পরিস্ফুট করে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' বা 'ঘরে বাইরে' এ অর্থে পরস্পর সংলগ্ন, তাদের অর্থের জগৎটিও পরস্পর সংলগ্ন। গ্রন্থের বিষয়ে বার্থের সিদ্ধান্তগুলো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আমরা দেখতে পাব, তাঁর সমগ্র কাজও একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং আন্তঃগ্রন্থিকতার সূত্রে এর সাথে তাঁর সময়ের অনেক চিন্তাও জড়িত।

এ থিওরিটি কিছুটা ঘুরিয়ে আমরা এভাবেও বলতে পারি, নন্দনতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বিষয়ের ভাবনাচিন্তায় কোনো থিওরি গ্রন্থ রচনা করতে চাননি; কিন্তু তাঁর সাহিত্য ও সংগীত বা চিত্রকলা যে গ্রন্থ রচনা করেছিল, সেগুলো এক নিরন্তর সংলাপে তার নন্দনচিন্তাকে একটি অবয়ব দেয়। তাঁর নন্দনচিন্তা তাঁর বৃহত্তর গ্রন্থেরই অংশ, তাতে

যে বহুবিধতা, আত্মবিরোধিতা বা চলমানতা/পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, তার সবই বার্থীয় অর্থে অনিবার্য। এ মতের আলোকে আয়ূবের চিন্তাভাবনাকেও আমরা অনিবার্য বলতে পারি।

৩.

রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তাকে যদি আমরা বিন্যস্ত করি, তাহলে উপরে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধের আলোকে যে কিছু চিন্তাভাবনার সাক্ষাৎ পাব যার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের নন্দন ভাবনার রয়েছে সাযুজ্য মোটা দাগে সেগুলো হলো :

– সৌন্দর্য অসীম-সসীমের মিলন, সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করে।
– প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মানব মনের প্রকাশ ঘটে।

– সৌন্দর্য শুধু ইন্দ্রিয়জ নয়, এর মধ্যে একটি 'অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে, তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত........।' (*ছিন্নপত্রাবলী*)

– সৌন্দর্য সত্য ও জড়বস্তুর মধ্যে সংযোগের মাধ্যম।
– সৌন্দর্য প্রকাশিত সংযম, মঙ্গল এবং সত্যে।
– সুন্দর যা, তা সত্য, সত্যই সুন্দর, 'সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত'।
– সৌন্দর্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওনা।
– সৌন্দর্য সাহিত্যের 'উপায়'– আনন্দদানের 'উপায়'।

– সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় রসে এবং রস হচ্ছে অনুভূতির নির্যাস। "অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থ নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রস পদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ, যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না।"

– 'যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী'।

– সৌন্দর্য হচ্ছে রূপের প্রকাশ এবং রূপের সার্থকতা রসে।

উদ্ধৃতির তালিকাটি আরও দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তার মূল সূত্রগুলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্নভাবে ‘ঐক্যপ্রয়াসী’, ‘ভাববাদী’, ‘রসবাদী’, ‘রূপবাদী’, ‘কলাকৈবল্যবাদী’ ‘ট্রানসেনডেন্টালিস্ট’ এবং রোমান্টিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও হয়তো এসব বর্ণনার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন না; কিন্তু মাঝে মধ্যেই তিনি সৌন্দর্য-রূপ-রস ইত্যাদি বিষয়ে যেসব উক্তি বা মন্তব্য করেছেন, সেগুলোর সঙ্গে তাঁর সার্বিক অবস্থানের সম্পূর্ণ সংহতি অনুপস্থিত, সেগুলোর একটি হ্রস্ব তালিকা করলে আমরা দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তায় একটি সামূহিক দর্শনের পাশাপাশি দেশ-কাল-পাত্র নির্ভর কিছু চিন্তা এসেও উপস্থিত হয়, যাদের আমরা গুরুত্ব না দিয়ে পারি না। যেমনঃ

– “প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্জনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিস, প্রকৃতির জিনিস নয়।”

– “যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ, তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ, উহাও আর্টের বিষয়।”

– শিল্পী ও তার শিল্পের মধ্যে এক ধরনের detachment থাকা প্রয়োজন।

এ তালিকাটিও দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের তেমন উনিশ-বিশ হয় না। বক্তব্যটি এ যে, রবীন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁর (প্রধানত) উনিশ শতকি ঐতিহ্যে ও ভাববাদী রসবাদী ধারায় চিন্তাগুলো সূত্রবদ্ধ করতেন, তাঁর ভিতরের আধুনিক একজন শিল্পী তার কোনো কোনো অংশকে বাস্তবতার নিরিখে মেলাবার প্রয়াস পেতেন এবং এ প্রয়াস থেকেই প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাকে, ভীষণত্বকে মানুষের মনের, যাকে বলে objective correlative হিসেবে বিচার করেছেন, অসুন্দরের প্রতি মনের সহজ আনন্দকে আর্টের বিষয় ভেবেছেন অথবা শিল্পীকে অ-রোমান্টিক detachment-এর দূরত্বে স্থাপন করেছেন।

একটু আগে বলা থিওরিটি আরেকবার প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ এসব মুহূর্তে সুন্দরের অর্থ জগতের মধ্য থেকেই শুধু উদ্ধার করেননি, করেছেন তার গ্রন্থ থেকেও অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় ও ব্যক্তিগত রূপ থেকে, যেখানে জগতের অর্থই প্রধান, সেখানে নন্দনতত্ত্ববিদের উদ্বেগটিই প্রধান– যে উদ্বেগটি, বার্থের ভাষায়, অর্থপূর্ণ হওয়ার উদ্বেগ। আমরা এও লক্ষ করি, এসব উদ্বেগের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ জগতের– অর্থাৎ তাঁর ঐতিহ্যের, জ্ঞানের সামষ্টিক ভাণ্ডারে অর্থ অন্বেষণ করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর সাহিত্যে সংগীতে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটান, তিনি একটি ভিন্ন মেজাজের নান্দনিকতার জন্ম দেন। সেটি অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক এবং উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* : গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি কাজে শিলাইদহ, শাহাজাদপুর ও পতিসরে বিস্তীর্ণ জনপথে ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে ওই জায়গাগুলোর বিবরণ, প্রকৃতি ও জনজীবনের বর্ণনা বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ এবং সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অভিমত জানিয়ে অনেকগুলো চিঠি লেখেন। এ চিঠিগুলোর সংকলন নিয়ে ১৯১২ সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। 'ছিন্নপত্র'-এর মোট ১৫৩টি চিঠির মধ্যে শুধু প্রথম আটটি চিঠি শ্রীশীষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। ওই আটটি চিঠিতে বর্ষার বর্ণনা আছে, সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শক্তি সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য আছে, উদার প্রকৃতির বর্ণনা এবং উদার প্রকৃতির বিপরীতে শহরের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে মন্তব্য আছে; কবিতা ও কবিতার শৈলী এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁর চিন্তাভাবনা আছে। চিঠিগুলোতে প্রকৃতির বিশালতার পাশাপাশি মানুষের জীবনের অনুদার প্রকাশগুলোকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন এবং এটি করতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুকের আশ্রয় নেন। ইন্দিরা দেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্র'র বাকি চিঠিগুলোতেও এ বিষয়াবলির বর্ণনার এ মূল সুরটি এবং প্রকৃতি ও জীবন, গ্রামের নিসর্গ এবং শহরের নানা সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বজায় থাকে। তবে এ চিঠিগুলোতে তিনি অনেক বেশি সহজ, অন্তরঙ্গ ও স্পষ্টদর্শী।

১৯৩৮ সালে 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্রে 'পত্রধারা' শিরোনামে প্রকাশিত হলে তাতে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লেখেন, তাতে এ অন্তরঙ্গ অবলোকন ও প্রকাশের বিষয়টি চিহ্নিত; "পত্রধারার 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলো ছাপানো হয়েছে, তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠি থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লিতে পল্লিতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম-দৃশ্যের নানা নতুন নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা শোনার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক-কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। [যে বধুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড় হাটে চালান করবার উদ্যেগে করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারদিকের বিশ্বের সাথে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউডস্পিকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা যায় না।] ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য বাংলার পল্লিতে ঘুরে বেড়ানো একজন শহুরে মানুষের এবং জমিদারি কাজে এসে অকাজের আনন্দের সন্ধানে নেমে পড়া একজন মানুষের, একই সঙ্গে এ মন্তব্যে বিশ্বের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়া একজন মানুষের সহজতর অভিপ্রায় এবং ভিড় ও ভিড়ের আড়ালে একটুখানি নিরিবিলির সন্ধান মূর্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত 'ছিন্নপত্র'র বেশিরভাগ চিঠিতে এ বৈপরীত্য জীবনের এ দ্বিবিধ প্রকাশ প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে তাঁর হাউজবোটে বসে নির্জন প্রকৃতি দেখেন, তাঁর মনে পড়ে কলকাতার ঘড়ি-বাঁধা জীবনের অসারতা, যখন তিনি গ্রামবাংলার মানুষের সহজ জীবনে চোখ রাখেন, তখন শহুরে জীবনের আবরণ জটিলতার বিষয়টি প্রকট হয়ে ধরা পড়ে; যখন বাংলাদেশের হৃদয়ে দৃষ্টি ফেলেন, ইংরেজ কোন রাজপুরুষের উদ্ধত আচরণ ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। কলকাতায় থাকলে যে বিষয়গুলো স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়, শিলাইদহ বা শাহজাদপুরের নিসর্গে সেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে প্রবল যে দ্বৈততা এ চিঠিগুলোতে দেখা যায় তা

জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরের দুটি সত্তার মধ্যে। একটি চিঠি তিনি লেখেন, "ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে এক অংশ গৃহস্থ এবং আর এক অংশ সন্ন্যাসী; কেউবা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুটি ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াতে ইচ্ছে করে, আবার উদভ্রান্ত শান্ত মন একটি নীড়ের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে...আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্তভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করে' (পত্র-৬৯)।

এ চিঠিটি বালিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেন ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ সালে। তাঁর বয়স তখন ৪২। তাঁর সাহিত্য কৃতী তখন সর্বজনবিদিত, কিন্তু তা সীমিত বাংলাদেশের ভিতরে। তখনও তিনি বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হননি। তিনি দেশে-বিদেশে মানুষের কৌতূহল অথবা অনুসন্ধানের পাত্রও হয়ে ওঠেননি, তার কাঁধে অনেক বড় বড় দায়ভারও বর্তায়নি।

তারপরও তিনি জগৎ সঙ্গে নিজের সঙ্গোপন জীবনের একটি বিবাদ টের পান, জগতের কঠিন পথে চলতে চলতে হাঁপিয়ে উঠেন, 'মনকে শান্ত করার জন্য' একটি কোণের সন্ধান করেন। জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ দ্বন্দ্বটি অবশ্য সাময়িক কোনো বিষয় ছিল না—এমন নয় যে, শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের নিসর্গে বসেই তিনি সেই দ্বন্দ্বটি অনুভব করেন। বরং এ দ্বন্দ্বটি একটি স্থায়ী রূপ নিয়ে হাজির ছিল তাঁর সারা জীবনেই। এবং প্রকাশ কখনো নমিত ছিল, দু'এক স্থানে ছিল উচ্চকিত– যখন রাজনীতির নানা বিষয়ে তাঁকে অবস্থান নেওয়ার জন্য ডাক আসত, অথবা যখন পরাধীন ভারতের কোনো দুর্ভাগ্যে বিষয়ে তাঁকে কথা বলতে হতো। কিন্তু বাহির ও ভিতর, জগৎ ও গৃহকোণের দ্বন্দ্বটি তাঁর সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। নিজের ভিতর গৃহী ও সন্ন্যাসীর যে দ্বৈততার কথা তিনি উল্লেখ করেন, তারও

অনেক রূপ তাঁর লেখালেখিতে তাঁর চিত্রকলায়, তাঁর সংগীতে প্রতিফলিত। 'ছিন্নপত্র'র চিঠিগুলোতে এর উল্লেখ অথবা আভাস আছে। অনেক ক্ষেত্রেই গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদটি তিনি অসমাপ্ত রেখে দেন– এর সমাপ্তি যে তিনি প্রত্যাশা করেন, তা-ও মনে হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে একটি সাময়িক বোঝাপড়া করতে তাঁকে দেখা যায়। অনেক সময় তাঁর এ বিবাদ বা দ্বন্দ্বের বিষয়টি তিনি অবতারণা করেন কৌতুকের আবরণে, যখন জগৎ ও পরিপার্শ্বের বস্তুগত দাবিগুলোকে তিনি বড় হয়ে উঠতে দেখেন; অনেক সময় এর প্রকাশ অন্তরঙ্গ ও সংহত, যখন এর অনিবার্যতা এবং এর পিছনের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিগুলো তাঁকে নাড়া দেয়।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর যে বিপরীতমুখি অবস্থানকে ৬৯ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেন, তার আরও প্রকাশ অন্যান্য চিঠিতে দেখা যায়। এর একটি কেজো মানুষ বনাম অকাজে আনন্দ খোঁজা মানুষের, আরেকটি শহরের ব্যস্তজীবনে সমর্পিত মানুষ বনাম পল্লির তাড়াহীন, ঘটনাবিরল জীবনে ঘুরে বেড়ানো মানুষের। বাইরে এ দ্বন্দ্বের মূল ভাবনাটি বিস্তৃত করলে আমরা পাব বাস্তব ও পরাবাস্তব, মানুষ ও যন্ত্র, অসীম ও সসীম, জীবনবোধ ও মৃত্যুচিন্তা, ইহলোক ও পরলোক, বিশ্বসাহিত্য ও আমাদের লোকশিল্প, কবি ও সমালোচক, শিল্পের নান্দনিকতা ও উদ্ভটের তত্ত্ব, শব্দ ও নৈঃশব্দ, সময় ও সময়হীনতা, কুঁড়েমি ও কর্মপটুতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা। শহর ও মফস্বলের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। এ চিন্তাটিই নানাভাবে তাঁর সবগুলো চিঠিতে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু মফস্বলের মানুষ তিনি নন, তিনি জগতের পথিক। তাঁর পক্ষে তাই মফস্বলের পরিপূর্ণ শান্তি একটি আক্ষেপেরই বিষয়।

এ আক্ষেপের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে বেশকিছু সরল অবলোকনও যুক্ত হয়েছে। ৫৩ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম, তা হলে হয়তো মনে করতুম, জীবন নশ্বর,

অত এবং প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয় তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলো আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, এর সমস্যা গ্রহণ করতে পারছিনে... ।" সাধু প্রকৃতির মানুষ বলতে রবীন্দ্রনাথ যাকে বুঝিয়েছেন সে আসলে জীবনের পরকালের জন্য একটি প্রস্তুতি হিসেবে দেখে; যে প্রতিদিনের কাজ সম্পূর্ণ করে, আবার পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সাধুতাকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ধর্মচিন্তার বিমূর্ততার বিষয়টি ছিল না; বরং ধর্মকে তিনি মঙ্গল এবং মানবিকতার একটি প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। এ ধর্মচিন্তা, এ ভিন্ন সাধুতা তাঁকে জগতের আনন্দযজ্ঞে নিয়ত নিমন্ত্রণ জানাত। এ সমস্ত রস, এই আলো এবং ছায়ায়-এ চিঠিতে তিনি লিখেন, "এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এ দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কী কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা। আর, আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না।'

রবীন্দ্রনাথের কাছে জগতে আনন্দযজ্ঞে শামিল হওয়ার বিষয়টি সাধু চরিত্রের নয়। এটি বস্তুশাসিত জগতের হিসাবে বাঁধা গৃহীর নয়, এটি ভ্রমণপিয়াসু সন্ন্যাসীর। এ যদি হয় তাহলে আমরা যে সাধু-সন্ন্যাসী কথাটি বলি, তা কি বিপরীতার্থক শব্দযুগল হয়ে গেল, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Oxymoronic? আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হলেও একটি গূঢ়ার্থে; 'ছিন্নপত্র'-তে এবং রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক লেখালেখি (এবং তাঁর চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিতে) সাধু ও সন্ন্যাসীতে একটি ফারাক ছিল বটে। কিন্তু সেই ফারাক বৃহত্তর এক অধিবিদ্যায় অর্থে মোচনীয়ও ছিল। সাধু বলতে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, তিনি নিয়ম ও নৈতিকতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনে সমর্পিত একজন মানুষ। ধর্মীয় অনুশাসন বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন আচার- আচরণকে পরকালে পুরস্কারের আশায় হরিনাম জপ অথবা সৎকর্মকে। এ আচরণকে তিনি খাটো করেননি, কটাক্ষ করেননি, বরং তিনি সাধু নন, এ কথা বলেছেন এ উপলব্ধি থেকে যে, যেকোনো ধরনের অনুশাসনই চিত্তকে নিয়মনিষ্ঠ

করে, তার মুক্ত বিচরণ রুদ্ধ করে দেয়। সাধুর বিপরীতে নিজেকে তিনি অসাধু বলেননি, যেহেতু সাধু শব্দটি তাঁর ব্যবহারে নেতিবাচক নয়। এর ইতিবাচক দিকগুলোতে আছে সৎকাজ এবং ঈশ্বর চেতনা, এ সাধু চরিত্রের মানুষকে তিনি দেখতে পান শহরে, লোকালয়ে, মন্দিরে। গ্রামের বিস্তীর্ণ নিসর্গে তাদের তিনি আপন বলে ভাবতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম শুধু অভ্যাসের বিষয় ছিল না, ছিল আরও গভীর সংযোগের একটি বিষয়। 'ছিন্নপত্র'র ১৪৯ সংখ্যা পত্রে তিনি লেখেন, আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। ধর্ম তাহলে কি এরকম একটি প্রশ্ন মাথাই রেখেই হয়তো তিনি অন্য একটি পত্রে বলেন, "আমাদের প্রীতি মাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি' (পত্র-১১৫), ছিন্নপত্র-এর প্রায় প্রতিটি পত্রে প্রকৃতির যে আনন্দঘন উদ্‌যাপন আমরা দেখি, তাই ওই নিখিল জগতের মর্মোস্থিত আনন্দের একটি উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন– ধর্ম যদি মঙ্গলময় হয়, তবে ধর্মতন্ত্র হয় মানুষকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে তার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নেওয়ার একটি উপায়। ধর্মতন্ত্রকে তিনি অপছন্দ করেছেন। প্রকৃতিতে ধর্ম আছে, ধর্মতন্ত্র নেই। তবে শহরেও ধর্মতন্ত্রের প্রকাশগুলোকে নিসর্গ অধীনস্ত করে। 'ছিন্নপত্র'র ২৬ সংখ্যক পত্রে তিনি কলকাতার কোনো গির্জাচূড়ায় চাঁদের আলোর বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন। আরেকটি পত্রে তিনি লিখেছেন, "এখানে রাত্রে কোনো গির্জার ঘণ্টা বাজে না এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবা মাত্রই সন্ধ্যার পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়।" ৪৯ সংখ্যক এ পত্রটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বোলপুর থেকে এবং গির্জার ঘণ্টার সঙ্গে জাগতিক সময়ের একটি হিসাবকে তিনি প্রকৃতির সময়হীন, নিঃশব্দ আবর্তনের বিপরীতে দেখেছেন।

সাধু মানুষ জগতের সময়ের হিসেবে নিজের ভিতরের একান্ত তাগিদগুলো দেখেন। একজন সন্ন্যাসী সেই সময়ের হিসেবের বাইরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন, তিনি চিরকাল সন্ন্যাসী নন, যেমন তিনি চিরকাল গৃহী নন, শহর থেকে গ্রামীণ নিসর্গে পা রাখলেই তিনি সাধু চরিত্রের বাইরে চলে যান। কিন্তু শহরের ভিতরে তাকেও সাধু চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। 'ছিন্নপত্রে' তার এ দ্বিবিধ অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। 'ছিন্নপত্রে' তিনি প্রধানত গৃহী নন, সাধু নন, তিনি প্রধানত সন্ন্যাসী। কিন্তু এ সন্ন্যাসীও কোনো ধ্যানমগ্ন, সাত্ত্বিক পুরুষ নন, যিনি চারদিকের পৃথিবী থেকে একটি দূরত্বে নিজেকে স্থাপন করে নিজের মধ্যে বিশ্বাত্মার সন্ধান করেন। এ সন্ন্যাসী বরং নিসর্গ থেকে নিসর্গে ঘুরে বেড়ানো একজন অনুসন্ধানী অভিযাত্রী। এ সন্ন্যাসী অনুসন্ধান করেন পূর্ণতার, সামূহিকতার, অসীরে, অরূপের এবং এ অনুসন্ধান বাস্তবিকভাবেই এটি অপূর্ণ অভিযাত্রা হয়ে দাঁনোতে তার অভিযাত্রায় যতি টানা সম্ভব হয় না। এজন্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে আছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর এ সন্ন্যাসী তার ধ্যানমগ্নতায় কখনো নিজেকে অস্বীকার করেন না, বরং নিজের মধ্য দিয়ে জগৎকে দেখার তার অভিপ্রায়টি প্রবল। 'আপনাকে এ জানা আমার ফুরাবে না,' রবীন্দ্রনাথ 'নববিতানের' একটি গানে লিখেছিলেন, "আর এ জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।" 'ছিন্নপত্র' সন্ন্যাসী সত্তার চোখ দিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেন, সেখানে নিজের একটি অবস্থানও চিহ্নিত করেন– মাঝে মাঝে তিনি কোনো ঘটনার সাক্ষী, অথবা পাত্র অথবা নেহাৎ অবলোকনকারী, কখনো যার চোখে ধরা পড়ে নিসর্গের রূপ যার বর্ণনায় ওঠে আসে এর শব্দ, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শময় প্রকাশ। অনেক চিঠিতে একই দৃশ্যকল্পের পৌনঃপুনিক বর্ণনা – সেই নদী, সেই দিগন্তবিস্তারী চর, সেই সন্ধ্যার অন্ধকার– কিন্তু প্রতিটি বর্ণনায় নতুন একটি আবেগ, নতুন একটি পুলক এবং উচ্ছ্বাস অনুভব করা যায়। আপনাকে এবং বিশ্বাত্মাকে জানা তাঁর কখনো ফুরোয়নি।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলো ভাবের সংযোগ রয়েছে 'ছিন্নপত্রে', যেমন রয়েছে– গৃহীর অনেক ভাবের সঙ্গে। সন্ন্যাসীর সেই প্রথাগত বৈরাগ্য ছিন্নপত্রে এক আকর্ষণীয় বিবাগী রূপ নেয়,

যা জগতের ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতাকে অস্বীকার করে বটে, কিন্তু প্রকৃতির একটি নিবিড়, স্থির কেন্দ্রের অভিমুখে যেতে আমাদের উৎসাহিত করে। ৬৬ সংখ্যক পত্রে এ বৈরাগ্য এবং আকর্ষণের যুগল রূপটি করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেন, "বাংলাদেশের ধূধূ জনহীন মাঠ এবং প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত–কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা। আমাদের এ আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহু দূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটা স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে যে, এ সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরের কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়। সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষা পরিপূর্ণ নীরবতা। এ বর্ণনায় কয়েকটি শব্দ ও পদ লক্ষণীয়, যেমন মৌন ম্লান, চিরবিরহ বিষাদ, পরিত্যক্ত, উদাস– যেগুলো যেকোনো বর্ণনায় নেতির একটি চিত্র তুলে ধরে; কিন্তু এখানে বিশাল শান্তি এবং কোমল রচনার পরিপ্রেক্ষিতে নেতির কোনো আবরণ তাদের ওপর পড়ে না। রং আমার সেই Oxymoron ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতায় এসে অর্থবহ হয়। আমরা বুঝতে পারি, সন্ন্যাসীর কাজ খণ্ডকে অখণ্ডে মেলানো, অকারণ কোলাহল ও কলরবকে সংগীতে সংগত করা, নেতিকে ইতির দিকে নিয়ে আসা। তাই ঔদাস্য ও বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর বর্ণনাসূচক সেগুলো হয়ে দাঁড়ায় কোমল করুণা। যে বৈরাগ্য সাধনকে মুক্তি বলতে মানতে রাজি ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। যে বৈরাগ্য 'ছিন্নপত্র'র সন্ন্যাসীর চরিত্রসূত্র নয়, বরং যে বৈরাগ্য এক নিবিষ্টচিত্ততা স্থির হয়ে জগতের সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নেওয়ার শক্তি, যে বৈরাগ্য; বিপরীতে গৃহীর পরিচয় তার খণ্ডের প্রতি সসীমের প্রতি। ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা সময়ের প্রতি আকর্ষণ। যদিও নিজের ভিতরের একটি অঙ্কে রবীন্দ্রনাথ গৃহী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, গৃহীকে তিনি কণার চোখে দেখেছেন এবং আরও করুণার চোখে দেখেছেন গৃহীদের আবাসমূল লোকালয় ও শহরগুলোকে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অনেক জায়গাতেই শহরের অবস্থানটি প্রশ্নবিদ্ধ, কিন্তু 'ছিন্নপত্র'র মতো আর কোথাও এত তীব্র শ্লেষের নিচে এগুলো হয়তো পড়েনি। এবং এটি এ কারণে যে,

'ছিন্নপত্রে' তিনি যে সন্ন্যাসীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তার সঙ্গে গৃহীর একটি নিরন্তর প্রতি তুলনা স্থাপন করে যাওয়া এ পত্রগুলো একা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল এবং গৃহীর প্রসঙ্গে গৃহ এবং লোকালয় অবধারিতভাবেই উপস্থাপিত। ৫৩ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেওয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এর যে ফুলের গাছে এক একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি, সেই আশ্চর্য। এ স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্‌কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে।" আবার ১১৯ সংখ্যক পত্রে নিজের গৃহীসত্তার নাজেহাল হওয়ার কথাটিও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। " ...আমার লেখার মাঝখানে তারই একটা উপদ্রব উপস্থিত হল, আমার মেঘের ইমারত উড়িয়ে দিল। এইসব ব্যাপারে আহারের সময় এসে পড়ল। দুপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক আর কিছুই নেই। আমরা বাঙ্গালিরা কষে মধ্যাহ্নভোজন করি বলেই মধ্যাহ্নটাকে হারাই। দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে, পান চিবোতে চিবোতে, পরিতৃপ্ত নিদ্রার আয়োজন হতে থাকে...... অথচ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন সুদূর প্রসারিত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন গভীরভাবে বৃহৎভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।"

গৃহী মানুষ নিতান্ত কেজো মানুষ, তার স্বস্তি সীমার গণ্ডিতে আটকে থাকায়, মেঘের ইমারত বানানো তার কাজ নয়। সন্ন্যাসী সীমাকে ডিঙিয়ে অসীমের পানে ছোটে, মেঘের ওপরে তার চোখ থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজের রোমান্টিক সত্তার মধ্যে ওই সন্ন্যাসীর সন্ধান পান, নিজের সৃজনশীল সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করেন সেই সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। রোমান্টিকতাকে অন্য অনেক বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন অরূপের এবং অসীমের সন্ধানে ব্যক্তির অন্তরঙ্গ আকুলতাকে 'আত্মচেতনার অনুভূতিকে 'সহজ দৃষ্টির আনন্দ' ইত্যাদি পরিচয়ে। রোমান্টিকতার প্রকাশে কোথাও রুদ্ধতা নেই,

বাস্তবের অকারণ হস্তক্ষেপ নেই—এর পুরোটাই সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। এ অর্থে সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন রোমান্টিকের সাদৃশ্য। যদিও সন্ন্যাসীর সৌন্দর্যবোধে ভিন্ন একটি মাত্রার যোগান দেয় তার পরমাত্মার অন্বেষণ। কিন্তু সেই অন্বেষণের প্রকাশে জটিলতা নেই, বাধাবন্ধন নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন ঘরে বসেই বাইরের পরিব্যাপ্ত পৃথিবীকে দেখতে ব্যাকুল থাকতেন, ঠিক একই পরিমাণ ব্যাকুলতা থাকত তাঁর ভ্রমণের প্রতি। তাঁর বিশ্বভ্রমণের অনেক বৃত্তান্তই তিনি লিখেছেন – "'ছিন্নপত্র'র চিঠিগুলো লেখার আগে তিনি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' লিখেছেন (১৮৮১), পরে লিখেছেন, 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (প্রথম অংশ ১৮৯১, দ্বিতীয় অংশ ১৮৯৩), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১) এবং 'জাপানে-পারস্যে' (১৯৩৬) কিন্তু 'ছিন্নপত্র' ছিল তাঁর একান্তই বাংলাদেশের হৃদয়দর্শন। অন্য ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলোতে তিনি কোনো সন্ন্যাসীর পদাঙ্ক ধরে এগোননি, বরং এক গৃহী মানুষের কর্মোদ্যোগী পৃথিবীতে অথবা পারস্যের ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস আশ্রিত, ভূগোল পদচারণা, যদিও গৃহী মানুষটি তাঁর ভিতরে যেন এক সঙ্গোপন সন্ন্যাসীকে নিয়ে বুঝেননি তা নয়, তবে সে সন্ন্যাসী তাঁকে পথ দেখাতে আগ্রহী হননি। 'ছিন্নপত্র'র ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্পর্কে ১২৭ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি মস্ত সুবিধা এ যে, তার মধ্যে অবিশ্রান্ত গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটা অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি বড় রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক কিংবা দুটো— একটা গরুর গাড়ি মন্থর গানে চলতে থাকে, তার বড়ো একটা টান আছে। মাঠ তাতে আরও যেন ধূ ধূ করে ওঠে, মনে হয় এ মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে, তার কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এ মানসিক নিরারম্বার মধ্যে সেই-রকম একটি গতি প্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে; তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরও যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি।" [যে ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ এ মন্তব্যটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সেটি তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কীয়, লেখকের নামটি তিনি উল্লেখ

করেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের বহির্বিশ্বের সব ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে এ মন্তব্যটি খাটে না। শুধু জাপানে-পারস্যে তিনি গন্তব্য ধরে ধরে ভ্রমণে বেরোননি। তারপরও যে দেশীয় উৎপ্রেক্ষা তিনি ভ্রমণকাহিনীর আকর্ষণকে বর্ণনা করেন– সেই রাঙাপথ দিয়ে দেহাতী মানুষ বা গরুগুলোর গন্তব্যহীন হেঁটে যাওয়া– তা 'ছিন্নপত্র' ছাড়া আর কোথাও প্রযোজ্য হয় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের প্লটহীনতা ও অবারিত স্বাধীনতার বিষয়টি শহরের বাইরে বলে তাঁর মনে পড়ে এবং এ রাঙামাটি আর ধূধূ করে ওঠা মাঠের সঙ্গে সম্পর্ক সন্ন্যাসীর আন্তরাষ্ট্রীয় কোনো পরিব্রাজকের নয়। 'ছিন্নপত্রের' এ চিঠিটি একান্তভাবেই তাঁর বহুদর্শনের অভিজ্ঞতা, সজ্ঞাত।]

প্লটের কথায় তাহলে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি প্লটহীন ভ্রমণবৃত্তান্ত অবারিত স্বাধীনতার আনন্দ তাঁকে দিয়ে থাকে, তাহলে প্লটকেন্দ্রিক উপন্যাস, নাটক অথবা ছোটগল্প তাঁকে কি সেই আনন্দ দেয়নি? এ প্রশ্নটি কেউ রবীন্দ্রনাথকে করেছেন কিনা জানি না এবং এর উত্তরে তিনি কী বলেছেন তাও অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর সব ভ্রমণবৃত্তান্ত প্লটহীন নয়। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' অথবা 'রাশিয়ার চিঠি'তে প্লট নেই, এমন বলা যাবে না। এ প্লট কোনো উপন্যাসের প্লট নয়, যা গল্পের ভিতরে গাঁথুনি দিয়ে যায়; বরং প্লট বলতে এখানে গল্পের বর্ণনার/আখ্যানের এগিয়ে যাওয়ার পথরেখাকে বোঝানো হয়েছে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে যেমন সেই পথরেখা রুশ বিপ্লবের পর রুশ সমাজের জীবনে যে উন্নতি এবং মানবোন্নয়নের উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল, তার স্বরূপ অনুধাবন ও তার প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলো মোটেও ঢিলেঢালা নয়, বরং তাদের একটি গতিশীল কাঠামো আছে, একটা গন্তব্যও আছে এবং চিন্তার, ভাবনার, অনুধাবনের পর্যবেক্ষণের। শুধু 'ছিন্নপত্রের' চিঠিগুলোর কোনো গন্তব্য নেই। একই দৃশ্যকে তার উল্টেপাল্টে দেখে, একই ভাবনাকে নানাভাবে বিকশিত করে। যদিও প্রতিটি বলায় নতুন করে দৃশ্যপট সূচিত হয়, তার আলো-অন্ধকারে উনিশ-বিশ হয়। এর কারণ এ চিঠিগুলো একজন পথের ভালোবাসায় পথে নামা পথিকের, একজন সন্ন্যাসীর। 'ছিন্নপত্রের' যে আনন্দ, তা প্লটপ্রধান অন্য রচনার নয়, তাঁর উপন্যাসের

ছোটগল্পের নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্বাধীনতার যোগান দেয় ভিন্ন কল্পনা, সাহিত্যের ভিন্ন উপলব্ধি এবং সূত্র। সেই স্বাধীনতার রূপ ভিন্ন। 'ছিন্নপত্রের' আনন্দ এক দেহাতী মানুষের, অগৃহী মানুষের গন্তব্যহীন যাত্রায় অকারণ হারিয়ে যাওয়ার।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর যে বিবাদ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে গৃহীর ও সন্ন্যাসীর ছবি আঁকতে উৎসাহিত করেছে, সে অনুযায়ী একদিকে ঘরের ভিতরে দরজা জানালা বন্ধ করে পড়ে থাকা মানুষকে বলা হচ্ছে গৃহী, আর ঘরছাড়া মানুষকে সন্ন্যাসী। কিন্তু আগেই যেমন বলা হয়ে, সে শুধু শহরের বেলায়। পল্লিগ্রামের নিকটে এসে ঘরের মানুষের ভাবগুলোকেও গৃহীর বলে শনাক্ত করা যায় না। যেমন: বালিগ্রাম থেকে লেখা ১৫ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ অনেক কাজে ব্যস্ত মানুষের ছবিও যখন আঁকেন, তখনও যেন সে মানুষগুলোকে কাজের অধীনে চলে যাওয়া বলে মনে হয় না। যে জেলেরা জাল ফেলে, যে লোকটি দড়ি পাকায়, তারা যেন কাজগুলো করে নেহাৎ একটি অভ্যাস থেকে। 'ঠিক সময়মতো খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহু দিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়', রবীন্দ্রনাথ লিখেন। সময়মতো খাওয়া শুধু একটি চর্চা নয়, একটি কুসংস্কারও বটে। তাহলে কি খাদ্যগ্রহণের নিয়ম থাকতে নেই? রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন না, রবং স্বাস্থ্যবিধির বাইরে গিয়ে নিয়ম ভাঙতে প্রচুর উৎসাহবোধ করেন। কালিগ্রামে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার মানুষ নন, তাঁর সখ্য সেই ছোট নদীর সঙ্গে যার "কানাকড়ি স্রোত নেই' এবং যে 'আপন শৈবালদের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গবিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভাবেন, 'নাইলেও চলে, না নাইলেও চলে' এবং এ আলস্যের মধ্যে একটা আলাদা মাহাত্ম্য এবং আনন্দ তিনি পান। এটি কোনো গৃহীর বোধ নয়, যেমন নয় 'দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোকের খালি গায়ে বসে অকারণে রবীন্দ্রনাথের বোটের দিকে তাকিয়ে থাকা। জগতের কর্মব্যস্ততার অন্তরালে এ আলস্যের খোঁজ পাওয়াটা রবীন্দ্রনাথের কাছে এক সন্ন্যাসীর এপিফ্যানি বা হঠাৎ দিকদর্শনের মতো। এর বর্ণনা তিনি অনেক চিঠিতে দীর্ঘ আয়োজনে দেন। [এই চিঠিতেই তিনি লিখেন, 'ডাঙার উপরে নানান রকমের

লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্রনাথ বলেন বটে অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, অর্থটা শুধু মানুষের অকাজে নয়, প্রকৃতির অকাজেও খুঁজতে হয়, কারণ মানুষ ও প্রকৃতি যেখানে একাকার, সেখানে শহর এবং হাটবাজারের নিয়মগুলো খাটে না। সেখানে গন্তব্যহীনতাই আনন্দের। সেজন্য জলের নিচে ক্ষণে ক্ষণে মাথা ঢোকানো পাঁতিহাসগুলোর মধ্যেও এ আনন্দিত নিস্পৃহতা তিনি দেখতে পান এবং অবশ্যই প্রকৃতির মধ্যেও। 'এখানকার দিনগুলো' তিনি লিখেন 'এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায় এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। প্রকৃতির মধ্যে কোন তাড়া নেই, কাজের নাভিশ্বাস ওঠা নেই–আছে শুধু যতির আনন্দ এবং নিরাবেগ ও নিস্পৃহ অনুভবের পুলক। যেসব মানুষের মধ্যে এসব তিনি দেখেন, তাদের তিনি সন্ন্যাসীর স্থান দেন, তারা গৃহীর ভূমিকায় সমান্তরাল একটি অভিনয় করে গেলেও।]

গৃহীর সঙ্গে যন্ত্রের একটি সম্পর্ক অনায়াসে নির্মিত হয় 'ছিন্নপত্রে' যেমন মানুষের অস্থির কর্মকাণ্ডের সাথে এবং অনেক চিঠিতে এর বিবরণ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে রাখেন। ছিন্নপত্র খুব কম সংখ্যক পত্রই শহর থেকে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ– হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। কিন্তু যখনই লেখেন, বোঝা যায়, গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যকার বিবাদটি একটি পরিচিত রূপ পাবে। পায়ও। যেমন ১১ সংখ্যক পত্রে। খুবই আলাদা এ পত্রের শৈলী– বলা যায় একধরনের অভিব্যক্তি বাদী Impressionistic– ভাষায় এটি লেখা। ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর একটি বর্ণনা আছে চিঠিটাতে এবং ট্রেন যেহেতু একটি যন্ত্র, অথচ এটি যায় আখের ক্ষেত, গ্রামীণ নিসর্গ এবং মাথায় মেঘ জমা পাহাড়ের পাশ দিয়ে। পৌঁছে গিয়ে এক কোলাহলপূর্ণ নগরে, এ কাঠামোতে বৈপরীত্যের একটি টান থাকে, কিন্তু ট্রেনের গতিকে ভাষায় মেলাতে গিয়ে ভাষার চলনটাই হয়ে যায় দ্রুত, একটি চলচ্চিত্রের মতো একটি একটি করে দৃশ্যপট ভেসে ওঠে, মিলিয়ে

যায়, আবার ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু চিঠিটা পড়ে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রের বিপরীতে মানুষের, স্থবিরতার বিপরীতে ক্ষমতার, অস্থির কাজের বিপরীতে তাড়াহীন একটি বোধের দ্বন্দ্বকে স্পন্দমান করে তোলা।.....হুঁশ করে গাড়ি চলে গেল, আখের ক্ষেত মিলিয়ে গেল–বাস্ সমস্ত ফুরলো– কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের ছোট-বড় দু- চারটে তাও প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল', তিনি লিখেন, 'কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন লোক কোথায় কীভাবে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই... ।' যন্ত্র মানুষের মনকে আমলে আনে না– এ বক্তব্যটি যদি এ উদ্ধৃতির মূল চিন্তা হয়, তাহলে যন্ত্রশাসিত সভ্যতার মনে অবদমন অনিবার্য। এ উদ্বেগটি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন- তাঁর নাটক 'মুক্তধারা'-ই এখানে অন্যসব উদাহরণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয়, যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে সমর্পিত মানুষের জীবনেও যে যান্ত্রিকতার প্রকাশ ঘটতে থাকে তার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিখেন ক্রিয়াপদের ক্রমাগত এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহারে। 'অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে– দূর থেকে গাড়ির নিদ্রাহীন লাল চক্ষু দেখা গেল; ধরণী থর থর করে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটি জুতো, ঘুণ্টি দেওয়া চাপচান এবং টিকির উপরে তকমা দেওয়া গোল টুপি পরে নানার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিপুল হাত-ল্যাণ্ঠন চারদিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল। খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিসপত্র আগলে দাঁড়াল, বেঘুমোতে লাগল। গাড়িতে ওঠা গেল.....অথচ যাত্রাপথে একসময় যখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাইরে গেল এবং তিনি দেখলেন 'সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে', তখন তাঁর মনে হলো যেন– 'সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছে, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে সর্বাঙ্গে লাগছে..... ।' ক্রিয়াপদ-বহুল আগের বর্ণনায় বাক্যগুলো হ্রস্ব, যেন কেউ কেটেছেঁটে তাদের ছোট করে দিয়েছে; অথচ সময়ের বর্ণনায় বাক্য দীর্ঘ, ক্রিয়াপদের উপস্থিতিও প্রকট নয়। বস্তুত প্রকৃতির বর্ণনায় দীর্ঘ বাক্যেরই প্রাধান্য 'ছিন্নপত্রে', দিনযাপনের প্রাত্যহিকতায় যা মোটেও নয়।

গৃহীর অনুভব প্রয়োজনীয়ভাবেই খণ্ডিত, সন্ন্যাসীর পূর্ণতর। এ দ্বন্দ্ব বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তব বা পরবাস্তবের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। গৃহীর জীবন বাস্তব সমর্পিত, সন্ন্যাসীর বাস্তবের ঊর্ধ্বে কোনো বাস্তব বা পরাবাস্তবে। 'ছিন্নপত্রে' প্রকট বাস্তবের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অল্পসময় ব্যয় করেন, যেহেতু বাস্তবের পৃথিবীর দৃশ্যপটে তিনি আগ্রহ নন। শিলাইদহ শাহজাদপুর, পতিসর বা বোলপুরের নিসর্গ যে বাস্তব নয় তা নয়, কিন্তু তাদের ভিতরের রূপ ও রহস্যের খেলার দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন নজর দেন, তার অনুভবটি আর সময়-কাল-স্থানের মাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকে না, তার ভিতরের একটি মাত্রা তখন খুলে যায়। এ গভীর মাত্রাটি গৃহী দেখতে পায় না, এটি দেখতে পায় সন্ন্যাসী। যেহেতু সন্ন্যাসীর দৃষ্টির সামনেই দৃশ্যমান পৃথিবীর ওপর থেকে প্রাত্যহিকতার পর্দাটি ওঠে যায়। সেই পর্দার পিছনের দৃশ্য দেখাটাই যেহেতু তার সাধনার বিষয়। পরাবাস্তবের প্রকৃষ্ট কোনো সংজ্ঞা, অন্তত 'ছিন্নপত্র'র বেলায় করা আমাদের সম্ভব হয় না, কিন্তু বাস্তবের দৃশ্যপটের ওপর যখন একটি অপরিচিত আলো পড়ে তার ভিতরে যখন একটি অতি দূরবর্তী বোধ, যা একই সঙ্গে পুলকের এবং রহস্যের খেলা করে, তখন চেনা দৃশ্যেরও এক অলৌকিক রূপান্তর ঘটে যায়– তখন খুব সাধারণ বস্তু বা ঘটনাও অসাধারণ, অপূর্ব এবং অপরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই পরাবাস্তবের প্রকাশ বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

১১৭ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জ্যোৎস্না রাত্রির একটি বিবরণ দেন। তাঁর বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে যখন প্রকৃতিতে চোখ মেলে দেন, তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃত ও অপ্রকৃত, কায়া ও মায়া একই সঙ্গে ভেসে ওঠে। 'জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম– সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে এবং এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না।' এ মুক্তি না পাওয়ার– অথবা না চাওয়ার বিষয়টিতে পরাবাস্তবের আকর্ষণটি লুকিয়ে থাকে। বাস্তবের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যতখানি মুক্তিকামী, পরাবাস্তবের বর্ণনায় ততটাই মুক্তি চাওয়ার

ব্যাপারে নিস্পৃহ। 'ছিন্নপত্র'র দু'এক চিঠিতে প্রকট বাস্তবের বর্ণনা আছে, যেমন শহরের রাস্তাঘাটের অথবা শহরের জীবনের। যেখানে বর্ণনার সুরটি সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাসমুক্ত, অথচ প্রকৃতি, বিশেষ করে গাঢ় দুপুরের অথবা সন্ধ্যার অথবা রাতের বর্ণনায় অসম্ভব উচ্ছ্বসিত। পতিসর থেকে একটি চিঠিতে (সংখ্যা-৯৮) রবীন্দ্রনাথ কলকাতার 'বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী' জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'নীরস মৃত দিন' এবং দিনগুলোকে 'টাঁকশাল থেকে তকতকে হয়ে কেটে বেরিয়ে' আসার তুলনা দেন; কিন্তু পতিসরে নিজেকে দলছাড়া বলে দাবি করেন এবং 'নিত্যনিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে' তার যে কোনো যোগ নেই, সে কথাও উল্লেখ করেন। বাস্তব খণ্ডিত, তার বর্ণনাও খণ্ডিত; বাস্তবের বাইরের পরাবাস্তব দৃশ্যপট অখণ্ড, সময়ও এখানে অখণ্ড, 'সময় কিংবা স্থানের মধ্যে' এখানে 'কোনো বাধা নেই'। কলকাতার গৃহী পতিসরে সন্ন্যাসীর চোখে, অনুভবে, পুলকে বাস্তবকে দেখেন বলে তার দৃশ্যপট পাল্টে যায়; শুধু নদী গাছপালা প্রান্তর হয়ে সেই দৃশ্য থমকে থাকে না, বরং এক অপরূপ এবং বর্ণনার অতীত সমগ্র হয়ে দাঁড়ায়।

গৃহীর জীবনচিন্তার অন্য পারে থাকে মৃত্যুচিন্তা এবং তাতে নেতির ভাবটাই থাকে প্রধান। গৃহীর চিন্তায় মৃত্যু ভীতির, বিচ্ছেদের, সমাপ্তির এবং গৃহী যখন সাধু-চরিত্রের হয়, তখন সেই সমাপ্তির অন্তে থাকে একটি পুরস্কৃত পরকালের সম্ভাবনা। কিন্তু সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে মৃত্যু একটি আবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতির নাম; মৃত্যু বিচ্ছেদ নয়, বরং এক অবস্থান থেকে অন্য একটি অবস্থানে রূপান্তরের একটি মাধ্যম মাত্র। পরকাল নিয়ে 'ছিন্নপত্রে' কোনো আলোচনা নেই, মৃত্যু নিয়ে যদিও আছে। কিন্তু সেখানেও একধরনের প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে তা পরিবেশিত। শিলাইদহ থেকে লেখা ৬৩ সংখ্যক পত্রে 'যমরাজের সঙ্গে' একটি 'হাউ-ডু-ডু' করে আসার উল্লেখ আছে– বিবরণ যদিও নেই। হয়তো কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া। কিন্তু মৃত্যুকে সামনে থেকে অনুভব করেও তিনি লিখেন, 'কাল চকিতের মতো যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আর তার মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না.... তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি, তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে,

তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁ-ই দিন– আমি আমার পাল তুলে চললুম।' মৃত্যুকে এভাবে অবহেলা করাটা, এ পরিহাসের সুরে তার শক্তিকে প্রায় তাচ্ছিল্য করা– এটি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা জাত নয়– এটি এক নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর চোখে মৃত্যুকে দেখা। যে মৃত্যুকে 'শ্যামসম' উল্লেখ করে কীটসীয় উচ্ছ্বাসে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৈকট্যের কথা লিখেছিলেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে, তা 'ছিন্নপত্রে' ভিন্ন একটি রূপ নিয়েছে। মৃত্যু কোনো মোহ নয়, মায়া নয়, অনিবার্যতা নয়। মৃত্যু জীবনচক্রের এক সমাপ্তির নাম, একে নিয়ে উচ্ছ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু সন্ন্যাসীর কাছে সেটি এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠে যাওয়ার জন্য একটি দরজা মাত্র এবং দরজার জন্য আবেগ অথবা ভীতিরও কোনো সুযোগ নেই।

'ছিন্নপত্রের' মৃত্যুচিন্তা অবশ্যই কোন গৃহীর নয়। এজন্য এর উল্লেখও দুটি অথবা তিনটি মাত্র চিঠিতে।

২.

গৃহী ও সন্ন্যাসীর যেসব ভাবের কথা উপরে আলোচিত হলো, সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু ভাবের প্রকাশ আমরা আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় শনাক্ত করতে পারি, তবে এগুলোর প্রকাশ একটু ভিন্ন এবং এজন্য প্রয়োজন ভিন্ন কিছু প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি ফেলা। নিসর্গ, নির্জনতা বাস্তব-অবাস্তব অথবা সময় সমন্বয়হীনতায় ভাবের প্রকাশগুলো আনুভূমিক– একটি অবস্থান থেকে অন্য একটি অবস্থানে সেগুলো সহজেই পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু জাগতিকতার মাত্রায় আমাদের সামনে আসা গৃহীর কিছু ভাব এবং এর বিপরীতে সন্ন্যাসীরও– আনুভূমিক নয়, উল্লম্ব, এ আনুভূমিক-উল্লম্ব দ্বিত্বতার বিষয়টি আমরা diachronic-synchronic অনুভূতির বিষয় হিসেবে দেখতে পারি, যেখানে diachronic একটি সময়কাল নিয়ে পরিব্যাপ্ত একটি বিষয়ের এবং synchronic একটি নির্দিষ্ট সময়কালে প্রকাশিত বিষয়ের বর্ণনা হয়ে দাঁড়ায়। 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ মানুষের ইতিহাস, নিসর্গ অথবা শিল্পের আলোচনায় একটি diacronic চেতনার প্রকাশ দেখিয়েছেন। এটি

সন্ন্যাসীর চেতনাও। এখানে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ ঘটে। এমনটি প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পেরও, যেমন ১১৯ সংখ্যক পত্রে তিনি জানাচ্ছেন, 'আমি লিখছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো-বাতাস ও শাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।' কিন্তু বিশেষ কোনো অবস্থার অথবা খণ্ডিত কোনো অনুভূতি অথবা অবলোকনের বর্ণনায় তিনি একটি স্থানিক ও সময় নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন। যেমন ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের অথবা কোনো উপচ্ছার বর্ণনায়। ৬৮ সংখ্যক পত্রে শহরের মানুষগুলোকে এরকম উপচ্ছায়া মনে হয়েছে তাঁর, 'খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মতো বকর বকর করছে।' এরকম বর্ণনায় সময় থমকে যায়, কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, অভিজ্ঞতা শুধু আজকের দিনের গণ্ডিতে আটকে থাকে। এ গতিহীনতা, এ সম্প্রসারহীনতা একজন গৃহীর জীবনের। এরই প্রকাশ ধরে এগুলো দেখা যাবে, একজন গৃহীর ভূমিকায় যখন নামেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি তাঁর বর্ণনাশৈলীতেও পরিবর্তন আনেন। তাঁর সপ্রাণ ছন্দিত এবং অন্তরঙ্গ বর্ণনাশৈলীতে উদ্ভটের ছায়া পড়ে। ৭০ সংখ্যক চিঠিতে তিনি এক ইংরেজ রাজপুরুষের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'এখানকার একটা উৎকট ইংরেজ, প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, একটা পূর্ণপরিণত জন্‌বৃষ।' উদ্ভট অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে, grotesque-এর এ ব্যবহার কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথ করেননি, করেছেন এজন্য যে, লোকটি ইচ্ছেমতো বাঙালির নৈতিকতার অভাব নিয়ে, জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে বাঙালির অজ্ঞানতা নিয়ে মন্তব্য করছিল। বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে এ ধরনের কথাবার্তা বলার মধ্যে যে মূঢ় ঔদ্ধত্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার প্রেক্ষাপটেই লোকটির বর্ণনায় ওই grotesque-এর আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে, তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে, পরাধীন ভারতবর্ষে এরকম হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ। লোকটি কথা বলছিল এবং রবীন্দ্রনাথ একটু দূরে বসে ভিন্ন একটি দৃশ্য দেখছিলেন তাঁর চোখের সামনে, "আমাদের এ গৌরবহীন বিষন্ন জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম– এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে

আর কী বলল।" চিঠির শুরুতে grotesque, শেষে তার বিদায়। এবং তার জায়গায় একটি বিষাদিত, কোমল বর্ণনা। পল্লি বাংলার এবং নদীর উপরের নিসর্গ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কখনো বিষাদক্লিষ্ট হন না, শুধু হন এ হঠাৎ এক উপলব্ধির– যে ভারতবর্ষ পরাধীন সামনে দাঁড়িয়ে। এবং উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো, খুব পুলকিত, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতি বর্ণনায় স্থান ভাবের কাছে কথা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য চিঠিতে 'সে আর কী বলব' বলে যেন তাঁর অপারগতা জানিয়ে একটা সমাপ্তি টানেন। কিন্তু এ চিঠিতে এ অপারগতার পিছনে আছে দুঃখ। আরেকটি চিঠিতে, ৭৫ সংখ্যক, যা আবারও কটক থেকে লেখা, রবীন্দ্রনাথ এক ইংরেজ সাহেবকে গান শুনিয়ে তালি পাওয়া এবং গান শুনে তালি দেওয়ার বিবরণ লিখেছেন। কিন্তু এত তালি-টালির পরও রবীন্দ্রনাথের মনে সেই পরাধীনতার চিন্তা, সেই বিমর্ষ ভাব। ইংরেজ লোকের 'করতালির নির্দেশমত' যখন আমরা আমাদের 'জীবনকে গঠিত করে থাকি' তখন 'তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি।' একই সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ইংরেজ সংস্কৃতিকে শিরোধার্য করার মধ্যেও তিনি একটি উপনিবেশী মানসিকতার সন্ধান পান। কিন্তু জন্‌বৃষ এবং গায়ক-শ্রোতা ইংরেজের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেসব অনুভূতি হলো, রাগ-বিষাদ-বিরক্তি হলো, সেগুলোতে তিনি তো দুই প্রান্তেই ছিলেন। তিনি জন্‌বৃষের সঙ্গে আপ্যায়ন ভাগ করেছেন, ইংরেজ গায়কের গান শুনে হাততালি দিয়েছেন, তার জন্য গানও গেয়েছেন, আবার কেন তার হাততালি নিয়ে আমরা পুলকিত হই, তারও সমালোচনা করেছেন। আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথ জন্‌বৃষের সঙ্গে তর্কে যাননি, গানের শ্রোতা ইংরেজের হাততালিকে আমলে আনেননি, কিন্তু এ দুই ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তির পিছনে একটি বৈষয়িক, একটি জাগতিক কারণ ছিল। হয়তো চাইলেও তিনি তাদের পরিহার করে বাড়িতে বসে থাকতে পারতেন না। যেভাবেই বিষয়টি দেখা হোক, এর ভিতরে একটি দ্বৈত অবস্থান গ্রহণের বিষয় আছে। এবং এ অবস্থানটি গৃহীর। এ গৃহী তাঁকে প্রায়শ হতেই হতো, না হলে চলত না। অথচ সন্ন্যাসীর জন্য ইংরেজ রাজপুরুষ দর্শনের প্রশ্ন ওঠে না, তার পথ জন্‌বৃষের সীমানা থেকে অনেক যোজন দূরে।

৩.

গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিষাদের অন্য একটি রূপ 'ছিন্নপত্রে' যেভাবে ধরা পড়েছে, তার প্রকাশ অনেকগুলো বছর পর, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে একটা অবয়ব নেয়। এবং সেই বিবাদ সাধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এক মানুষের। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় ছবি আঁকতেন, যেমন অনেক স্কুল-পড়ুয়া আঁকে, ড্রইং-এর ক্লাসে অথবা বাড়িতে। ছবি আঁকা নিয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল, কিন্তু সন্দেহও ছিল যে, এ বিদ্যায় কৃতী অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা। শাহজাদপুর থেকে লেখা ৯২ সংখ্যক পত্রে তাঁর সরল স্বীকারোক্তি, 'চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি– কিন্তু পাবার আশা নেই, সাধনা করার বয়স চলে গেছে।' বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যদিও বলেন, বয়স চলে গেছে, ষাটের পর জোরেশোরে তার চর্চা শুরু করেন, আর আঁকা ছবি নিয়ে প্রথম প্রদর্শনী করেন লতাপাতা ফুলের, জন্তু-জানোয়ার, পাখি ও নারল। এবং বেশ কয়েকটি আত্মপ্রতিকৃতি। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ যেন সচেতনভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর ছবিতে চিত্রময়তা নেই, দৃষ্টিকে কোনো দৃশ্যে বা দৃশ্যের গভীরে ছড়িয়ে দেওয়ার মুগ্ধ আমন্ত্রণ নেই। তাঁর ছবির স্টাইলে পশ্চিমা প্রকাশবাদীদের মতো চড়া রং, চড়া সুর, উচ্চকিত মেজাজ কোনো রোমান্টিক আচ্ছন্নতাকে সংহত হতে দেয় না। যে grotesque-এর কথা উপরে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'ছিন্নপত্র'র ৯৭ সংখ্যক পত্রে পতিসর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পোষা দুটি হাতির বর্ণনা দেন এবং লিখেন, একটি হাতির 'প্রকাণ্ডত্ব ও বিশ্রীত্বের জন্যই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়; এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়। এর আগে এক ভয়ঙ্কর এক তুফানে পড়ে যাওয়া তাঁর বোটের সঙ্গীন অবস্থার– বর্ণনায় তিনি 'শিকলি বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝটফট' করার উল্লেখ করেন। এ ত্রাহি অবস্থার পাখি, এ বিশ্রী জন্তু– এসব তাঁর চিত্রকলায় মূর্ত; তাঁর এক স্বপ্ন বর্ণনায় দেওয়া একটা কী তেল মেখে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গলা লম্বা হয়ে যাওয়ার আদলে আঁকা মানুষের/নারীর

ছবিগুলোতে তাঁর নিজস্ব স্টাইল। আর আত্মপ্রতিকৃতিতে তো রবীন্দ্রনাথ একেবারেই ভিন্ন মানুষ। তাঁর সেই সন্তসুলভ মুখমণ্ড পরিবর্তিত হয়ে এক অস্বস্তি জাগানো চেহারায় রূপ নেয়, এতটাই যে, প্যারিসের সেই প্রদর্শনীর আয়োজক কাউন্টেস নোয়াই মন্তব্য করেছিলেন, সন্তের চেহারার পিছনে এ কোন অশুভকে দেখছি? কাউন্টেস নোয়াই চিনতেন সাধু রবীন্দ্রনাথকে, অন্তত জগৎ যাকে সাধু বলে জানত। তিনি সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথকে হয়তো কখনো চেনেননি, চিনলে এ মন্তব্য তিনি করতেন না, কেননা আমরা তো জানি, আত্মপ্রতিকৃতিতে যে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত, তিনি 'ছিন্নপত্র'র সেই ঘর ছাড়া মানুষ, যার পথ নদীর চরের কিনারা দিয়ে, নয়তো গ্রামের ধূ ধূ মাঠের বুক চিরে, নয়তো রাঙ্গামাটির উপর দিয়ে তাঁকে প্রকৃতির ভিতরে নিয়ে গেছে এবং সেখানে তিনি সাধুর এবং গৃহীর আরোপিত পরিচয়গুলো খুলে এক মুক্ত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

৪.

'ছিন্নপত্রে' গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদের শেষপর্যন্ত কোনো স্থায়ী মিটমাট হয় না। আগেই বলা হয়েছে, এ দুই অবস্থানের ঘনঘন অদলবদল হয়েছে, কিন্তু তাঁর টান যে ছিল সন্ন্যাসীর অবস্থানের দিকে তা 'ছিন্নপত্রের' পাতায় পাতায় প্রকাশিত। 'ছিন্নপত্রের' শেষে চিঠি ১৮৯৫ সালে লেখা। এরপরই রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি জগতের মানুষে পরিণত হতে থাকেন এবং নোবেল প্রাপ্তির পর তাঁর পক্ষে চাইলেও 'ছিন্নপত্রের' জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। শান্তিনিকেতনে হয়তো শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের নিসর্গেরই কিছুটা স্পর্শ তিনি পেতেন, কিন্তু নির্জনতা কখনো নয়। কিন্তু 'ছিন্নপত্রের' সন্ন্যাসীর হঠাৎ উপস্থিতি তাঁকে ধীরে ধীরে একটা সমঝোতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, যা সম্ভব ছিল একান্ত নিজের ভিতরে এবং এ সমঝোতাটি গৃহী ও সন্ন্যাসীর মূলভাবগুলোকে একটা জায়গায় এনে এমন একটি অবস্থান তৈরি করে, যেখানে গৃহী চোখ মুদলেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পায়, তার ভিতরের দুঃখগুলো মিটে যায়। এরকম একটি অবস্থাকে কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস বর্ণনা করেছিলেন Unity of being হিসেবে। তবে সেটি নিজের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথও অনেকভাবে তাকে বর্ণনা করছেন, কিন্তু 'ছিন্নপত্রেই'

তিনি সেই ১৮৯৫ সালে লেখা একটি পত্রে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এ ঐক্যের অবস্থানে পৌঁছালে জীবনের বৈপরীত্যগুলো কীভাবে একটা সমতলে এসে মেলে: "নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাইরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলোকে একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রোথিত দেখতে পাই।' এ আনন্দসূত্রের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন করেছেন, কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র দুঃখ বিষাদ অথবা আমাদের মধ্য থেকেও এবং এগুলোকে ছাপিয়ে, যেভাবে আনন্দের অনুভূতিটা বড় হয়ে ওঠে, সে রকম আর কোথাও তত তীব্রভাবে দেখা যায় না। গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদটা সেজন্য রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং হয়তো সেজন্য এর একটা স্থায়ী সমাধানের কোনো আয়োজন চোখে পড়ে না; এবং 'ছিন্নপত্রের' চিঠিগুলো পড়লে আরও পরিষ্কার হয় যে, সেটি হয়তো সম্ভবও ছিল না।

মহামানবের সাগরতীরে : রবীন্দ্রনাথের সমাজ, রাষ্ট্র/জাতি ও জাতীয়তাবাদ ভাবনা

১.

রবীন্দ্রনাথের সমাজ, রাষ্ট্র/জাতি ও জাতীয়তাবাদ ভাবনা যে পৃথক তিনটি প্রকোষ্ঠে বিকশিত হয়েছিল, তা নয়; এ তিনটি ভাবনার ভিতর সংযুক্তি ছিল, কার্যকারণসূত্রে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর সমাজভাবনায় রাষ্ট্রভাবনার অনুষঙ্গগুলো বিধৃত হয়েছে; তাঁর রাষ্ট্রভাবনাকে প্রভাবিত করেছে সমাজভাবনা এবং তাঁর জাতীয়তাবাদের চিন্তাকে একটি পরিণতি এবং নির্দেশনা দিয়েছে তাঁর সমাজভাবনা। একইভাবে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র ছিল একটি প্রধান পক্ষ। তবে মোটাদাগে আমরা দেখাতে পারি, রবীন্দ্রনাথের এ তিন ভাবনায় সমাজ নিয়ে ছিল আশাবাদ; রাষ্ট্র বা জাতি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে ছিল সংশয় ও শঙ্কা। তাঁর কাছে সমাজ ছিল জাতি বা রাষ্ট্রগঠনে মূল ভিত্তি, যদিও রাষ্ট্র নিজে এ ভিত্তির বিপ্রতীপে অবস্থিত এবং জাতীয়তাবাদ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচলনের জন্য দায়ী। যত তিনি সমাজের ভিতর ভারতের তথা বাঙালির সংহতি ও মুক্তি খুঁজেছেন, তত তিনি জাতি বা নেশন এবং রাষ্ট্র বা স্টেট সম্পর্কে সাবধান হচ্ছেন এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শঙ্কিত হচ্ছেন। ফলে রাজনীতি, সমাজ ও দেশ নিয়ে তাঁর লেখালেখিতে তিনি একসময় সুনির্দিষ্ট কিছু অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যদিও এ অবস্থানগুলো শুরু থেকেই সুচিহ্নিত ছিল না, বরং এসব

অবস্থানে পৌঁছার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অনেকবার তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার পরিমার্জনা করেছেন, এমনকি এদের ভিতর কিছু অসংগতি তৈরি হতেও দিয়েছেন। নিজের একসময়ের কোনো চিন্তার বাইরে গিয়ে ভিন্ন সময়ে তিনি হয়তো ভিন্ন কোনো বক্তব্য দিয়েছেন, অথবা একই সময়ে তাঁর কোনো তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের প্রয়োগে কিছু ব্যবধানও রেখে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, তিনি রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রনীতিবিদ কোনোটাই নন, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর চিন্তা মূলত একজন সচেতন এবং পরিবর্তনকামী নাগরিকের। বস্তুত, উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন; সমাজের নানা বিবর্তন ও বিরোধের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; কুড়ির দশকের শুরু থেকে পশ্চিমে, জাপানে, চীনে ও পারস্যে তিনি সরেজমিনে যেসব ঘটনা দেখেছেন এবং সমাজ, রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের নানা রূপ ও কাঠামোর নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধ পার হয়ে কুড়ি-তিরিশের দশকে ভারতীয় ও বিশ্ব রাজনীতিতে যে সংঘাতময় ও সহিংস পালাবদল দেখেছেন, তার প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ নিয়ে তিনি নিরন্তর ভেবেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং লিখেছেন। সেগুলোর ভিতর আপনা থেকেই একটা তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং মতাদর্শগত ঐক্য দাঁড়িয়ে গেছে যা তাঁর আলোকপ্রাপ্ত উদার মানবিকতা এবং রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

এ 'রোমান্টিক' শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে বিশেষ তাৎপর্যময়– এর প্রথম অর্থটি সংশ্লেষী, অর্থাৎ কল্পনাশ্রয়ী চিন্তা ও হিতকারী উদ্দেশ্যের মিলনের ইঙ্গিতবহ এবং দ্বিতীয় অর্থটি বিশ্লেষী, অর্থাৎ রোমান্টিকতার অন্তস্থিত কল্পনা ও বাস্তবের অমিলকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দূরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সন্নিপাত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ওই ইতিহাস কেন গুরুত্ব হারাল এবং বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ কেন মানবজাতিকে পরিত্রাণহীন একটি দিগন্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথনির্দেশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের সংশ্লেষী চরিত্রের পুনরুত্থান কামনা করেছেন; অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ চিন্তার

বিশ্লেষী ও শেষ বিচারে বিনাশী চিন্তার অবসান দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, সমাজ নিজ থেকে বদলায় না, অথবা বাইরে থেকে আসা কোনো বিনাশী চিন্তা হঠাৎ করে শক্তি সঞ্চয় করে না। সমাজ বদলের জন্য সমাজের ভিতরের মানুষের কর্মোদ্যোগ এবং বাইরের অনিষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির সমাবেশ। এজন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ বিচারে দৃষ্টি দিয়েছেন ব্যক্তির ওপর; আরও নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তির ভিতরের শক্তি সম্ভাবনার ওপর। আত্মশক্তির উদ্বোধন অবশ্য ঘটেনি এবং কেন ঘটেনি, তার কারণগুলো এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হবে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল একক হচ্ছে ব্যক্তি ও গ্রাম। গ্রাম বা গ্রামীণ সমাজ যদি হয় ব্যক্তির সক্রিয় প্রতিনিধিত্বকারী এবং ব্যক্তি যদি সক্রিয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে তার সমাজের, তাহলে পরস্পরের ভিতরে একটি মিথষ্ক্রিয়া চলতে থাকে, যার প্রভাবে সমাজ উন্নত হয়, অর্থাৎ এর দায়বদ্ধতার এবং সক্রিয়তার ক্ষেত্রগুলো সংহত হয়। তেমনি ব্যক্তিও তার কর্মোদ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে। এ প্রতিনিধিত্বকারী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদ ফ্রাঁসোয়া গিজো'র (১৭৮৭-১৮৮৪) জাতি সম্পর্কিত মতের সঙ্গে। আরেক ফরাসি তাত্ত্বিকের চিন্তার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল এবং তিনি হচ্ছেন আর্নস্ট রেঁনা (১৮২৩-১৮৯২)। রেঁনা-এর মতোই রবীন্দ্রনাথ নেশন বা জাতিকে দেখেছেন ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় উদ্ভাবন হিসেবে, যার সঙ্গে উপনিবেশপূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার কোনো মিল নেই। 'নেশন কী' শীর্ষক প্রবন্ধে রেঁনা জানান, একটি নেশন বা জাতির অস্তিত্ব হচ্ছে একটি দৈনন্দিন গণভোট, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব হচ্ছে জীবনের নিরন্তর সত্যায়ন (ভাবা, *ন্যাশন* অ্যান্ড নেরেশন: ১৯)। এ রোমান্টিক নেশন-চিন্তা রবীন্দ্রনাথেরও, তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরে যাওয়া যাবে।

তিন স্তরে বিন্যস্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র এবং জাতীয়তার ভাবনা কীভাবে কয়েকটি গূঢ় প্রতিপাদ্যে সূত্রবদ্ধ ছিল, তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি। মূলত বাঙালি সমাজ এর উপজীব্য হলেও সমাজ

ছাড়িয়ে জাতি ও রাষ্ট্রে এ প্রবন্ধের অভিনিবেশের বিস্তৃতি। চারটি বিষয়কে এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সেগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত, তাঁর বক্তব্য হলো, পশ্চিমের রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রের সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রের মৌলিক একটি পার্থক্য হচ্ছে, পশ্চিমে যেখানে রাষ্ট্র মানুষের ওপর খবরদারি করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভারতে সেটি প্রথাগতভাবে করে এসেছে সমাজ। রাষ্ট্র অবস্থান নিয়েছে জনগণ থেকে দূরে, ফলে সমাজ বা গ্রামগুলোকে আত্মনির্ভরশীল হতে হয়েছে। বস্তুত গ্রামীণ সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকাশ ঘটানোর মতো কোনো প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র থেকে এ দূরত্ব এবং এ আত্মনির্ভরশীলতার (অন্যত্র একে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলেও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন) ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বিকাশস্থল হচ্ছে গ্রাম। গ্রামের দেবমন্দির, অতিথিশালা, পানীয় জলের উৎস, গ্রামের গুরুগৃহ বা পাঠশালা এবং গ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যুগ যুগ ধরে স্থানীয় প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সৃষ্ট এবং পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং সমাজের স্বকীয়তা রক্ষিত হয়েছে। এজন্য রাজায় রাজায় সংঘাতেও এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। সেজন্য গ্রাম থেকে উৎসারিত কল্যাণশক্তি দেশের কল্যাণশক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। একই পর্যবেক্ষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'ভারতীয় সমাজ' (১৯০১) প্রবন্ধে। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমে নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে যেমন জাতি বা 'নেশন' আত্মরক্ষা করেছে, জয়লাভ করেছে, সেভাবে আত্মরক্ষা ও জয়লাভ করেছে ভারতীয় সমাজ। তবে পশ্চিমা নেশনের রক্ষাসূত্র যেখানে এর সংগঠন ও সামরিক শক্তি, ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এটি ছিল এর কল্যাণশক্তি, যার গঠনে নীতি ও ধর্মের একটি ভূমিকা ছিল। স্বদেশী সমাজ অন্ন, বস্ত্র আরোগ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে যে আত্মনির্ভরশীল ছিল, তাও তার কল্যাণশক্তির জন্য। এ কল্যাণশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য সমাজ আত্মশক্তি বিকাশে উৎসাহ দিত। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত লেখালেখিতে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষের সমাজপ্রধান ব্যবস্থাটি বিনষ্ট হয় উপনিবেশী শাসনের প্রকোপে। ইংল্যান্ডে যেরকম সর্বসাধারণের

মঙ্গলভার রাজশক্তিতে পূঞ্জীভূত, ভারতে তেমন সমাজে। ইংল্যান্ডে রাজশক্তি বিপর্যস্ত হলে সর্বসাধারণের জীবনে সংকট সৃষ্টি হয়, ভারতে সংকট সৃষ্টি হয় সমাজ বিপর্যস্ত হলে। অথচ উপনিবেশী শাসন ভারতে পশ্চিমা রাষ্ট্রপ্রধান ব্যবস্থা প্রয়োগ করল এবং নানাবিধি বিধান, আইনি ও বিচারিক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রমুখি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সমাজের প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ করে দিল। এ রুদ্ধতা এবং এর বিপরীতে বিকাশের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বিবেচনা। আশিক্তির সমাবেশ যদি না ঘটাতে পারে স্বদেশী সমাজ, তাহলে এর উদ্ধার সম্ভব নয়। চতুর্থত রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, স্বদেশী সমাজের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে এর সন্নিবেশী চরিত্র, এর আত্মস্থ করার শক্তি। বিভিন্ন বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত বহু উপাদানকে স্বদেশী সমাজ একটি জায়গায় এনে সংহত করেছে, নিজের প্রয়োজনে নতুনরূপে সাজিয়েছে। 'ভারতীয় সমাজ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, সমাজ সকল ধর্ম ও জাতকে স্থান দিয়েছে, তাদেরসহ অবস্থান নিশ্চিত করেছে। সমাজের এ সংহতিশক্তির পুনঃউদ্বোধন ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। এজন্য তিনি সমাজের সাধারণতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন, নেশনতন্ত্রকে নয়।

স্বদেশী সমাজের প্রাচীন ইতিহাস এবং অবস্থান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতটা নিশ্চিত ছিলেন, তার বর্তমান অবস্থান নিয়ে ততটাই ছিলেন উদ্বিগ্ন। এ সমাজের তিনটি বিষয় তাঁকে পীড়া দিত। প্রথম, যে অতিথিশালা, পানীয়জলের বন্দোবস্ত অর্থাৎ যা কিছু পূর্তকাজ ইত্যাদির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো রাজ অনুগ্রহে অথবা জমিদারের উদ্যোগে নয়তো পুণ্যের প্রলোভনে স্থাপিত– সেগুলো এক প্রকার চ্যারিটি বৈ কিছু নয়। গ্রামের মানুষ স্বউদ্যোগে সেগুলো স্থাপন করেছেন, এমন নজির খুবই কম, চোখে না পড়ার মতোই। কেন নেই, তার কারণটাও তিনি উল্লেখ করেন এবং তা হচ্ছে আত্মশক্তির রুদ্ধতা। এমন ঘটনার কথাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন, যেখানে গ্রামে আগুন লাগলে একটা কুয়ার অভাবে মানুষ সেই আগুন নেভাতে পারে না। অথচ এজন্য দোষ দেয় অদৃষ্টকে। এ দৃষ্টান্ত থেকে সমাজের পীড়াদায়ক দ্বিতীয় বিষয়টির উল্লেখ করা যায় এবং তা হচ্ছে সমাজের কর্মহীনতা। 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন

প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন শুধু যে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, 'সেই পরিমাণ বাহবার ঘণ্টা বাড়িয়া উঠিয়াছে' *(বিবেচনা ও অবিবেচনা) কালান্তর*: ২৭) রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপাতে সমাজ কর্মহীন হলে অদৃষ্টবাদ একটা সান্ত্বনা হিসেবে মানুষের সামনে আসে। কর্মহীনতার আরেকটি কারণ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে কিছুটা বিস্তারিত বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সংসারে তাই ধর্মেকর্মে আচারে-বিচারে যত সংকীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক, উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমনকি, সমর্থন আছে।' জ্ঞানী ও সংসারী সকলেই নিজের দায়িত্ব প্রতিপালনে অক্ষম। ফলে 'এ দেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দেওয়া কিছু নাই।' (*কালান্তর*: ৬৪)। অন্যদিকে ইউরোপে সত্যসাধনার ক্ষেত্র জ্ঞানের নয়, বরং এর প্রয়োগ, এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন।

তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখালেখি করেছেন, তা হচ্ছে সমাজের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাটি, যা এর অন্তর্গত নানা পার্থক্যকে একটা অভিন্ন তলে বিন্যস্ত করে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও ভুল বোঝাবুঝি দীর্ঘকাল ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা যে সমাজ থেকে উদ্ভূত তা উল্লেখ করে 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি লিখেন: 'হিন্দু-মুলসমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা কুশ্রীভাবে বেআব্রু রাখি... বাংলার মুসলমান যে এ বেদনায় [অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের বেদনায়] আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দেই নাই' (*কালান্তর*: ৩৯-৪০)। 'বাতায়নিকের পত্র'– প্রবন্ধে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিভাজন সমস্যার উল্লেখ করে বলেন, 'সমাজে পরস্পরের কৈফিয়ত নেওয়া চলে, এ কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি' (*কালান্তর*: ১৫৮)। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মহাসভার আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন, ভারতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির (১৮৮৫) পর এর সঙ্গেও তাঁর সংযুক্তি ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গ হলে তার বিরুদ্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক যে আন্দোলন সূচিত হয়, তাতে এর সমর্থক হিসেবেও তিনি সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু হিন্দু মহাসভার আদর্শ, কংগ্রেসের রাজনীতি, স্বদেশী আন্দোলন

বিশেষ করে বিদেশি পণ্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সন্দেহ তৈরি হলে ১৯০৭ সালের পর থেকে তিনি রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

বস্তুত এসব বিষয়ে তাঁর ভিন্নমত তিনি লেখালেখিতে ও বক্তৃতায় ধরেছেন। ১৮৯৮ সালে 'প্রসঙ্গ কথা'-য় তিনি হিন্দুধর্ম ও হিঁদুয়ানির প্রভেদ তুলে ধরে লেখেন, 'বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলোই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।' যদিও তিনি এ আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে' ('প্রসঙ্গ-কথা,' পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড : ৫৫৮)। কিন্তু কীভাবে তা প্রকাশ হবে, সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশনা তিনি দেননি, ফলে এ উচ্চারণও তাঁর রোমান্টিক উদারচিন্তার প্রতিফলন হিসেবেই থেকে গেছে। হিঁদুয়ানির সংকীর্ণতা ও আচার সর্বস্বতার বিপরীতে হিন্দুত্বের যে সংজ্ঞাটি তিনি দিয়েছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য, যেহেতু তা একটি আদর্শায়িত রূপ হিসেবেই বিরাজমান, কর্মক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োগ দেখা যায়নি। "স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন না করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব" ('ভারতীয় সমাজ', আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড : ৫২৫)

সমাজের অপ্রীতিকর বিষয় আরও আছে এবং সেগুলোর মধ্যে আছে হিন্দুদের ভিতরেই জাত প্রথার অত্যাচার, নারীকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে তাকে সংসার ধর্মের প্রাকৃতিক সেবিকার স্থানে অধিষ্ঠিত করে এক চিরকালীন বঞ্চনার শিকারে পরিণত করা, সমাজের ভিতরে জনহিতি ও মঙ্গলকর্মের অভাব ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন-বর্তমান সমাজচিত্রের একদিকে আছে সকলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা এবং অন্যদিকে তা থেকে বেরিয়ে এসে অরাজকতা সৃষ্টির বিষয়টি। 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি লিখেন :

> একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ... সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব তার জ্ঞান লইয়া... সচেষ্ট জীবনের এ যে নানা দিক বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব (*কালান্তর*: ৮৮-৮৯)

এ ছিল প্রাচীন পল্লি সমাজ। এর বর্তমান অবস্থাটি ভিন্ন :

> আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন... সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন... সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে, সে পরিমাণে ভার বহিতেছে না... (*কালান্তর*: ৮৯)

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে ভারসাম্য একদিন ছিল, তা এখন আর নেই। ব্যক্তি আর সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। সমাজও করে না ব্যক্তির। ফলে একদিকে কর্মহীনতা, অন্যদিকে সমাজের ভিতর রাষ্ট্রের ঢুকে পড়া এবং সমাজের অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রের বিচলন এখন যে সংকট সৃষ্টি করেছে তা 'আপন দেশের সেবা করিবার' ও 'তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার' হীনতার শামিল (*কালান্তর*: ৯০)। সমাজ ও রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক ছিল তা সমাজ থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অথচ এখন এ নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের সম্পর্কটি উল্টে উচ্চ থেকে নিচের এক বিপরীত প্রবাহে দাঁড়িয়েছে। এখন রাষ্ট্রই নির্ধারণ করছে কে কার সেবা কীভাবে করবে; সমাজ নয়। ফলে ঔদাসীন্য এবং সংযোগহীনতার বিপর্যয় ঘটেছে।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেছেন। শুধু যে ভেবেছেন, তা নয়, নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের সীমিত পরিসরে এর প্রায়োগিক একটা প্রকাশেরও চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছেন, এমনকি ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের

আয়োজনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি সচেতন ছিলেন যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায়, শহর গ্রামের যুবক সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়ায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে; কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণে গ্রামগুলো পিছিয়ে আছে; আর শিক্ষাদীক্ষাতে তো বটেই। এজন্য গ্রামগুলোকে আবার স্বনির্ভর করার জন্য কৃষি শিক্ষা ও সমবায়– এ তিনের সমন্বয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি একটি ব্যাপক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যয় ছিল, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে গ্রামগুলো নিজেদের বিদ্যাপীঠ, শস্যগুদাম, সমবায় বিতান এমনকি ব্যাংক পর্যন্ত তৈরি করে নিতে পারবে। ১৯১২ সালে শান্তিনিকেতনের সরুল গ্রামে কেনা কুড়ি বিঘা জমিতে তিনি ১৯২২ সালে ইনস্টিটিউট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন গড়ে তোলেন, যা বাইশটি গ্রামের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নেয়। তাতে সাফল্য যে আসেনি, তা নয়, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা থেকে তা দূরেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ব্যাপ্তির তুলনায় তাঁর কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রটি ছিল নিতান্ত সামান্য। এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রকল্পগুলোকে কেউ অন্যত্র অনুসরণের চেষ্টাও করেননি। তেমন উদ্যোগী মানুষও ছিলেন না। এবং এরকম উদ্যোগের ফল কী হতে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য থেকে হয়তো তা অনুমানও করা যায়। "আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত ভাঁটার মুখে" এরকম ভাবনা থেকে তিনি একটি পাড়ায় 'নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে' জাগাবার চেষ্টা করলেন। নিজেদের পরিশ্রমে যদি গ্রামবাসী একটি কুয়া খুঁড়ে ফেলে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তা বাঁধিয়ে দেওয়ার খরচ দেবেন, এরকম প্রস্তাবেও সায় মেলেনি। মানুষ একে রবীন্দ্রনাথের পুণ্যলাভের একটা ফাঁকি হিসেবে দেখল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার পরে নয় কোনো আগন্তুকের উপর" ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' *কালান্তর*, ৭০-৭১), এজন্য একেবারে গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি জাগানোর জন্য, নিজেদের নৈষ্কর্ম্য ও ঔদাসীন্য থেকে বেরিয়ে এসে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সমাজের প্রশ্ন থেকে যখন রাষ্ট্র ও জাতির প্রশ্নে দৃষ্টি ফেরান রবীন্দ্রনাথ, তখন অতীত থেকেও বেশি গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায় বর্তমান, যেহেতু

রাষ্ট্র ও জাতির প্রকাশের সঙ্গে সমাজের হিতকারী চিন্তার সংগীত উপনিবেশী ভারতে একেবারে গোড়াতেই তিরোহিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্র ও জাতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯০১ সালে লেখা 'নেশন কী' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল সদর্থক। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ভিন্নতাকে তিনি আবশ্যক বিবেচনা করে লিখেছেন, "তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে– এক আইন, এক প্রভু হইলে স্বাধীনতার পক্ষে সংকট। বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তারকার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীত প্রত্যেকে এক একটির সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারো একক চেষ্টার অতীত" (*আত্মশক্তি, রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড : ৫১৯*)

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নেশনচিন্তার সঙ্গে আর্নস্ট রেনাঁর নেশনচিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়। 'নেশন কী' এ একই শিরোনামে সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮২ সালে দেওয়া এক বক্তৃতায় রেঁনা বলেন, নেশন সকলের অস্তিত্বের মূলে আছে, তাদের "স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা; যদি তাদের এক আইন ও এক প্রভু হয়, তাহেল [ওই স্বাধীনতা] পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।" রেনাঁ তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেন, "নেশন হচ্ছে একটি আত্মা, একটি আধ্যাত্মিক বিধান এবং নেশনের অতীতে রয়েছে একটি অভিন্ন প্রত্যয়" (ভাবা, *নেশন অ্যান্ড নেরেশন; ১৯*)। এ প্রত্যয় বা ইচ্ছার রেনাঁ যে মূল্য দেন সেই একই মূল্য দেন অতীত ও বর্তমানের পরম্পরাকে। রেনাঁর এ মত রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেও উপনিবেশী শক্তির অধীনে এ দুটোই যে অকেজো হয়ে পড়ে, তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। উপনিবেশী শাসনে জাতির প্রত্যয় বা ইচ্ছাকে অধীনস্ত হতে হয় ভিন্ন এক জাতির শাসনব্যবস্থার এবং অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে এ শাসনব্যবস্থা তুলে দেয় বিচ্ছেদের প্রাচীর। ফলে নেশন হয়ে দাঁড়া অপ্রকৃত; জাতি হারিয়ে যায় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের আবরণে এবং জাতির চিন্তাটিও হয়ে দাঁড়ায় বিমূর্ত। ১৯১৭ সাল প্রকাশিত *'নেশনালিজম'* গ্রন্থে তিনি নেশনকে এরকম একটি বিমূর্ত সত্তা

হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন, যারা শাসিত, তারা তো রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ, তারা তো বিমূর্ত কিছু নয়। তাহলে একটি বিমূর্ত উৎস থেকে জীবন্ত মানুষের কল্যাণ কি উৎসারিত হতে পারে? এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নেশন একই সঙ্গে জাতি ও রাষ্ট্র এবং তা প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষের স্বার্থের সংগঠিত রূপ। অথচ এ নেশনের ন্যূনতম মানবিকতা বা আধ্যাত্মিকতা আর নেই (৫৪-৫৫)। একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক নেশন বা রাষ্ট্র যে এখন অতিকায় এক 'ভৌগোলিক দানবে' পরিণত হয়েছে, এ মন্তব্য করে তিনি সকল ধরনের পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (৯৭)। আশীষ নন্দীর মতে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে অবৈধ ভাবতেন।

রেনাঁর সঙ্গে নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার আরেকটি মিল পাওয়া যায় নেশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতে। 'নেশন কী' প্রবন্ধে তিনি লিখেন, "ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্য তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ " (*রবীন্দ্র-রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড : ৫১৮)। রেনাঁও তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "মনের দিক থেকে স্বাস্থ্যবান এবং উষ্ণহৃদয়ের অধিকারী বিশাল জনসম্প্রদায় যে ধরনের নৈতিক বিবেক" সৃষ্টি করে, তা-ই হচ্ছে নেশন (ভাবা, *নেশন অ্যান্ড ন্যারেশন* : ২০)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রেনাঁর চিন্তাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে নেশনকে মানসিক সংগঠন এবং মানসিক সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের সময়ে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন নেশনকে যে অর্থে 'কল্পিত জনগোষ্ঠী' বা ইমাজিন কমিউনিটি হিসেবে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথও অনেকটা তেমনটি দেখেছেন এবং অ্যান্ডারসনের মতো তাঁর এ মানসিক সংগঠনটিও জনসম্প্রদায়কে তার অস্তিত্ব রক্ষা, বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং স্বরাজ অর্জনে সহায়তা দিয়েছে। ফলে একদিকে নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সদর্থক দৃষ্টি, অন্যদিকে এর পশ্চিমা রূপায়ণে শক্তিমদমত্ততা এবং সাম্রাজ্যলিপ্সুতার কারণে একে বিপজ্জনক গণ্য করা– এর মধ্যে রয়েছে একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়া। এ বিবর্তনে একটি ভূমিকা রেখেছিল প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯১৬-১৭ সালে

তাঁর জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ। এ ভ্রমণ তাঁকে খুব কাছে থেকে পশ্চিমা ও জাপানি নেশনালিজমের প্রকাশকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়েছিল। পশ্চিমা নেশন সম্পর্কে তাঁর অভিমতটি এসময় খুব স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ইউরোপে নেশন রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অখণ্ডতা বজায় রাখতে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তারপরও নতুন জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে জগৎসভায় তাদের একটি উচ্চাসন ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একসময় দেখেছেন, "য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো জ্বালাবার জন্য নয়। আগুন লাগাবার জন্য।" ফলে 'চীনের মর্মস্থানের উপর' একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হলো" (*'কালান্তর'* কালান্তর: ২৪)। ইংরেজ রাষ্ট্রের উপনিবেশী শাসন ছিল এ দ্বিত্বতার প্রকাশ– অর্থাৎ একদিকে সভ্যতার মুখোশ, অন্যদিকে বর্বরতার মুখশ্রী। 'কালান্তর' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি ও ব্যবস্থা নিয়ে। এ সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথ ধন-উৎপাদনের সুযোগ-বিধান কিছুই নেই— অদূর ভবিষ্যতেও তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাইনে: (*Regular*, *কালান্তর*: ২০)

ইউরোপ সম্বন্ধে যেটুকু মোহ ভারতবাসীর ছিল, তা ঘুঁচে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। কোন মাতালের 'আব্রু ঘুঁচে যাওয়ার', মতো বর্ণনা করে এ মোহমুক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "এত মিথ্যা, এত বীভৎসতা হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বাকার অন্ধযুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি।" ইউরোপ সম্পর্কে যে জ্ঞান ছিল ভারতীয়দের, প্রধানত ইংরেজদের সম্পর্কে, তাতে "কুৎসিতের সম্পর্কে..... একটা সংকোচ ছিল: আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই" (*'কালান্তর'* কালান্তর: ২২)। রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণও তাঁকে ওই জাতির দ্বিত্বতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছে। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্যশাসনের রূপ।" (কালান্তর: ৪১১)। কিন্তু জাপান যাত্রায় তিনি

এর উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সাও দেখেছেন এবং দেখে বিচলিত হয়েছেন। ইউরোপ থেকে জাপান কর্মের দীক্ষা এবং অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে– এ ছিল তাঁর অভিমত (*জাপান-যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড: ৩৫৭*)। এর আগে এ কর্মের দীক্ষা কীভাবে নতুন জ্ঞানসৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়েছে, তিনি তার একটি বর্ণনা দেন, কিন্তু একই সঙ্গে জানান, অস্ত্রের দীক্ষাটাও সাম্রাজ্যলিপ্সার কাজে জাপান প্রয়োগ করতে শিখেছে: "চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল– সেই জয়ের চিহ্নগুলোকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল" (*রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড: ৩৪৯*)।

এ দ্বিত্বতা কেন, সে প্রশ্নের একটি জবাব রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ন্যাশনালিজম* গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

> The Nation, with all its parapharnilia of power and prosperity, its flags and pious humans, its blasphemous prayers in the churches...... cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation....("Nationalism in the west. *Nationalism:*২৯)

জাপান যে বাণিজ্য, শিল্প এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী ছিল এবং এসব ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে অবস্থান করে নিয়েছিল, একথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। জাপান ভ্রমণে এর বিত্ত বৈভবের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, যদিও রবীন্দ্রনাথ বেশি মুগ্ধ হয়েছেন চিত্তবৈভবে। কিন্তু জাপান যখন ধন উপার্জন করেছে, সেই ধনের সঙ্গে ক্ষমতা ও পররাষ্ট্রলোভ তার রাষ্ট্র কাঠামোয় ঢুকেছে। ইউরোপের দেশগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের কথাও যেমন রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, এদের জ্ঞানের শক্তিতে মুগ্ধও হয়েছেন, কিন্তু বলেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে দেশগুলো নিষ্ঠুর। চীনের সঙ্গে জাপানের আচরণে ইউরোপীয় দেশগুলোর রাষ্ট্রিক স্বার্থপরতার একটি শোকাবহ প্রতিরূপ তিনি দেখতে পেয়েছেন। জাপানে যেসব বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন, তাতে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করে জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে জাপানিদের সাবধান করে দিয়েছেন।

নেশন বা জাতি এবং রাষ্ট্রসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটটি গুরুত্ব পেয়েছে। একদিকে তিনি এটিকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে দেখেছেন, যার শুরুটা পশ্চিম অর্থাৎ ইউরোপে, ষোড়শ শতকে। এ নেশন-এর ভূগোল আছে, ক্ষমতার কাঠামো আছে। এ নেশন যখন রাষ্ট্র তখন সে পররাষ্ট্রলোভী হতে পারে। অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হতে পারে, সংকট থেকে উদ্ধার পেতেও পারে আবার নাও পারে। অর্থাৎ এ নেশনের একটি রূপগত, আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত দিক আছে। অন্যদিকে, এর একটি ভাবগত দিকও আছে, যা বিমূর্ত মনোগত। এটি কল্পিত না হলেও এর অভিঘাতটি কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী। '*গোরা*' উপন্যাসে যে 'ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ' অর্থাৎ 'পূর্ণ স্বরূপ' ভারতবর্ষের কথা গোরা বলছে এবং সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই বলে আক্ষেপ করছে, তা কখনো ছিল কিনা, এ প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, এটি কল্পিত ভারতবর্ষ।এ নেশন চিন্তাটি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল্যে। কিন্তু একসময় এ কল্পনা থেকেও রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছেন, যখন দেখেছেন স্বদেশী সংগ্রামের মূল চিন্তায় যে ভারতবর্ষ তাতে সকল সম্প্রদায়ের সমান উপস্থিতি এবং অধিকার নেই এবং তাতে স্বদেশের এ যে আদর্শায়িতরূপ আঁকা হয়েছে তাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষের চিন্তাটিও সাদা-কালো। বিদেশি শক্তি আঘাত হেনেছে, পঙ্গু করেছে স্বদেশকে, ভারতমাতাকে; ভারতমাতা সেই আঘাতে বিপর্যস্ত। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখেন, "'বয়কট' যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এ সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। ... আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এ কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজের পাপ হইতে।" (*পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র রচনাবলী,* দশম খণ্ড : ৬২৯)

স্বদেশী যুগের নেশনচিন্তা রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আরেকবার সচেতন করল। ১৯১৬-১৯ সালের জাপান ও

আমেরিকা ভ্রমণ তাঁকে জাতীয়তাবাদের ভাবগত রূপ কী ভয়ানক হতে পারে সে সম্পর্কে প্রকৃষ্ট একটি ধারণা দিলেও সেই *নৈবেদ্য*-র পর্যায় থেকেই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পরিষ্কার– যা 'সভ্যতার সংকট'-এ এসেও তিনি পরিবর্তন করেননি। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, সমকালীন অন্যান্য রাজনীতিবিদ- যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার বিরোধ ছিল, কিন্তু *নৈবেদ্য*-র অনেক জায়গায় তিনি যা লিখেছেন, জাপান ও আমেরিকায় বিভিন্ন বক্তৃতায় যা বলেছেন, 'সভ্যতার সংকট' এ-ও তাই বলেছেন। তবে এ বলার পিছনে যে অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ, পঠন ও দৃষ্টিগঠন ছিল এবং তাতে যে বিবিধ সূত্রের, উপাদানের এবং অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটেছিল, তাতে সময়ান্তরে এর প্রকাশে তারতম্য ঘটেছে। একেবারে গোড়াতে, প্রথম ইংল্যান্ড যাত্রা, হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময়, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সঙ্গে ১৯০০-১৯০১ এ *নৈবেদ্য* রচনা ও প্রকাশের পর এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং এ দুয়ের মধ্যে চার বছরে লেখা 'স্বদেশী সমাজ'সহ অন্যান্য প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখার সময় এ বিষয়ে তাঁর মতামতের মধ্যে কিছুটা ফারাক দেখা যায়। কিন্তু এ ফারাক তিনি দ্রুতই কাটিয়ে উঠেছিলেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের চিন্তাকে অনেকগুলো পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ে পরিণত হতে দেখেছেন। আশিস সান্যাল তাঁর *রবীন্দ্রনাথ ও নেশনালিজম* গ্রন্থে যেমন, এরকম তিনটি পর্বের উল্লেখ করেন– ১৮৮৫-১৯০৫, *নৈবেদ্য* থেকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমাপ্তি পর্যন্ত এবং ওই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত। কিন্তু সান্যাল- নির্দিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, ঘটেছে এর অনুধাবন ও প্রকাশের তীব্রতায়। তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতে ইউরোপের জ্ঞানালোক প্রাপ্তির যুগের সকল যুক্তি আর অর্জন যখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা জাতিপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে আরও কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত এ মনোভাবে তাঁর কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

এ কথা বলা বরং সংগত যে ১৯০০-১৯০১ সাল (অর্থাৎ *নৈবেদ্য* লেখা ও প্রকাশের সময়) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ নিয়ে ততটা নিরাশ ছিলেন না, এবং তাঁর চিন্তায় তখনও ইউরোপীয় জ্ঞান ও সভ্যতার একটি প্রশংসনীয় অবস্থান ছিল। অবশ্য ইউরোপীয় জ্ঞান ও মনীষা, তার বিজ্ঞান সাধনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রত্যয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ইউরোপের অন্তরের ঐশ্বর্যশক্তি' কে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। শুরুতে বরং এ ঐশ্বর্যশক্তিকে ভারতীয় সমাজের পশ্চাপদতা মোচনে সহায়ক হবে ভেবে তিনি তার আবাহন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে এ ঐশ্বর্যের বিষয়টি স্বীকার করেন :

একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে- শুধু তাই নয়, সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্য সন্ধানের সততায়। ...প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে; কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত (কালান্তর : ১৪)

ইউরোপের জ্ঞানালোক-আদর্শ এবং এর রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রভেদরেখা টেনেছিলেন। রাজনৈতিক ইউরোপ, বিশেষ করে উপনিবেশকামী ইংল্যান্ড, তাঁর কাছে ছিল সভ্যতার শত্রু, কিন্তু জ্ঞানসন্ধানী ইউরোপ নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেছেন অনেক আগে, ১৮৯০ সালের দ্বিতীয় ইংল্যান্ড যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর। ১৯৮০ থেকে *নৈবেদ্য* রচনা পর্যন্ত তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে ইংরেজ, ভারতবর্ষ ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন, যেগুলোর একটি রাজনৈতিক মাত্রা ছিল। এসব প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩), 'ইংরেজ আতঙ্ক' (১৮৯৪), 'অপমানের প্রতিকার'(১৮৯৪), 'রাজা ও প্রজা' (১৮৯৪) ও 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৪)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা, ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের সভ্যতার অন্ধকার দিকটি সম্পর্কে তাঁর সম্যক দৃষ্টিগঠন এবং স্বদেশি সমাজের সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার অনেক পরিচয় এ প্রবন্ধগুলোতে আছে। পশ্চিম সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তির পিছনে যে ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

অবদান রেখেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটে যাওয়া সেই বুয়োর যুদ্ধ নিয়ে তিনি যখন 'শতাব্দীর সূর্য আজি' লিখলেন, যা *নৈবেদ্য*-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তখনই বোঝা গিয়েছিল, জাতীয়তাবাদ যে নিজের প্রয়োজনে সামরিকবাদে রূপ দিতে পারে, সে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। পরবর্তীতে এ নিয়ে তিনি বিস্তারিত মন্তব্যও করেছিলেন।

কাজেই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ভাবনাকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে দেখাটাই যথার্থ। প্রথম পর্যায়ে তিনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ইউরোপের অন্তরের ঐশ্বর্যের আলোকেই ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে বিবেচনা করেছেন। ফলে ওইসব নেশনের জ্ঞান ও কর্মের দিকটিই তাঁর চোখে পড়েছে বেশি, যতটা না পড়েছে তাদের রাজনৈতিক-ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী নেশনালিজমের প্রকাশটির ওপর। তবে জ্ঞানের বিষয়টি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রাধান্য পাবে, তাও তাঁর মানসগঠনকালের আশা-আদর্শ এবং তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী সমাজে বাঙালি চিন্তানায়কদের প্রভাব পর্যালোচনা করলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্যক যোগাযোগ ছিল, তিনি নিজেও চিন্তানায়কদের একজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যে সমাজ সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, তার মূলে ছিল শিক্ষা, যা মানুষকে নানা সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবে। সনাতনী হিন্দু সমাজে আচার এবং কুসংস্কার ছিল প্রবল এবং এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও শিক্ষার পাশাপাশি ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপলব্ধি করেছেন, সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির সমাবেশ এবং আত্মশক্তির বলে বলীয়ান না হলে ব্যক্তি, সমাজ বা দেশের, কারও মুক্তি সম্ভব নয়। উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের কাছে উপনিবেশী শাসন ছিল একটি বাস্তবতা, যাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তা থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে বেরিয়ে আসা যায়, সে চিন্তাটি ছিল অবাস্তব। বরং শিক্ষা, আত্মশক্তি এবং প্রাচীন ভারতের লুপ্ত আদর্শের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যে তা সম্ভব সেরকম একটি ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় দেখা যায়। 'অপমানের প্রতিকার'

প্রবন্ধে যেমন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। লিখেছেন, "গৃহের ও সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরাজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না"। (*রাজা প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দশম খণ্ড : ৪১৭) এ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজের ক্রমিক উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। নৈবেদ্য পর্যন্ত লেখালেখিতে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ চিন্তা তাই আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের স্খলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ভাবনার দ্বিতীয় পর্যায়টি সূচিত হওয়ার পিছনে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সামরিক অভিযান এবং উপনিবেশী নিষ্পেষণের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। বুয়োর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে ব্রিটিশবিরোধী প্রবণতা এবং স্বদেশি চেতনার যে সমাবেশ ১৮৮০-এর দশক থেকে তীব্রতা পাচ্ছিল, তার সূচনা ১৮৫৭ সালের ঘটনাপ্রবাহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা না করলেই নয় এবং তা হচ্ছে ১৮৯০ থেকে প্রায় এক দশক জমিদারির কাজে শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরে তাঁর অনেকটা সময় কাটানো। এসময় পূর্ব বাংলার গ্রামজীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে দেখেছেন এবং দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রকট মাত্রা সম্পর্কে পরিষ্কার ধাবণা পেয়েছেন। এ অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মশক্তি ও কর্মের দিকে গভীরভাবে টেনে নিয়ে গেছে। এ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ইত্যাদির পিছনে যে উপনিবেশী শাসন, তাকে তিনি জাতীয়তাবাদের আবরণে পশ্চিমা অপদেবতার একটি প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। তিনি বুঝেছেন, সমগ্র জাতি এবং আদর্শে ঐক্যবদ্ধ না হলে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে একদিকে তাঁর স্বজাতি সাধনার ক্ষেত্র ও পরিসর বেড়েছে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের বিধ্বংসীরূপ সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন। যখন স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন তীব্র হয়েছে, তাতে স্বদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য দেখে তিনি বিচলিত হয়েছেন। এ জাতীয়তাবোধ যতটা ভাবের, আবেগের এবং বিমূর্ত আদর্শের প্রপঞ্চ তৈরি করে, ততটা কর্মের

নয়। গান্ধীর চরকা আন্দোলন নিয়েও এ কারণে তাঁর আপত্তি ছিল। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না, কারণ এর রাজনৈতিক ভাবাবেগ ছিল, প্রায়োগিক কোনো পরিকল্পনা ছিল না। গ্রামের কৃষক বিদেশি পণ্যের ভোক্তা নয়, বিদেশি পণ্য বর্জনে তার লাভক্ষতির সম্ভাবনাটাও সেজন্য শূন্যই থেকে যায়। আর গান্ধীর চরকা আন্দোলনে কৃষকের কী উপকার হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের কোনো উগ্র রূপকেই, তা সে পশ্চিমে হোক, ভারতেই হোক, রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। তবে নেশনের একটি সদর্থক রূপ যেমন আছে, যা থেকে দ্রুতই পশ্চিমের প্রতিপালন যে সম্ভব নয়, তাও উপলব্ধি করেছেন, কেননা উপনিবেশী শক্তি শাসিত সমাজকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে ইউরোপের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কোনো সদর্থক চিন্তা ও নিজস্ব পথে প্রকাশিত হতে পারে না। জাতীয়তাবাদের একটি সদর্থক রূপ একে গোড়ার দিকে মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে রূপটিকে জলাঞ্জলি দিয়ে জাতীয়তাবাদের অপদেবতা প্রকাশিত হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেন :

> মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে Nationality বলে, ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে এজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। (*রবীন্দ্র -রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড* : ৪৯৮)

তারপরও ইউরোপে কোনো কোনো শক্তি স্বজাতির কাছে জাতীয়তাবাদের একটি সমন্বয়কারী চেহারা মেলে ধরেছিল। কিন্তু "য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির আবরণমুক্ত ... উৎকট রুদ্রমূর্তি..." পরিগ্রহ করে ('রাজনীতির দ্বিধা' *রাজা প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড*: ৪০৬) কিন্তু *নৈবেদ্য* থেকে নিয়ে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি কথায়

তিনি জাতীয়তাবাদ নামক ভৌগোলিক অপদেবতার উল্লেখ করেছেন, যার উপদ্রবে পৃথিবী প্রকম্পিত। একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদের চিন্তা যেন ভারতবর্ষের বিবেক ও মননকে আচ্ছন্ন না করে ফেলতে পারে, সে ব্যাপারেও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। *নৈবেদ্য* থেকে সংক্ষিপ্ত দুটি উদ্ধৃতি :

১. ...হিংসার উৎসব আজি বাজে

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিনী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

....
... লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়
(*নৈবেদ্য* : ৭১)

২. আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখরঘর্ঘর,
লৌহ বাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়,
নিঃসংকোচে শান্তিচিত্তে কে ধরিবে, হায় .....
(*নৈবেদ্য : ১০২*)

তাঁর জন্মোৎসবের জন্য ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের দুটি সভ্যতার একটি তুলনামূলক বিচার করেন– এর একটি সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ড, অন্যটি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়া, উভয়েই যারা "বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে।" তিনি লিখেন, ইংল্যান্ড "এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিল করে দিয়ে তাকে চিরকালের

মত নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির- আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এ জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর" (*কালান্তর:* ৪১১-৪১২)

'সভ্যতার সংকট'- এর ইংল্যান্ড চল্লিশ বছর আগে *নৈবদ্যে*-র 'স্বার্থলিপ্ত লুব্ধ সভ্যতার' প্রতীক। তবে এ সভ্যতারও উল্টো পিঠ যে ইউরোপেই আছে, এ বিশ্বাসটি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষে এসেও লালন করেছেন। অন্ধ জাতীয়তাবাদ, ভয়ঙ্কর নেশনচর্চা এবং বিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদের যে শেষ হতে পারে সে বিশ্বাসে তিনি স্থিত হয়েছেন। লিখেছেন "এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মরম্ভিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে" (*কালান্তর:* ৪১৬)। 'সভ্যতার সংকট' শেষ হয়েছে এক মহামানবের আহ্বান দিয়ে এবং 'মানব-অভ্যুদয়'- এর জয়গান দিয়ে।

২. রবীন্দ্রনাথের সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ চিন্তায় মাঝে মাঝে যে ফাঁক লক্ষ করা যায়: একটি পূর্বাপর, সামূহিক এবং সংকটের উৎস-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং যে দু'একটি অসংগতি মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে, সে সম্পর্কে এখন দৃষ্টিপাত করা যায়। 'সভ্যতার সংকট' এর শেষ দুটি পৃষ্ঠার দিকে তাকালেই দেখা যাবে, এর আগের সাত পৃষ্ঠায় বিধৃত সভ্যতার সংকট সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির একটি অমিল রয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে নিরাপদ নয়, তার যাবার যে সময় এসেছে, সে সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে যতটা না ঐতিহাসিক অনিবার্যতা আছে, তার থেকে বেশি আছে এক রোমান্টিক আশাবাদ। ইংরেজকে যে ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ঘটনাপ্রবাহ এবং ভারতের তৎকালীন রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলেই মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া, আর 'প্রবল প্রতাপশালীর মদমত্ততা' ইত্যাদি অপসৃত হয়ে যাওয়া এককথা নয়। সাম্রাজ্যবাদ কখনো পরাস্ত হয় না, এর রূপ বদলায়। ভৌগোলিক অথবা ভূমিগত সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ

হলেও অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ইতি হয় না। এ সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিম প্রবল প্রতাপে এখনও জারি রেখেছে এবং আমাদের সময়ে বিশ্বায়ন নামক পুঁজিবাদের প্রবলপ্রতাপশালী ও মদমত্ত ক্ষমতার প্রকাশটি তারই প্রমাণ। যে মহামানবের আবাহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার রূপটিও স্পষ্ট নয় এবং পূর্বের মানব অভ্যুদয়ের প্রকাশটিও অনুমান সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের মহামানব কি আত্মশক্তি, পরিবার ও সমাজের শিক্ষায় বলীয়ান এবং স্বনির্ভর মানুষ, অথবা সংহত অর্থে সমাজ? মানব অভ্যুদয় কি সমাজতান্ত্রিক কোনো বিপ্লব? নাকি স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয়? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই 'সভ্যতার সংকট'- এ প্রশ্ন তোলেন, ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে, "কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?" (*কালান্তর*: ৪১৫) পশ্চিমের যে সংকটগুলোকে তিনি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর প্রকাশ তো ১৯৪১-এর ভারতবর্ষের সর্বত্র। ভারতীয় সমাজ ভেঙে পড়েছে, পশ্চিমা নেশন-এর আদলে ভারতকে তৈরি করতে গিয়ে ইংরেজরা অন্তরের রসকে শুকিয়ে দিয়েছে, এর সামাজিক কোনো কাঠামোকেই অক্ষত রাখেনি। ১৯৪১ সালে যে ভারত স্বাধীনতার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তার কাঠামো নির্মিত হচ্ছিল উপনিবেশী ইট কাঠ লোহা দিয়ে। এর প্রশাসন-বিচার ব্যবস্থা-শিক্ষা সবই তৈরি হয়েছিল উপনিবেশী আদলে। ১৯৪১-এর ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হওয়া তা দূরের কথা, তা আরও তীব্র হচ্ছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ যে ভাগ হবে, তার লক্ষণও ছিল সুস্পষ্ট এবং ধর্মের স্থলে ধর্মতন্ত্রের প্রভাব, বিশ্বাসের স্থলে আচারের প্রকোপ ছিল সর্বত্র। তাহলে কোন মানব অভ্যুদয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া যে পররাজ্যগুলোর মানুষজনকে শক্তিমান করেছে, তার পিছনের কারণগুলোকে বিচার করতে হবে স্বার্থপর, বাণিজ্যনির্ভর এবং বলবিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে

সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদী এবং মানবিক নীতিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, "বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে" ('লড়াইয়ের মূলে' *কালান্তর*: ৫২) অথচ, সমাজতন্ত্রের আদর্শগুলোর ব্যাখ্যা, বা ভারতে সেগুলোর প্রয়োগ অথবা অর্জন সম্ভাবনা নিয়েও তাঁর কোনো মন্তব্য নেই। সমাজতন্ত্রের ইহজাগতিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার বিরোধ লাগে বটে, কিন্তু সারা ভারতে ধর্ম কী সহজে ধর্মতন্ত্রের আদলে প্রকাশিত হয়ে মানুষের শোষণ, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা চিরস্থায়ী করে, তার উল্লেখ তো তিনি নিজেও করেছেন। রুশবিপ্লবের প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, কিন্তু ১৯২৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পরও তিনি এর আদর্শগুলো নিয়ে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র একসময় একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভেদবুদ্ধিই তাকে বিকশিত হতে দেয়নি।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এরিক হাইন্ডেকার একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের মনোগত নির্মাণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখেন, "সাম্রাজ্য একটি ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অস্তিত্বের পাশাপাশি একট সাংস্কৃতিক নির্মাণও বটে। এর অবস্থান মনের ভূগোলে এবং একই সঙ্গে ক্ষমতার 'ভূগোলে' (হাইন্ডরেকার: ৪৮৬)। ব্রিটিশ উপনিবেশ যে গভীরভাবে ভারতে এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে, একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণ উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার থেকে একটু বেশি উদ্বিগ্ন থাকলে তিনি ফ্রানৎস ফাঁনোর মতো অস্ত্র দিয়ে না হলেও সচেতনতা, নিষ্ঠা ও কর্ম দিয়ে প্রতিরোধের ডাক দিতেন, মানে উপনিবেশ মুক্তির আহ্বান জানাতেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সাম্রাজ্যবাদ যে একটি প্রকল্প, এ বিষয়টি শুরু থেকেই চিহ্নিত করতে পারতেন। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উনিশ শতকীয় আদর্শে– যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথ সমর্পিত ছিলেন– শেক্সপীয়র, বার্ক, বায়রন ও অন্যান্য কবি-লেখকের পাশাপাশি মেকলের নামও উচ্চারিত হয়। অথচ এ মেকলের লেখায় যে রকম নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদী একটি প্রকল্পের কথা ওঠে এসেছে, তাতে

সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পটিকে চিহ্নিত করতে না পারাটা বিস্ময়কর মনে হয়।

এ সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলা যায়। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ অনেক আগেই বলেছিলেন, ব্রিটিশদের আসলে কোনো সাম্রাজ্য নেই, আছে সাম্রাজ্যের একটি প্রকল্প। স্মিথ অবশ্য কথাটি বলেছিলেন এ পরিপ্রেক্ষিত থেকে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো পরস্পর-প্রোথিত ছিল। বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, উপনিবেশী ভৌগোলিক সাম্রাজ্যে ইংরেজের অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সম্প্রসারণও এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল :

– প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলে তার প্রতিরোধের সকল শক্তি নিঃশেষ করা।

– হিন্দু–মুসলমান দ্বন্দ্বকে দীর্ঘস্থায়ী এবং মীমাংসার অতীত একটি বিষয়ে পরিণত করা।

– শিক্ষাকে একটি শ্রেণির বাইরে দুষ্প্রাপ্য করে রাখা এবং সংখ্যালঘু যারা শিক্ষিত হবে, তাদের শিক্ষাও যাতে সাম্রাজ্যবাদ সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকে, তা নিশ্চিত করা। এ শিক্ষাকেও আবার ইংল্যান্ডমুখী করে রাখা।

– দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করা, যাতে ভারতের সিংহভাগ মানুষ পরনির্ভরশীল থাকে।

– রেনাঁ 'জাতির ইচ্ছা' বলে যে প্রত্যয়ের কথা বলেছেন, তা নিষ্ক্রিয় রাখা।

– ভারতীয়দের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা।

– ধর্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেওয়া, যাতে তার শোষণ ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে থাকে।

– সাম্রাজ্যবাদী 'সেফল' বা গুরুজন এবং এর অধীনস্ত 'ন্যাটিভ আদার' বা উনজনকে প্রচলিত চিরায়ত বিভাজনে রাখা।

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'আমাদের ভারতবর্ষ' ও 'ইংরেজের ভারতবর্ষ' – এরকম বিভাজন স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি ভারতর্ষের ইতিহাসে যখন চোখ রাখতেন, এর সুমহান ঐতিহ্যগুলো তাঁর চোখে ধরা পড়ত। অথচ ইংরেজ যখন ভারতবর্ষকে বর্ণনা করত, তার চিন্তায় ভর করত প্রাচ্যবাদী অনেক স্টেরিওটাইপ। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর ওপরে লেখা এডমন্ড গস (১৮৪৯-১৯২৮) এর একটি প্রবন্ধের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, যা ১৮৯১ সালের *দি সেঞ্চুরি* সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল (৪২ : ৬, ৯০১-৯১০) যেখানে গস ভারতকে বিশাল, তাপদগ্ধ, ক্লান্তিকর একটি দেশ হিসেবে অভিহিত করে একে শুধু কালো মানুষ আর পথের কুকুর অধ্যুষিত বলে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ এ একপেশে এবং নির্মম বর্ণনায় বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ড সাঈদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এ প্রাচ্যবাদী স্টেরিওটিপিক্যাল চিন্তা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পেরই একটি অনিবার্য প্রকাশ।

এ প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় সমাজে যে স্থবিরতা এবং অধোগতি দেখা দিয়েছিল, তার দুর্দশা রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রকল্পকে চিহ্নিত না করেই পরিবার ও সমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আপনশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজের সমীহ আদায় করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ শিক্ষা কে দেবে, কীভাবে দেবে, এ বিষয়ে কোনো বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি যাননি। শান্তিনিকেতনে প্রাচ্যদেশীয় গুরুমুখী বিদ্যা ও উদার মানবিকতার আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের হিতকারী দিকটির যে সমন্বয় তিনি সাধন করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প থেকে দূরে এনে শিক্ষাকে একটি গণমুখী একতা দেওয়ার প্রয়াস তাঁর ছিল। কিন্তু এ শিক্ষা তাঁর জীবদ্দশাতেই আর কোথাও অনুসৃত হয়নি। এমনকি স্বদেশি আন্দোলনের সময় যে পশ্চিমা শিক্ষা বর্জনের লক্ষ্যে মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, গুজরাট শিক্ষাপীঠ ইত্যাদি গড়ে ওঠে, সেগুলোও কোনো অভিঘাত রাখতে সক্ষম হয়নি।

উপনিবেশপূর্ব ভারতীয় সমাজের চিত্রায়নে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আদর্শচিন্তার দ্বারস্থ হন। কিন্তু তাঁর প্রাচীন স্বদেশি সমাজ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তা কোন অর্থে? 'স্বদেশি সমাজ' এর যে স্বয়ম্ভর সমাজের ছবি তিনি আঁকেন, সেই সমাজ এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। বৃহত্তর স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, প্রকৃত শিক্ষার– অর্থাৎ যে শিক্ষা মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে – অভাব, কর্মের অভাব এসবই ছিল এ সমাজের পরিচয়। এ সমাজে জাত-পাত বিচার ছিল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল, নারী-পুরুষের সীমা নির্ধারিত ছিল। একটি দুর্গত আদর্শ দৃষ্টি দিয়ে তাকালে এ সমাজকে তুষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু এরকম তুষ্টি পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থেকে, একবারে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ভ্রান্তিও বটে। 'কালান্তর' প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, "একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত ... গল্প–গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ... দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা কেটে যেত" কেটে (কালান্তর : ১১)। এ বর্ণনায় শুধুই অবসরের কথা, কাজের কোনো কথা নেই। কাজ করত নিরন্ন কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ; আর এ অবসর ছিল, সচ্ছল-অসচ্ছল বাবুদের। বস্তুত উপনিবেশী শাসন আসার আগেও স্বদেশি সমাজে দরিদ্রদের জন্য (এবং তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি) একই উপনিবেশী অবস্থাই বিরাজ করছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশী সাম্রাজ্যবাদকে তাই এ সমাজ থেকে কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি।

সমাজ বলতে রবীন্দ্রনাথ যে সামূহিক একটি বিষয় বোঝান আসলে তা কি তাই? সমাজ কি একটি একক সত্তা, সমাজ কি নিরেট? নাকি সমাজ আপাত দৃষ্টিতে এক, যেহেতু ক্ষমতাবান সমাজপতিরা নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজের একতা জোর করে ধরে রেখেছেন, সমাজে রাধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পর্কটা কী? যদি বলা হয় পরস্পর শ্রদ্ধাবোধের, তবে ভুল বলা হবে। বরং যদি বলা হয় শোষক ও শোষিতের এবং তাদের মধ্যে স্থিতাবস্থা ক্ষমতাবানও ক্ষমতাহীনের চিরাচরিত ভারসাম্যের, তাহলেই তা হবে সত্য। অর্থাৎ ক্ষমতাহীনের ক্ষমতা নেই বলে তাকে ক্ষমতাবানকে মান্য করতে হয়। 'দুই

বিঘা জমির' উপেনের পক্ষে জমিদারের অবিচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। ফলে সমাজে কোনো বিবাদ নেই, এরূপ প্রমাণিত হবে। রবীন্দ্রনাথ যদি সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্য, বিরোধ ক্ষমতার আখ্যানের বিভিন্ন রূপ এবং জোর খাটানো ভারসাম্যের বিষয়টি উপনিবেশপূর্ব ভারতেও খুঁজে দেখতেন, তাহলে নিশ্চয় লক্ষ করতেন, এ সমাজ আত্মশক্তিতে জেগে উঠতে তৈরি নয়, এ সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণও নয় এবং অপরিবর্তিত কাঠামোর ভিতর এ সমাজ নিয়ে আশাবাদী হওয়াটাও কষ্টকর। এবং এটি মেনে নিলে একস্থানে তিনি যে উল্লেখ করেছেন, আমাদের গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো ইত্যাদির উন্নতি আমরা নিজেরাই করতে পারি, যদি ইচ্ছা করি, সেই ইচ্ছে না করাটার কারণটাও পাওয়া যেত। এ শোষণমূলক, বিভাজিত কিন্তু স্থানীয় ক্ষমতার চর্চায় একক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সমাজে এ ইচ্ছা করাটা নির্ভর করে ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাকেন্দ্রের ওপর। আর যদি এ ইচ্ছাটা তৈরি হয় নিচ থেকে, প্রান্তিক মানুষজনের পক্ষ থেকে, এ প্রয়োগের জন্য যে শক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে, তা হতে হবে হয় ওই কেন্দ্রের শর্ত মেনে, অথবা কোনো বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

সমাজের সামূহিকতা নিয়ে মার্ক্সবাদীরাও প্রশ্ন তুলেছেন, যেহেতু সামূহিকতা শ্রেণিবিভাজনের বিষয়টি আড়াল করতে চায়, তবে এর একটা সীমানাও তারা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রসঙ্গটির একটি দার্শনিক বিস্তার ঘটালে আমরা কী এর্নেস্টো লাক্লো, ও শাঁতাল মুফ-এর মতো বলতে পারি না, প্রত্যেক সামূহিকতার চরিত্রই আসলে অসম্পূর্ণ (লাক্লো ও মুফ : ৬৭)। সমাজ সম্পূর্ণ বলে কিছু নয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ যে সমাজের উল্লেখ করেন, তাতে নারীর অবস্থান বাড়ির সীমানার ভিতর। সমাজের দৃশ্যমান কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্রেই তার বিচরণ নেই। এ সমাজ তাহলে সম্পূর্ণ হয় কীভাবে? আর সমাজ যদি অসম্পূর্ণই হয়, তাহলে তার আত্মশক্তিরই বিকাশ ঘটে? তাহলে কি নেশন ও জাতীয়তাবাদের মতো সমাজও সম্পূর্ণভাবে পুরুষতান্ত্রিক? এ পুরুষতান্ত্রিকতার পক্ষেই তো সাম্রাজ্যবাদের প্রকল্প।

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় সমাজ যে পশ্চিমা রাষ্ট্রযন্ত্রের আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ল, সে তার ভিতরের শক্তির অভাবের জন্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে, প্রকৃত একক হলে, সে সমাজ টিকে থাকত। সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প ভারতে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পক্ষে ছিল শ্রেণি, বিত্ত ও জাতপাতে বিভাজিত সমাজব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে নেশনকে সদর্থকরূপে দেখেছেন, অর্থাৎ যে নেশন নিজের জনগণের সেবা করবে, সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসবে এবং পররাষ্ট্রের ওপর খবরদারি বা তাকে পদানত করার চেষ্টা করবে না, তার নজির তিনি দেখেছিলেন আদর্শিক ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে শক হুন পাঠান মোগল এক দেহে লীন হয়েছে, এ দেশ তার নিজস্ব ভূগোলের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেনি। কিন্তু সে কি তার রাষ্ট্রসংগঠনের অভাবের জন্য, তার সম্মিলিত ইচ্ছার অভাবের জন্য, না তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য, এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। আধুনিক নেশন সংগঠনের যে কতকগুলো সূত্র থাকে– যেমন, মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে নেশন হওয়ার পক্ষে প্রবল একটি ইচ্ছাশক্তি– যে ইচ্ছাশক্তিটি নেশনকে ভালো দিকে যেমন নিতে পারে মন্দের দিকেও তেমনি; দেশের সকল অংশের মধ্যে, যোগাযোগ; সমাজ সংগঠনে বৈষম্যহীনতা ও গতিশীলতা এবং নেশন ভাবগত বা মনোগত হলেও এর সদর্থক কার্যকারিতার পক্ষে সকলের একটি সম্মতি, তা কি ভারতবর্ষের ছিল? ভারতবর্ষের আর্যরা তো দ্রাবিড়দের ওপর সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছেন; ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ চলেছে, এবং সাগর তীরে লীন হওয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তহীন বিরোধ চলেছে এবং এখনও চলছে। আর্নস্ট রেনাঁ যে 'উইল অফ দ্যান নেশন' এর উল্লেখ করেন, তাতে জনগণ সংগঠিত ও সতর্ক না থাকলে সহিংসতা ঢুকে পড়ে। এ বিষয়টি হোমি ভাবা উল্লেখ করে নেশন-এর স্থানিকতা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, নেশন হচ্ছে সংস্কৃতির একটি স্থান বা ঠিকানা এবং এ স্থানিকতা যত না ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, তার থেকে বেশি সময়কে কেন্দ্র করে; (এটি) এক ধরনের জীবনযাপন যা 'জনগোষ্ঠী' থেকে বেশি জটিল;

'সমাজ' থেকে বেশি প্রতীকী; 'দেশ' থেকে বেশি দ্যোতনামূলক... (ভাবা, *দি লোকেশন অফ কালচার* : ১৪০)

এবং ভাবার সঙ্গে যোগ করে বলা যায় নেশনের ভৌগোলিকতার সঙ্গে মানসিকতার বিষয়টিও জড়িত।

বিভিন্ন জটিল আন্তঃসম্পর্কে জড়িয়ে পড়া নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও অবহিত ছিলেন। তাই তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সময় ভারতীয় নেশন–এর 'উইল' বা ইচ্ছা যখন সহিংসতার পথে গেল, তখন তার সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন করেছেন। তিনি দেখেছেন, ওই সময় থেকে কীভাবে ঘটনাবহুল সময়ের নানা প্রকাশকে ধারণ করে বিভিন্ন দল ও উপদলের চিন্তায় নেশন নিয়ে বিভিন্ন ভাবমূর্তির সমাবেশ ঘটেছে, যা ভারতমাতা থেকে নিয়ে রুশ বিপ্লবের আদর্শে তৈরি ভারত চিত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। মাহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নেশন চিন্তা প্রসঙ্গে আশীষ নন্দীর বক্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। নন্দী লিখেন, "তারা উভয়েই চাননি যে তাঁদের সমাজ এমন এক অবস্থার শিকার হবে, যেখানে ভারতীয় নেশনচিন্তা ভারতীয় সভ্যতাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যেখানে ভারতীয়দের বাস্তব জীবনযাত্রা শুধুমাত্র ভারত নামের একটি কল্পিত নেশন-এর চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে" (নন্দী : ১৫৫)। নেশন যখন জনগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে, সমাজকে ছাপিয়ে, দেশকে ছাপিয়ে, এক ব্যাপক অবয়ব ধারণ করতে থাকল তখন রবীন্দ্রনাথ সমাজের কাছে, গ্রামের কাছে, ব্যক্তির কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু সময়ের প্রতিকূলে এ যাত্রা বেশিদূর এগোবার কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প স্বদেশি আন্দোলনে সহিংসতা, বিচ্ছিন্নতা এবং বিভাজন যুক্ত করেছিল; তার প্রভাবে নেশন-এর চিন্তা বিপথগামী হয়েছে। ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায় উপন্যাসে এর নানা রূপ রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পটির পরিবর্তে আত্ম পর্যবেক্ষণ ও আত্ম সমালোচনার ওপর বেশি আলো ফেলেছেন।

নেশন থেকে যখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি গেছে নেশনালিজমের দিকে, তখন তিনি যে বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ছিল নেশনালিজমের নামে ইউরোপীয় নেশনগুলোর 'সংগঠনগত লৌহ

শৃঙ্খল' দিয়ে অবশিষ্ট পৃথিবীকে বেঁধে ফেলা। এ লৌহশৃঙ্খল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমাহীন এবং মজবুত (*নেশালিজম: ১৫-১৬*)। এ বর্বর নেশনালিজমকে তিনি ঘৃণা করেছেন। কিন্তু কল্পনায় ভেবেছেন, ভারতবর্ষের যে অন্তর্নিহিত ধর্ম একের ভিতর বহুকে মেলায়, দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের ঐক্যের সন্ধান করে, তার উদ্বোধন সম্ভব হলে ভারতের নিজস্ব ও মৌলিক নেশনালিজমের দেশকে সামনে এগোবার শক্তি যোগাবে। কিন্তু তা যে সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় সাম্রাজ্যবাদের প্রকল্পের কারণে, তা আমরা বুঝি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নানা লেখায় সমাজের ভিতরে, বিভিন্ন সমাজে সমাজে অনৈক্য এবং বিভেদের উল্লেখ করে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে নেশনালিজমের আরেকটি পথ তিনি সন্ধান করেছেন, যার একটি ব্যাখ্যা মিশেল ফুকোর *টেকনোলজিস* গ্রন্থের একটি বক্তব্য ধার করে দেওয়া যায়। ফুকো বলেন, পশ্চিমের রাজনৈতিক-জাতীয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিবর্গকে একটি জনগোষ্ঠীতে বা সামূহিকতায় সমন্বিত করা এবং এজন্য প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এ সামূহিকতাকে শক্তিশালী করার প্রয়াসের সংযোগ সৃষ্টি করা (ফুকো : ১৬২-৩)। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে ব্যক্তিকে উপজীব্য করেন এবং লিখেন, "আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব:" ('স্বদেশী সমাজ' সংকলন : ৬১) কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে, উদ্যোগটা কে নেবে? ব্যক্তি নিজে থেকে উদ্যোগ যে নেবে, সে সম্ভাবনা নেই কারণ সমাজের ভিতরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির রয়েছে অনেক দূরত্ব। আর ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করে এ সংযোগ সাধন যিনি বা যারা করবেন, তারাই বা কে? তাছাড়া এরূপ উদ্যোগ নেওয়ার যে প্রত্যয় ব্যক্তিতে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে হয়তো তৈরি হবে, সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প তাকেই নস্যাৎ করে দেবে। সেরকম অসংখ্য উদাহরণ উপনিবেশী ভারতে রয়েছে।

এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশাবাদের কাছে ফিরে যান এবং সমাজ ও জাতি, রাষ্ট্র বা দেশ ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নের একটি মানবিক

নিষ্পত্তির জন্য ভারতের সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারস্থ হন, যে বৈশিষ্ট্য তার "ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই" স্থান দেওয়া এবং লিখেন :

ভারতবর্ষের এ গুণ থাকাতে কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না, এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে?" ('স্বদেশী সমাজ', সংকলন : ৬৬)

প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালে লেখা। এরপর সাঁইত্রিশ বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, বরং এর বিপরীতটাই ঘটেছে। তার কারণ, সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার, তার নখদন্ত প্রদর্শন ও ব্যবহার এবং ভারতীয় সমাজের অনৈক্য এবং আত্মক্ষয়। জীবনের শেষ প্রবন্ধে তাই আরেকবার ক্লান্ত ও পীড়িত কিন্তু আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানব-অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখেছেন।

যদিও বাস্তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এ সম্ভাবনাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তথ্য সূত্র :

১. Bhabha, Homi, *The Location of Culture,* London and New York, Routeledge, 1994

২. ———, *Nation and Narration,* London and New York, Routeledge, 1990.

৩. Foucault, Miche,, *Technologies of the sèlf,* In LH Martin, H Gutman and PH Hutton (eds) *Technologies of the self,* Amherst: Universit of Massachusetts Press., 1988.

৪. Goos, Edmund, "On Rudyard Kipling, "*The Cecntury Mazagine,* vol. 42, Octoberer, 1891

৫. Hinderakdr, Eric, " The Four Indian Kings and the Imaginative Construction of the British Empire, *William and Mary Quarterly,* 3rd ser.53, 1996

৬. Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics,* London: Verso, 1985.

৭. Nandy. Ashish, 'The Illegitimacy of Nationalism: Rabindranath Tagore and the Politics of Self': in *Bonfire fo creeds: The Essential Ashish Nandy,* Delhi: Oxford University Press, 2004.

৮. Tagore, Rabindranath, *Nationalism,* London: Macmillan, 1918,

৯. সান্যাল, আশিস, রবীন্দ্রনাথ ও নেশনালিজম, কলকাতা; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ২০০৪।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর,* কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৫ [১৩৪৪]

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সংকলন* কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪০৭ [১৩৩২]

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *নৈবেদ্য* কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৮৩ [১৩০৮]

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সংকলন* কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৮২

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড,* কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৮।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড,* কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৮৪

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড,* কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৮২

আকারের মহাযাত্রা : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

জীবনের শেষ বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করলেন চিত্রকলার চর্চা। ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ মোটামুটি এ বারো বছরে তিনি আঁকলেন দু' হাজারেরও বেশি স্কেচ, ড্রইং, পেইন্টিং এবং ছাপচিত্র। এর আগে ১৯২৪ সালে *পূরবী*-র কোনো কোনো কবিতা লেখার সময়, বাতিল কোনো শব্দবন্ধ, পঙ্‌ক্তি বা স্তবককে কালি দিয়ে বুঝিয়ে সাজিয়ে নানা নকশায় বিন্যস্ত করে আঁকিবুকি করেছেন। সেগুলো কখনো নিয়েছে লতাপাতার রূপ, কখনো কোনো পাখি বা জন্তুর আদল। পাণ্ডুলিপির এ আঁকিবুকি যখন অলস-অলংকারের জায়গা থেকে আর্টের মহিমায় উত্তীর্ণ হলো তাঁর ১৯২৮ পরবর্তী চিত্র চর্চায়, তা দেখে এ উপলব্ধি যথার্থ হয় যে, শেষ বয়সের ওই ছবিতে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের একটা পূর্ব প্রস্তুতিও ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ছবি আঁকার একটা রেওয়াজ ছিল– আঁকিয়ে হিসেবে গুনেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভালো হাত ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি ছিল ভারত জুড়ে। রবীন্দ্রনাথেরও ছবির হাত মন্দ ছিল না। কিন্তু সেই হাতে নিয়মিত অনুশীলনীর তুলি তুলে নিতে তিনি অনেক সময় নিয়েছেন– এতটাই, যে ছবি আঁকা যখন তিনি শুরু করেন এক তীব্র আবেগ এবং ভালোবাসা থেকে, দেখা গেল, একেবারে নিজস্ব একটি ধারা তিনি তৈরি করে নিলেন, যার সঙ্গে তাঁর আগের বা সমকালের কারও ছবির কোনো মিল নেই। অবনীন্দ্রনাথের সহজ উদ্দীপনাময় এবং প্রাচ্যবাদী ধারা থেকে তিনি দূরে থাকলেন; দূরত্ব

বজায় রাখলেন গগনেন্দ্রনাথের আধা-ঘনকবাদী ছবি থেকেও। ছবি নিয়ে, শিল্প বা আর্ট নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক চিন্তা আছে রবীন্দ্রনাথের, আছে সুন্দর-অসুন্দর এবং শিল্পের উপায়–উদ্দিষ্ট নিয়েও অনেক ভাবনা। কিন্তু নিজের ছবিতে যে নন্দনতত্ত্ব তিনি ফুটিয়ে তুললেন, তার ব্যাপক কোনো ব্যাখ্যা তিনি কখনো হাজির করেননি। কখনো কোনো চিঠিতে, কোনো লেখায় তিনি হয়তো কিছু মন্তব্য করেছেন তাঁর নিজের ছবি নিয়ে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে পর্যবেক্ষণগত ধারাবাহিকতা নেই, পূর্বাপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আয়োজন নেই। যা আছে তা হলো, কোনো বক্তব্যের সূত্র ধরে নিজের কাজের কাছে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যাওয়া, অথবা কারও কোনো বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া। নিজের ছবি নিয়ে তাঁর বলা কথা এত অল্প যে একটি ছোট গ্রন্থ্ হিসেবেও সেগুলোকে সূত্রবদ্ধ করা যাবে না। তবে তারপরও তাঁর সেসব কথা আমাদের জানতে সাহায্য করে তাঁর চিত্রকলার পিছনের ইতিহাস, সেগুলোর মনস্তত্ত্ব আর শৈলীগত বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর রহস্যময়তা।

এ রহস্যময়তার বিষয়টি দিয়েই শুরু করা যাক। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, বিশেষ করে যারা তাঁর বিষয়বস্তুকে নানা ছকে ফেলে বিচার করেছেন, তাঁরা স্বীকার করেন, কিছু ছবি আছে, যেগুলোর ভিতর আছে রহস্যময় এক জগতের ইঙ্গিত; অথবা যেগুলো জীবন, সময় এবং মন নিয়ে একটা রহস্যময়তা তৈরি করে। এটি হয় আলো-আঁধারির যুগল-বিন্যাসে, গাঢ় বর্ণ প্রলেপের অপ্রথাগত চর্চায়, কোনো মানবী অথবা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর অন্ধকার উপস্থিতিতে। কিন্তু একই রকম রহস্যময়তা আছে সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা নিয়ে। যিনি এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন ছবি আঁকতে (এবং অতিপ্রজও), ছবির ভালোমন্দ বিচারটা যাঁর ছিল এতটা উন্নত এবং যিনি দেশ-বিদেশের ছবির ইতিহাসের পুরাতন এবং সমকালীন ধারাগুলো সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট অবহিত, তিনি কেন এত দীর্ঘ দিন হাতে তুলি তুলে নিলেন না? আর ছবি যখন আঁকতে শুরু করলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পথে পা বাড়ালেন সমকালীন শিল্পীদের থেকে, যার সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগসূত্র যে নেই তা নয়, কিন্তু যা ছিল নিজস্ব কিছু শর্তের অধীনে সক্রিয় এবং

আধুনিকতার এক বিশিষ্ট প্রকাশ ও ভাষ্য, তখন একে চিহ্নিত করার কোনো আগ্রহ কেন তিনি দেখালেন না? যার কবিতা, গল্প, উপন্যাসের ভাষা সপ্রাণ, গতিশীল এবং অনাবিল, তাঁর চিত্রকলার ভাষায় কেন রহস্যময়তা, নিজেকে লুকানোর একটি প্রয়াস অথবা অপ্রত্যাশিত কোনো জটিলতা– যেমন তাঁর আত্মপ্রকৃতিগুলোতে? রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো প্রতিকৃতি এঁকেছেন নিজের, যেগুলোর সঙ্গে ক্যামেরায় তোলা রবীন্দ্রনাথের ছবির মিল সামান্যই। আদলটা ঠিকই আছে, ছবি দেখে সবাই বলবে মুখটি রবীন্দ্রনাথের; কিন্তু অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টি, মুখের ওপর ও আশপাশে বর্ণের প্রয়োগ অথবা রেখার আঁকিবুকি এক অচেনা, ভিন্ন জগতের একটু দূরত্বে দাঁড়ানো একজন মানুষকে তুলে ধরে, যাকে জানা শিল্পীর যেন ফুরাল না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে ভাবের যে অফুরন্ত প্রবাহ- বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবসম্পদ শীর্ষক একাধিক অভিসন্দর্ভ লেখা হয়েছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং কে জানে হয়তো এখনো হচ্ছে– তা তাঁর চিত্রকলার সঞ্চার করতে কেন তিনি ছিলেন নারাজ? রাণী মহলানবিশকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর সেই বিখ্যাত জানিয়ে দেওয়া– তাঁর ছবি রেখা ও রঙের, ভাবের নয়– তাতে অনেক প্রশ্নেরও দেখা মেলে। যে 'ভাব' এর কথা তিনি বলেছেন, তা আসলে কি? তাঁর ছবির রহস্যময়তা নিয়ে এ যে কিছুকথা বলা হলো, তাতে কি ভাব নেই? নিশ্চয় আছে। যেমন ভাব আছে আত্মপ্রতিকৃতিতে তাঁর অভিব্যক্তিতে। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর কবিতা ও গানের ভাবের তফাৎটা তিনি কীভাবে নিরূপণ করেন, অথবা তাঁর ছবির দর্শক আমরা নিরূপণ করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তার একটা ব্যাখ্যা হয়তো এ যে, তাঁর ছবি ভাবসর্বস্ব নয়, ভাবটাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে তারা নেয় না। কবিতার সঙ্গে ছবির একটা তফাৎ– কবিতার দৃশ্যমানতা থাকে তার বাকপ্রতিমা-উৎপ্রেক্ষা-প্রতীক অর্থাৎ ভিতররূপে নিহিত। সে দৃশ্যমানতা পাঠককে নিজের চোখে জাগিয়ে তুলতে হয়, আর ছবিতে তার উপস্থিতি পুরো ক্যানভাস জুড়ে; সেটিই প্রথম সংযোগ ছবির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ছবিতে ভাবটাকে রেখেছেন একটা নিহিত রূপে, অর্থের অঞ্চলে; দৃশ্যমানতার অঞ্চলে আছে ভঙ্গি, বিন্যাস, মাধ্যমগত বিশিষ্টতা আর

শৈলীর স্বাক্ষর। রেখা ও রং-কে প্রধান বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকেন, তাতে ছবি হয়ে ওঠার ব্যাপারটা, তার শৈলীগত চিন্তাটা বাকি সব ছাপিয়ে ওঠে। যে ভাবকে খুঁজে নিতে হয় শৈলীর পিছন সঙ্গী হিসেবে, তাতে রহস্যময়তার একটা ছায়াতো পড়তেই পারে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এরকম অনেক প্রশ্ন মনে আসে। এবং এগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক সময় মনে হয়, ছবিগুলোতে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার, যে দৃষ্টিভঙ্গির, যে স্ফূর্তির এবং যে ব্যতিক্রমী শিল্পীসত্তার স্ফূরণ ঘটুক চেয়েছিলেন তা বুঝতে গেলে ছবিগুলোর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়, তাঁর সাহিত্য থেকেও বেশি তাঁর জীবনের নানা ঘটনা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের একটু মিলিয়ে দেখতে হয়; কিছু সীমাবদ্ধতা শুদ্ধ তাঁর শৈলী ও টেকনিকের বিশিষ্টতাগুলো চিহ্নিত করতে হয় এবং তাঁর ছবির বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান অথবা নৃত্যনাট্যের নানা অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান, এসব লেখা ও ছবিগুলোর মধ্যে ভাবগত কত মিল রয়েছে। আমার বরং মনে হয়েছে, ছবিগুলো তাঁরা গানের জগৎ থেকে ভিন্ন একটি জগৎ রচনা করেছে, যে জগতে সুন্দর-অসুন্দর, রূপ-রস অথবা জীবন ও জগৎ নিয়ে তাঁর ভাবনাগুলো নিজস্ব একটি পথে বিন্যস্ত হয়েছে। এ নিজস্বতা অনেক সময় প্রকাশবাদী ছবির তীব্রতা অথবা বিপন্নতা নিয়ে হাজির– কবিতা-গানের ভাবের প্রকাশ থেকে তা অনেকটাই আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বরং তাঁর ছবির বিষয়টি মাথায় রেখে দু'এক কবিতা লিখেছেন, অথবা দু'এক কবিতার ভিতরে ছবি নিয়ে তাঁর চিন্তাগুলো মেলে ধরেছেন। এর বাইরে তুলনা অবশ্যই চলতেই পারে– নিসর্গ নিয়ে তাঁর কবিতার তো অভাব নেই; অনেক ছবিতেও নিসর্গ আছে। তাদের মেলানো যেতেই পারে। কিন্তু ছবির নিসর্গ আর কবিতার নিসর্গে একটা ফারাক থেকেই যায়। ছবির নিসর্গে যে শক্তি, যে তীব্রতা– এমনকি সাঁঝের ছবিতেও– এবং রঙের বা অন্ধকারের যে উপস্থিতি, তা কবিতার নিসর্গে ততটা নেই। রবীন্দ্রনাথের ছবির কিছু সূত্র বরং লুকিয়ে আছে *'ছিন্নপত্র'*-এ, তাঁর নানা লেখালেখি এবং আলাপচারিতায়।

মোটা দাগে তাহলে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা যায়, যদি রহস্যময়তা এবং ছবিগুলোর নিজস্ব একটি ভুবন তৈরির প্রয়াসটিকে আমরা গুরুত্ব দিই এবং রেখা ও রংকে প্রধান করে ভাবকে অপ্রধান করার রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসটিকে বোঝার চেষ্টা করি। এ চারটি বিষয় হচ্ছে আগের বা সমকালের শিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব, তাঁর ছবির বিষয়বস্তু এবং শৈলীগত বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা; তাঁর ছবির আধুনিকতা এবং নিজের ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস এবং সময়ান্তরে হতাশা, যার সঙ্গে যুক্ত বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে প্রাথমিক উৎসাহের পর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়া এবং দেশের মানুষ যে তাঁর ছবি ঠিকমতো বুঝতে পারবে না, সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের আয়রনি ধারণা। আলোচনার মূল উদ্দেশ্যটি অবশ্য রবীন্দ্র চিত্রকলার মৌলিকত্ব এবং আধুনিক চিত্র ঐতিহ্যে এর অবস্থান শনাক্ত করা। এ কাজটি অনেকেই হয়তো করেছেন– শোভনসম অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন, কিন্তু তারপরও এসব ভাষ্যকার থেকে দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভব এবং দু'এক নিজস্ব চিন্তা হাজির করাও সম্ভব।

তবে সবার আগে নিজের ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের নিস্পৃহতা, ছবি আঁকা শুরুর কালের কিছু দ্বিধা এবং দ্রুতই তাঁর স্ফূর্তিলাভের বিষয়টিতে আরেকবার ফিরে যাওয়া যাক। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, সেই *ছিন্নপত্র* প্রথম পড়ার সময় থেকে যে, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে একটা শিল্পসত্তা সক্রিয় ছিল। যার দেখার দৃষ্টি ও দেখানোর কুশলতার বিষয়টি তাঁর কবিসত্তাকে সাহায্য করেছিল। *ছিন্নপত্র*-র অনেক চিঠিতে অন্ধকারের যে বর্ণনা তিনি দেন, তা একজন চিত্রকরের: যেন আকাশটা একটি ক্যানভাস অথবা কাগজ এবং তুলি ও কলম দিয়ে ক্রমাগত সেই ক্যানভাসে অন্ধকারের একটি এপিফ্যানিক রূপ নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন– এক প্রলেপ অন্ধকারের ওপর আরেক প্রলেপ অন্ধকার বিছিয়ে দিয়ে, সূক্ষ্ম ঘেরাটোপে তাদের আবার আলাদা করেও। *ছিন্নপত্র*- এর যুগটি রবীন্দ্রনাথের বাংলার মুখ দেখার সময়, তাঁর নিজস্ব স্বদেশি চিন্তার স্ফূরণের সময়। গ্রামবাংলার শান্ত নিস্তরঙ্গ রূপের বাইরেও এর দারিদ্র্য, এর সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক নানা বঞ্চনা

ও অচলায়তনের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছেন। এর প্রকাশ রোমান্টিক সবুজে অথবা অন্যান্য বর্ণসম্ভারে তিনি করতে পারতেন না, করেনওনি। তাঁর এ বঙ্গদর্শনের পিছনে যে কষ্ট ছিল, অনুভূতির তীব্রতা ছিল, সেগুলো ছবি আঁকার সময় ফিরে এসেছে। ফলে ছবি আঁকার প্রস্তুতি তাঁর যে দীর্ঘদিনের ছিল, তা-ই প্রতীয়মান হয়।

ছিন্নপত্র-এর একটি চিঠিতেই আছে এক স্বপ্নের বিবরণ, ঠাকুর বাড়ির মানুষজনের বেঢপ লম্বা হয়ে যাওয়া, বাড়ির ভাঙচুর আর এঁকেবেঁকে যাওয়া আর দেওয়ালে এক মানুষের আধখানা গেঁথে থাকা, আধখানা বেরিয়ে থাকার বিবরণ। অনেক বছর পর তাঁর ছবিতে যখন এ বেঢপতা আবার ফিরে আসে, ফর্মের ভাঙচুরের বিষয়টি আসে, তখন একটা সংযুক্তি ওইসব ছবি এবং এ চিঠির মধ্যে অবশ্যই করা যায়। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের নানা গল্প-উপন্যাসেও দেখা যায় একজন চিত্রকরের বাছাই দৃষ্টি। যেমন *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) উপন্যাসে শচীশ তার ডায়রিতে লেখে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে কম্বল পাতিয়া শুইলাম। সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটি কালো জন্তুর মতো– তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ....। (*চতুরঙ্গ* : ১৯)

এ জন্তুটি অনেক পরে পুনরুত্থিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। কিন্তু এ দুই আবির্ভাবের মধ্যে চলে গেছে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং কুড়ির দশকের কঠিন একটা সময়। রবীন্দ্রনাথ বীভৎস এবং বজ্রের একটা ভিন্নরূপও ততদিনে দেখেছেন, যেটি পুরো কৌতুকের না হলেও যাতে আয়রনি আছে। ছবির জন্তু বীভৎস নয়, সে *চতুরঙ্গ*-এর জন্তুর মতো কাঁদেও না। কিন্তু তার কৌণিকতায়, অঙ্গভঙ্গিতে কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম কৌতুক বোধ এবং আয়রনি আছে। যেন সভ্যতা ফুলে ফেঁপে, আপন গর্বে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেড়ে এখন আকৃতি হারিয়েছে, যদিও তার আদিমতাটুকু আছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্তুর অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। একটি ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া গেল।

নিজের ছবি নিয়ে খুব বেশি যে বলেননি রবীন্দ্রনাথ, তার একটি কারণ হতে পারে এ যে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, তাঁর অবস্থান কোথায়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর কবিতাখ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া; তাঁর কবিতা নিয়ে উৎসাহ ছিল সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে। পশ্চিমে তাঁকে প্রধানত দেখা হতো আধ্যাত্মবাদী, মরমী, ভারতীয় মেটাফিজিক্সের অনুসারী ইত্যাদি হিসেবে, যদিও পাশাপাশি তাঁর সমকাল সচেতন, জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা, *নৈবেদ্য*-র মতো বিশ্ব রাজনীতি এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উপনিবেশিকতার নানা জটিলতা নিয়ে লেখা শক্তিশালী কবিতাগুচ্ছেরও মূল্যায়ন হচ্ছিল, তাঁর রোমান্টিক চিন্তাকে, তাঁর আধুনিকতাকে চেনার চেষ্টা হচ্ছিল। কথাসাহিত্যক হিসেবেও তাঁর একটি অবস্থান ততদিনে সূচিত হয়ে গেছে। তাঁর নাটক ও গানও তাঁকে আলাদা আসনে বসিয়েছে। এসব পরিচিতি ছিল নির্দিষ্ট, তাঁর একান্ত নিজস্ব– এগুলো কারও সঙ্গে তাঁকে ভাগ করতে হয়নি। কিন্তু হঠাৎ ছবি আঁকা শুরু করে তিনি কতটা পরিচিত হবেন চিত্রকর পরিচয়ে? কোথায়, কোন পঙক্তিতে দাঁড়াবেন? ১৯২০-২১ সালে দীর্ঘসময় তিনি ঘুরেছেন ইউরোপে এবং আমেরিকায়। সেই ভ্রমণটি এক অর্থে তাঁর শিল্পভ্রমণও ছিল। ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমাদেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তারা প্যারিসে চিত্রপ্রদর্শনী দেখেছেন। অন্যান্য শহরেও দেখেছেন সমকালীন শিল্পের নিদর্শন। পশ্চিমের প্রভাববাদী, উত্তর-প্রভাববাদী, সুরিয়ালিস্ট এবং ডাডাবাদী ছবি দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং দেখে অভিভূত হয়েছেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় পশ্চিমা চিত্রকরদের ছবির একটি প্রদর্শনীও তিনি দেখেছেন যেখানে পল ক্লী এবং ক্যান্ডিনস্কির মতো শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল। অনেক চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর সরাসরি আলোচনাও হয়েছে। ফলে তিনি পশ্চিমা শিল্পধারাগুলোর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জানতেন, এসব ধারায় পা রাখাটা একজন ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে কঠিন, বিশেষ করে ছবি আঁকা শুরু করতে না করতেই। অথবা তিনি হয়তো ভেবেছেন, ভারতে যে ঐতিহ্য এর সমকালীন চিত্রচর্চাকে প্রভাবিত

করেছিল এবং নানা নতুন চিন্তাও হচ্ছিল ছবি নিয়ে, সেগুলোতেও তাঁর অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। রাজা রবি বর্মার ছবি ছিল ঠাকুরবাড়িতে। কিন্তু রবি বর্মার কোনো ছায়া নেই রবীন্দ্রনাথের কাজে। অবনীন্দ্রনাথ ও ইবি হ্যাভেলের প্রাচ্যবাদী চর্চা ও নব্য-বঙ্গীয় স্কুলের চিত্রকলার তিনি অনুসারী হতে পারেননি। ঠাকুরবাড়িতেই যে কিউববাদকে কিছুটা ভেঙে, কিছুটা ভারতীয় বিষয়বস্তুর ছাঁচে ফেলে নতুন বিন্যাস তৈরি করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, সেও যে তাঁর পথ নয় রবীন্দ্রনাথ তাও অনুধাবন করেছিলেন। সাহিত্যে তিনি নিজের একান্ত একটি পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন, যে পথটি একসময় একটি রাজপথের মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বাংলা সাহিত্যকে চিরদিনের জন্য বিশাল এক অর্জনের অনেক মাইলফলক দিয়ে গেল। কিন্তু ঐতিহ্যে ছবির এ রাজপথ তৈরি যে স্বল্পকালে সম্ভব নয়, তিনি হয়তো তা জানতেন। সেজন্যই কি এত প্রবল চিত্রচর্চা এক যুগের সময়কালে? রবীন্দ্রনাথ কেন অনেক আগে থেকে ছবি আঁকতে শুরু করেননি, এটি বিশুদ্ধ অনুমানের বিষয়ই বটে; তারপরও আমার মনে হয়েছে, তিনি যে একেবারে প্রস্তুতিহীন ছিলেন, নিজের ওপর কোনো আস্থা ছিল না আত্মপ্রকাশের, তাও নয়। প্রস্তুতি ছিল, হয়তো সময় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যকর্মের মাঝখানেও এরকম সময়ের ফাঁক চোখে পড়ে। ১৯১৬ সালে তিনি যে *চতুরঙ্গ* আর *ঘরে বাইরে* লিখলেন' এর ছয় বছর আগে লিখেছিলেন অসাধারণ আরেক উপন্যাস *গোরা* (১৯১০), তারপর দীর্ঘ তেরো বছর আর কোনো উপন্যাস নেই। কেন? আবার যখন লিখলেন, একই বছরে (১৯২৯ সালে) বেরুলো আরও দুই অসামান্য উপন্যাস *যোগাযোগ* ও *শেষের কবিতা*। এ দুই উপন্যাস সময় নিয়ে তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু কোন সময়ে কাগজে কলম চালিয়ে তিনি তাদের লিখবেন, সে সিদ্ধান্ত তিনি হয়তো সময়ের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যোগাযোগ ও *শেষের কবিতা*-র সময়টা, এ দুই উপন্যাসের সঙ্গে, তাঁর ছবির জন্য উপযুক্ত সময় হয়ে ধরা দিল। ততদিনে ইউরোপের চিত্রকলাতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল ছিলেন এসব পরিবর্তন বিষয়ে। কিন্তু প্রচলিত, পরিবর্তিত অথবা

পুরনো, কোনো ইউরোপীয় চিত্রধারাই একক গুরুত্ব নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দিল না। তিনি বরং কোনো কোনো ধারা থেকে কিছু কিছু উপাদান নিলেন। কিছু নিলেন দেশীয় ঐতিহ্য থেকে, কিন্তু মূল ভিত্তিটা রইল তাঁর একেবারে নিজস্ব। ফলে তাঁর রেখার ও রঙের ছবিতে জমা হলো প্রকাশবাদী, এমনকি পরাবাস্তববাদী কিছু ভাবনা; উত্তর-প্রভাববাদী কিছু নিসর্গ চিন্তা। কিন্তু বর্ণলেপন, নকশা এবং মোটিফের ব্যবহার, টেক্সচার এবং বুনোটের বিন্যাস, আলো-ছায়ার সংযোজন-বিয়োজন; মানুষ, জন্তু, পশুপাখি, গাছ বিরিক্ষি এবং ফুল-লতাপাতার আদল নির্মাণে সর্বত্রই তাঁর মৌলিক স্বাক্ষর।

এ জায়গাতে তাঁর পূর্বসূরি অথবা সমকালীন কোনো শিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই। দু'এক আলোচককে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি আলোচনায় জার্মান শিল্পী এমিল নোলডে এবং নরওয়ের শিল্পী, এডভার্ড মাঙ্ক এর প্রসঙ্গ টানতে এবং এদের প্রকাশবাদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশবাদী অভিব্যক্তি ও শৈলীর একটি তুলনা করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশবাদে ইউরোপীয় প্রকাশবাদের তীব্র পীড়ন-বিকার-বিক্ষোভ নেই, বরং রয়েছে এক ধরনের রহস্যের খেলা। মাঙ্ক-এর বিখ্যাত সেই ছবি *স্ক্রিম* বা চিৎকারের কথাটাই ভাবা যাক। একটি লোক লেলিহান আগুন থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে, তার করোটি সদৃশ মুখমণ্ডলে দুটি হাত দুদিকে রেখে সে চিৎকার করছে। এ চিৎকাররত লোকটি কে, কেন এ চিৎকার– এসব প্রশ্নের উত্তর মাঙ্ক না দিলেও ইউরোপীয় পটভূমিতে এগুলোর একটা মীমাংসা আমরা করতে পারি। যেমন : ফ্রানৎজ কাফকার *দি ট্রায়াল* পড়লে মি. কে-র পরিচয়টি জানতে বাকি থাকে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশবাদী ছবিতে যে বেদনা বা বিক্ষোভ, বা যে তীব্রতা তা যুদ্ধপীড়িত, আত্মিকভাবে বিশুদ্ধ এবং মূল্যবোধের ঘরে ক্ষয় হতে থাকা কোনো সমাজের নয়, বরং আত্মসংকটে পড়া, জীবনের রহস্যময়তায় জড়িয়ে পড়া কোনো ব্যক্তির। তাঁর ছবিতে নেতি কোনো দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে অশুভের ফুল ফোটায় না। বরং ব্যক্তিকে নিজের কাছে, অস্তিত্বের অন্ধকার অঞ্চল থেকে একটা প্রদোষের দিকে অন্তত নিয়ে যাওয়ার একটা আয়োজন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও সমাজ চিন্তায় ছিল দেশীয় ভাবনার

সমাহার; ইউরোপীয় ব্যক্তি-ধারণা ও সমাজব্যবস্থার (বিশেষ করে জাতীয়তাবাদের) ব্যাপারে যেমন তাঁর স্পষ্ট সমালোচনা ছিল, দূরত্ব ছিল, ইউরোপীয় প্রকাশবাদী সাহিত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তিনি এ দূরত্বটি –সমালোচনা না হলেও– তাঁর ছিল। ফলে তাঁর ছবিকে ইউরোপীয় কোনো ছাঁচে ফেলে মাপা উচিত হবে না। চিত্রকর হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একক বিশিষ্টতা নির্ণয় করাটা শুধু এ কারণেই জরুরি নয়, যে এর ফলে তাঁর পূর্বসূরি বা সমকালীন অন্যান্য শিল্পী থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য একটা নিজস্ব মহিমায় দাঁড়িয়ে যাবে; এটি এজন্যও প্রয়োজন যে, তাঁর ছবিতে তিনি ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় ঘটানোর জন্য এতটা নিজস্বতা নিয়ে ছবিগুলো আঁকলেন, সেগুলোকে তাতে চিহ্নিত করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের একটা তালিকা করলে সেটি সংক্ষিপ্তই হবে, যেহেতু পাঁচ বা ছটি উপাদান সেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু এ প্রতিটি উপাদানই তাঁর চিত্রকলা ছাড়া সাহিত্যের মানস গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল তাঁর স্বদেশ চিন্তা, যে সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বদেশ চিন্তার একটি উত্তর-উপনিবেশী রূপ তাঁকে দেশে, জাতীয়তাবাদ ও জাতি সম্পর্কে নিজস্ব কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল, যার বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'স্বদেশী সমাজ', 'ভারতীয় সমাজ' সহ নানা প্রবন্ধে, এমনকি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। স্বদেশ চিন্তার একটি রূপ ছিল লোকঐতিহ্যে চোখ ফেরানো। তাঁর চিত্রকলার নেপথ্যে লোকঐতিহ্যের প্রেরণাদায়ী একটি ভূমিকা ছিল। সেই ১৮৯১ সালেই তিনি অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুকে উচ্চ শিল্পের বাইরে গিয়ে লোকশিল্পের নানা প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সময়টা রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার ছিল না, তবে ছিল তাঁর চিত্রভাবনা ও শিল্পদর্শনকে সংহত করার সময়। পরে যখন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কার্যক্রম শুরু হয় এবং কলাভবন কেন্দ্রিক শিল্পচর্চার সূচনা হয়, তাতে দেশীয় শিল্পের প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনা ছিল। তিনি নিজে যখন শিল্পচর্চা শুরু করেন, তাঁর ছবিতে লোকশিল্পের রংগুলোকে নিয়ে আসেন। তাঁর উজ্জ্বল রং, বিশেষ করে লাল ও হলুদ, কোনো ইউরোপীয় প্যালেট

থেকে নেওয়া নয়, এসব রং লোকশিল্পের শক্তির পিছনে কাজ করেছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এসব রং ব্যবহার করেছেন, লেপেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে খুব মিল লোকশিল্পের রং ব্যবহারের। একসময় রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী ছবির প্রশংসা করেছেন, এমনকি ১৯০০ সালে বাণভট্টের *কাদম্বরীকে* ভিত্তি করে জে পি গাঙ্গুলির আঁকা ছবিগুলো নিয়ে আলোচনার সময় ভারতীয় ইতিহাসভিত্তিক বিষয় আশয়ের পরিবেশনায় পশ্চিমা বাস্তববাদী পন্থার প্রয়োগের পক্ষেও মত রেখেছেন। (শিব কুমার : ৬-১৪) কিন্তু নিজে যখন ছবি আঁকতে শুরু করলেন ঐতিহাসিক বিষয় থেকে দূরে থাকলেন, বাস্তববাদী শৈলীকেও এড়িয়ে চললেন। তাঁর দু'এক ছবি আছে, নারীমুখ অথবা কোনো জন্তুর, যেগুলোর সঙ্গে লোকশিল্পের নারীমুখের বা জন্তুর সাদৃশ্য প্রবল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার দ্বিতীয় একটি উপাদান ছিল রেখা ও রেখা থেকে তৈরি হওয়া আকার নিয়ে তাঁর নিরন্তর খেলা। তাঁর আগের বা তাঁর সময়ের আর কোনো শিল্পী রেখা এবং আকার নিয়ে এতটা অভিনিবেশ দেখিয়েছেন কিনা আমাদের জানা নেই। রেখাপ্রধান ছবি অনেকেই এঁকেছেন—খারাই ড্রইং বা স্কেচ এঁকেছেন, লিনোকাট উডকাট এসব করেছেন, তাদের রেখা নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু রেখার নন্দনতত্ত্ব রেখার দর্শন নিয়ে এতটা বক্তব্য কেউ রাখেননি, যতটা রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন। ১৯২৮ সালে রাণী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে একটা রেখা থেকে শুরু হয়ে একটা আকার দাঁড়িয়ে যায় কোনো বস্তু বা ব্যক্তির এবং এ বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন, ওই আকারের লেখা আবিষ্কারই তাঁর ছবির একটা উদ্দেশ্য। যে প্রক্রিয়ায় রেখা থেকে আকারের উদ্ভব, সেটি খুব সম্মোহিতের মতো তিনি অনুসরণ করতেন; ফলে তাঁর শিল্পের ভিতরে একই সঙ্গে পরিকল্পনা ও স্বতঃস্ফূর্ততা সক্রিয় ছিল। রেখা নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস তাঁর ছবিকে একটা দার্ঢ্য দিয়েছে। তাঁর একটি ছবি আছে, যেখানে এক নারী দীর্ঘ চুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। পিছন ফেরা সেই নারীমূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন রেখার অসংখ্য বলিষ্ঠ টানে। তার চুল উড়ছে বাতাসে, শাড়ির আঁচলও আন্দোলিত বাতাসে। তার

আদল গাঢ় বাদামি-কালো রঙে অস্পষ্ট করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই নারীমূর্তির সিলোয়েট প্রস্ফুটিত দুদিকের উজ্জ্বল হলুদ রঙের কনট্রাস্টে। নারীমূর্তির এ্যানাটমিতে খুঁত নেই, শুধু একটি হাতের দুর্বল অঙ্কন ছাড়া, কিন্তু এ নারীর সজীব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে রেখা ও রঙের যুগলবন্দি তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতার। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবকে বাইরে রেখে ছবির গঠনের দিকে মনোযোগী হলেন, তাতে তাঁর ছবি কোনো ভাবগত বা আদর্শগত ভিত্তি নির্মাণের দায় থেকে মুক্ত হলো, যে দায় নব্যবঙ্গীয় স্কুল অথবা পশ্চিমা একাডেমিক বা আধুনিকতাবাদী শিল্পের চর্চাকারীদের কাজকে একটা সীমায় আটকে রেখেছিল। এবং ছবির গঠন-গড়ন এবং শৈলীগত বিষয়গুলো গুরুত্ব পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের আকার-দর্শন সমকালীন অন্যান্য আধুনিক শিল্পচিন্তার মতো বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

রবীন্দ্রনাথের ছবির তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর জ্যামিতি। আমরা জানি, আধুনিক চিত্রকলায় জ্যামিতির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিউববাদীরা তো বিশ্বাসই করতেন, বস্তুর মূর্তরূপ তার জ্যামিতিতে, তার দৃশ্যমান কোনো অনুষঙ্গে নয়। আমরা এও জানি, জর্জে ব্রাক, মার্শেল দুশাম্প-এর জ্যামিতিনির্ভর কাজের তারিফ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রকলায় যেমন জ্যামিতি, কবিতায় তেমন ইন্টেরিয়র মনোলগ, উপন্যাসে টাইম-শিফট টেকনিক এবং চরিত্রের খণ্ডায়ন। ভার্জিনিয়া উলফ যে বলেছিলেন, ১৯১০ সালের পর মানুষের অভিজ্ঞতার রাজ্যে ঘটে গেছে এক ব্যাপক পরিবর্তন, মানুষ আর আগের মানুষ নেই, তার পিছনেও ছিল ১৯১০ সালে উত্তর প্রভাববাদীদের বিখ্যাত সেই প্রদর্শনী, বস্তুর বাইরের প্রকাশের পরিবর্তে তার ভিতরের সত্তা, সেই সত্তার আকার-নিরাকার-জ্যামিতির দিকে মনোযোগী হওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসেও আধুনিকতার এসব উপাদানের ব্যবহার করেছেন। *চতুরঙ্গ*(১৯১৬)-এর খণ্ডায়ন বা ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়েছে এসব কিছু সূত্র মেনেই। কিন্তু *চতুরঙ্গ* -এর খণ্ডায়নের সঙ্গে উলফ বা জেমস জয়েস-এর ফ্র্যাগমেন্টেশনের সাযুজ্য নেই; এসব রবীন্দ্রনাথের দেশ-কাল চিন্তার প্রতিফলন অনুযায়ীই হয়েছে। তাঁর চিত্রকলার জ্যামিতিও কোনো পশ্চিমা ঘরনার নয়, এটি তাঁর একান্ত নিজস্ব। এ জ্যামিতিতে

কৌণিকতা আছে, খণ্ডায়ন নেই; রেখার সঙ্গে ক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব আছে, নিরালম্বতা নেই। রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি তাঁর আকার নির্মাণের লীলাকে আরও রহস্যময় করে। কিন্তু নেতির কোনো ভঙ্গুর আবরণে ঢেকে দেয় না। রবীন্দ্রনাথের জ্যামিতি শুধু ফর্মে, বস্তু বা ফিগারের পরিগৃহীতরূপে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জ্যামিতি প্রথমত অনুভবের, অর্থাৎ বস্তুর a priori যে চিন্তা, যা থেকে ওই বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি হতে পারে– আবার নাও হতে পারে, সেই অনুভবের। পরক্ষণে অথবা সমান্তরালভাবে বস্তুকে রূপ দেয়, চিন্তাকে ভাষা দেয়, সেরকম চিত্রকল্পে থাকে জ্যামিতি। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে সুমিতি বা Symmerty-এর অভাব দেখা যায়। ওই অভাব প্রথাগত জ্যামিতি-চিন্তাকে অতিক্রম করা একটি মৌল জ্যামিতি চিন্তা; যা ফর্মের বিন্যাসকে বিশ্বস্ত করে কখনো জটিল কখনো বা পরস্পরবিরোধী বহু ভাবনার কাছে।

জ্যামিতির পর যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়, তা একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে প্রশংসা ও সমালোচনার পাত্র করেছে। মধ্য-ষাটের পর যখন তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন অনেকে বলেছিলেন, ছবিগুলো তাঁর শেষ বয়সের নাকি দ্বিতীয় শৈশবের শখ। তারা শিশুসুলভ অনেক ত্রুটিও পেলেন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যেমন তাঁর নাক-কান-হাতের যথাযথ আদল গড়ার অক্ষমতা, তাঁর ছবিতে কিম্ভূতকিমাকার জীবজন্তুর চলাফেরা। এসবকে সমালোচকরা শিশুসদৃশ কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। এ 'শিশুসদৃশ' বর্ণনাটি বেশ চালু হয়ে গেলে আনন্দ কুমারস্বামী দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি শিশুসুলভ বা শিশুসদৃশ নয়, শিশুশোভন। কিন্তু যে নামেই বর্ণনা করা যাক, এ শিশুশোভন কল্পনাটি তাঁর জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে পরিপাটি ফর্ম ও রং চিন্তা নেই, দক্ষ হাতের মুন্সিয়ানা নেই, বরং যে এক জীবন্ত কল্পনা এ্যানাটমি অথবা আকৃতি বা অনুপাতগত বিচারকের অস্বীকার করে ছবির জগৎকে ভরে দিচ্ছে বিচিত্র সব চিত্রময়তায়, তাই যেন তাঁর ছবিকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ঠিক যেমন *গীতাঞ্জলি* অথবা *নৈবেদ্য*- এর কবি *শিশু*-র কবিতাগুলো লিখেছেন এবং এসব কবিতায় নিজের প্রতিভার শতভাগ ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেননি,

তেমনি তাঁর চিত্রকলাতেও শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টিকে, তার কল্পনার ডানাকে মেলতে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবির পঞ্চম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের গতি, শক্তি এবং অস্থির ভাব। জন্তু বা পাখির রূপায়ণে যে গতি সে হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু একটি ফুল বা নারীমুখের রূপায়ণে গতি কিভাবে তৈরি করতেন রবীন্দ্রনাথ? আমাদের মনে হয়, গতির সঙ্গে শক্তিকেও তিনি একত্রে নিয়ে আসতেন। উত্তর প্রকাশবাদী ছবিতে শক্তি ছিল একটি স্বাভাবিক উপাদান, কিন্তু ফুলের ছবিতে? রবীন্দ্রনাথ এ গতির সঞ্চার করতেন ফুলের ছবিটাকে একেবারে সামনে নিয়ে এসে, যাকে বলে ক্লোজ আপ কাঠামোয় এনে, তাকে জীবন্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে। একই সঙ্গে রঙের শক্তিশালী প্রয়োগটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঘন রং, রঙের কন্ট্রাস্ট- এসবই গতি ও শক্তির যোগান দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে ধ্যানমগ্নতা লক্ষণীয়- বিশেষ করে নিসর্গের ছবিতে। কিন্তু পাশাপাশি শক্তি ও গতির মধ্য দিয়েও প্রকৃতি, মানুষ ও জন্তু-পাখিকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন।

তবে পূর্বতন ও সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য ছিল দৃষ্টিভঙ্গিগতও। রবীন্দ্রনাথও ছবি আঁকাকে একটা আনন্দিত অনুশীলনের, ভিন্নলোকে বিচরণের এবং বিকল্প নির্মাণের একটি ভুবন হিসেবে দেখেছেন, যেভাবে কোনো শিল্পীই অথবা খুব কম শিল্পীই হয়তো দেখেছেন। পশ্চিমে, স্বদেশে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল এক সৌম্য, বুদ্ধিদীপ্ত এবং আত্মসমাহিত কবি ও সন্তের; কিন্তু এ রূপবন্দনায় রবীন্দ্রনাথের হয়তো শতভাগ সমর্থন ছিল না।

তিনি যে, 'আমার আমি' অর্থাৎ তাঁর একান্ত নিজস্ব রূপটিকে জানতেন– যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল– তার প্রকাশ হয়তো অনেক অসংগতি সৃষ্টি না করে তাঁর পক্ষে ঘটানো সম্ভব ছিল না। চিত্রকলায় তিনি অবলীলায় তা করতে পেরেছিলেন, তাঁর ভিতরের শিশুকে বাইরে এনে তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন এবং রূপ-অরূপের দ্বান্দ্বিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে রূপের ভিন্ন ব্যাখ্যাও হাজির করতে পেরেছিলেন। এজন্যই বোধ করি

চিত্রকলার পিছনে তাঁর সময়ের অভিনিবেশের এবং চিন্তার এতো বিনিয়োগ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় অবশ্যই তাই তিনি নিজে হয়ে উঠেন গুরুত্বপূর্ণ। ছবিতে তাঁর 'আমিত্ব'র প্রকাশটি ছিল দ্বিবিধ–প্রথমটি ছিল স্পষ্ট, যেমন আত্মপ্রকৃতিগুলোতে। সেখানে নিজেকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে নিজের প্রতিকৃতি রচনার পাশাপাশি নিজেকে নিয়ে ভাবার কিছু চিহ্ন রেখে গেছেন। এ আত্মদর্শন হাল আমলের উত্তরাধুনিক চিন্তার Self-reflexivity-এর সমতুল্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে উত্তরাধুনিকতার উল্লেখ দেখে অনেকে হয়তো ভ্রূ কুঁচকাতে পারেন; কিন্তু তাঁর সাহিত্যের এবং চিত্রকলার কোনো কোনো প্রকাশ-বিবেচনায় তা একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে। উত্তরাধুনিক চিন্তার চর্চাকারীদের মতোই তো রবীন্দ্রনাথ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের আবরণে সাজিয়েছেন তাঁর অথবা পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো; প্রচুর পরিমাণ Self-reflexivity-এর সমাবেশ ঘটিয়েছেন আত্মপ্রতিকৃতিগুলোতে, *ছিন্নপত্র*-এর চিঠিগুলোতে, অন্যান্য অনেক লেখালেখিতে– এমনকি নিজেকে নিয়ে কৌতুকও করেছেন এবং *ঘরে বাইরে* এবং *চার অধ্যায়*-এর মতো উপন্যাসে নির্মিত এবং নির্মীয়মাণ ইতিহাসকে এবং ব্যক্তি ও নানা সংঘের ওপর এর প্রভাবকে তদন্ত করে দেখে তাঁর স্ববিরোধগুলো তুলে ধরেছেন এবং এ তুলে ধরার ক্ষেত্রে স্যাটায়ারের ব্যবহারও করেছেন। স্বদেশ ও সমাজ নিয়ে লেখা তার প্রবন্ধগুলো পড়লেও বোঝা যায়, তিনি কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন এসবের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ে। এ অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট কাঠামোগুলোর বিপরীতে তিনি মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণকে বড় করে দেখেছেন, উত্তরাধুনিকবাদীদের মতো নৈরাজ্যকে যদিও মেনে নেননি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকতার সূত্রগুলোর প্রয়োগ খুব সীমিত আকারে হলেও করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তো ইতিহাস ও ক্ষমতা কাঠামো নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য প্রধানত প্রকাশে। এবং সার্বিক বিচারে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত

স্বাতন্ত্র্যে। রবীন্দ্রনাথের মতো কৌতুক বা সূক্ষ্ম স্যাটায়ার খুব বেশি লেখক-কবি-চিন্তাবিদ ব্যবহার করতে পারেননি। গুরুর পাশে লঘুকে প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে স্থাপন করেননি। *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী লৌহশাসন ও যন্ত্রের পীড়নের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতীকী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরাধুনিকতা নিয়ে দু-একটি লেখা আমার চোখে পড়েছে। এর একটির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ পলিটিকস, কালচার অ্যান্ড সোসাইটির* ১৭শ খণ্ডে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উত্তরাধুনিকতার নন্দনতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কেনেথ আর স্টাঙ্কেল লিখেন, রবীন্দ্রনাথ শিল্পের ক্ষেত্রে তত্ত্ব বা থিওরি প্রয়োগকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতেন (স্ট্রাক্রেল: ২৩৭) এ অবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধেও। তিনি শিল্পের অঞ্চলকে খোলামেলা এবং অনাকীর্ণ একটি প্রান্তর হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যেখানে মুখ্য শিল্পী-উনশিল্পের সহজ প্রকাশ সমকালীন পশ্চিমা শিল্পের প্রতিষ্ঠানের অনুগত হওয়ার অনিচ্ছা, সহজ বা লোকজ শিল্পের (তথাকথিত নিম্নশিল্পের) ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি উত্তরাধুনিক চিন্তাভাবনাতেও দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের আমিত্ব-এর প্রকাশ দ্বিতীয় যে পথে এসেছে তাঁর চিত্রকলায়, তা সমকালীন অন্যান্য আধুনিক শিল্পীর চলা পথ থেকে খুব স্বতন্ত্র নয়। তাঁর ছবিতে ভাবের খেলা নেই বলে তিনি জানিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোতে যে আত্মমগ্নতা আছে, যে Subjectivity আছে, তার সঙ্গে যোগ আছে সময়, সমাজ ও ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা-যার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে এবং প্রবন্ধ-চিঠিপত্র ইত্যাদিতে দেখা যায়। সমকাল নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল যুদ্ধপীড়িত বিশ্ব এবং উপনিবেশী শাসন নিয়ে তাঁর শঙ্কা ছিল; কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিভাবনায় ছিল বোধ-অনুভূতির নানা প্রকাশ। এগুলো সাহিত্যে এক ভাবে মূর্ত হয়েছে, চিত্রকলায় অন্যভাবে। বিষয়ের সাযুজ্য থাকলেও প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য ছিল এ দুই ক্ষেত্রে। সাহিত্যে যেখানে অনেক ব্যাখ্যায়, বর্ণনায়, প্রতীক-উপমা ইত্যাদির সাহায্যে সেসবকে তিনি বাঙ্ময় করেছেন, চিত্রকলায় করেছেন রেখা ও রঙের যুগলবন্দিতে। কিন্তু তাঁর ছবির জন্তু বা পাখিগুলো দেখে, মানব-মানবী অথবা নিসর্গকে

দেখে ঠিক বোঝা যায় তাঁর আত্মমগ্নতা ও সমকাল দর্শনের একটি নিকষিতরূপে এরা সঞ্জাত।

রেখা ও রঙের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্যায়ের সাহিত্যের, বিশেষ করে উপন্যাসগুলোর একটি বিশেষ দিকে তাকাতে আমাদের প্রলুব্ধ করে। ১৯২৮ সাল যদি হয় পূর্ণোদ্যমে তাঁর আঁকার সূচনা বছর, তাহলে এ সময় থেকে হওয়া তাঁর উপন্যাসগুলোতেও দেখা যায় চরিত্র অঙ্কনগত একটি পরিবর্তন। তাঁর চিত্রকলার মানবীদের মতোই কিছুটা রহস্যময় যেন লাবণ্য, (*শেষের কবিতা*) শর্মিলা (*দুই বোন*) এবং নীরজা (*মালঞ্চ*)। শর্মিলার যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দেন, তা একজন চিত্রকরের–

বড় বড় চোখ; ধীর গভীর চাহনি; জলভরা মেঘের মতো নিথর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণ রেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত.....। (*দুইবোন* : ৩) ইত্যাদি।

রেখা দিয়ে যেমন আকার সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছবিতে তেমনি শেষ পর্বের উপন্যাসগুলোতে তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতেও যেন রেখার বৈশিষ্ট্য হাজির হয়েছে। সৈয়দ আকরম হোসেন-এর মতে "এ পর্যায়ের উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যে আছে ইঙ্গিত; লক্ষ করা যায় সূক্ষ্ম আঁচড়ে অনেক কথা বলার প্রবণতা" (হোসেন)।

রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তু ব্যাপকভিত্তিক ছিল না। তাঁর ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা একমত হবেন যে, আত্মপ্রতিকৃতির বাইরে এগুলোকে মোটামুটি পাঁচ-ছটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য; জীবজন্তু ও পাখি, প্রতিকৃতি; ফিগার বা অবয়বভিত্তিক ছবি; স্থির বস্তু ও বাড়িঘর এবং নকশাধর্মী নৈর্ব্যক্তিকতা। মোটা দাগের এ বিষয়বস্তুগুলোর ভিতর অবশ্য অনেক বৈচিত্র্যও চোখে পড়বে, যেমন প্রকৃতির মধ্যে ফুল ও লতাপাতার ছবি আসবে, জীবজন্তু ও পাখির সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যাবে নৃত্যরত তিনটি মাছের এক অপূর্ব ছবিকে। এ বিষয়গুলোর মধ্যে কোনোটা বাস্তবধর্মী– যেমন মাছ বা কোনো মানবীর প্রতিকৃতি। অনেক ছবিই যেন ওঠে এসেছে পরাবাস্তবের জমিন থেকে মনের

কোনো কল্পনা অথবা উৎকল্পনার মাঠ থেকে। মানুষ ও জীবজন্তুর ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ফর্মের বিস্তর ভাঙচুর করেছেন, বিকৃতি ঘটিয়েছেন আদলের, অবয়বকে কৌতুকের মাত্রায় হাজির করেছেন। কোনো কোনো ছবিতে grotesque-এর উপস্থিতি প্রবল। কেনো কোনো জন্তু হাজির হয় প্রাগৈতিহ্যসিক একটি মাত্রায়, যার প্রধান বিশেষত্ব এক অনিয়ন্ত্রিত জ্যামিতি। মানুষ ও জীবজন্তুর (এবং পাখির) এ্যানাটমি নিয়ে তিনি যে নিরন্তর এক খেলা খেলেছেন, তাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থেকেও আকারের বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সংসারটা যে আকারের এক মহাযাত্রা, সে কথা একটা কবিতাতে তিনি উল্লেখ করেছেন (*শেষ সপ্তক* -এর কবিতা ১৫/২.৫৭); তাঁর ছবি দেখে মনে হবে, জগৎ সংসারটাই যেন শামিল হয়েছে আকারের ওই মহাযাত্রায়। যে ভাঙাচোরা, কৌণিক-কমিক রূপে জীবজন্তু, এমনকি মানুষগুলো বিন্যস্ত, তাতে মনে হতেই পারে রবীন্দ্রনাথ যেন বাস্তব এবং প্রথার আকার নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন, যেন নিত্যনতুন আকারের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আকারের প্রতিষ্ঠিত আয়তন ভাঙারই একটি প্রয়াস। আর এসব জীবজন্তু ও মানুষ দেখতে দেখতে মনে হবে, যেন ক্রমাগত আকার বদল হচ্ছে, যেন তারা সদা পরিবর্তনশীল Protean এবং ধাবমানতা, শক্তি ও গতিশীলতা যেন জঙ্গমের এক বিশাল অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্যানভাস জুড়ে।

এ গতিশীলতা এবং ধাবমানতার– এমনকি স্থির নিসর্গ চিত্র বা প্রকৃতির নির্মাণ কৌশলে রেখা-রঙের স্পন্দনের সঙ্গে- সংগতিপূর্ণ ছিল ছবিতে কোনো শিরোনাম না দেওয়ার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটি। নাম দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তাঁর নিজের ভাষায়, কোনো বিষয় ভেবে তিনি আঁকতেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, "দৈব্যক্রমে একটা কোনো অজ্ঞকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে, যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলো-তারা অনাহূত এসে হাজির-রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে।" (*শিল্প চিন্তা:* ২৮৪) এজন্য একটি বড় বিষয়কে যেমন প্রকৃতির

সামনে রেখে যখন তিনি ছবি আঁকতেন, সেগুলোর আলাদা আলাদা রূপ বা প্রকাশ না খুঁজে বরং একটি সূত্রবদ্ধ চিন্তার তিনি প্রকাশ ঘটাতেন। ছবিগুলোর শিরোনাম দিলে হয়তো বৃহৎ ওই বিষয়টি খণ্ডে খণ্ডে তাঁকে সাজাতে হতো। এমনকি শিল্পী যে শিরোনামের জায়গায় 'শিরোনামহীন' বসিয়ে দেন, বিমূর্ত ছবির চর্চাকারীদের মধ্যে অনেক সময় যা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাও করেননি। কাজেই দর্শককে কোনো প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি থেকে ছবিতে গিয়ে সেগুলোর বিষয় কী, শিরোনাম থেকে তা জেনে নিয়ে ছবি দেখার পরিবর্তে বিষয়টি নিজ থেকে তার বুঝে নেওয়ার এক ধরনের প্রেরণাও এ শিরোনামহীনতা নিশ্চিত করে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির যেসব বিশিষ্টতার কথা উপরে উল্লেখ করেছি, সেগুলোকে আরেকবার বিবেচনায় আনলে আমরা তাঁর আধুনিকতার রূপটি বুঝতে কিছুটা সক্ষম হব। এ আধুনিকতার কাল এবং ঐতিহ্যসচেতনতা ছিল এবং ছিল ব্যক্তি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটি প্রয়াস; ছিল প্রকাশের ক্ষেত্রে একেবারে নিজস্ব একটি শৈলী এবং ভঙ্গি বেছে নেওয়া এবং একই সঙ্গে ছবিতে বাস্তব-পরাবাস্তবের দ্বৈরথ, কৌতুক-কিম্ভূতকিমাকৃতির ব্যবহার, ছিল লোকজ শিল্পের রং অথবা নকশাকে ছবিতে ব্যবহার করা এবং আকারের জঙ্গমতা ও গতিশীলতার! ছিল রবীন্দ্রনাথের আমিত্বকে ঢেকে না রেখে তাঁর ছবির একটি বিষয় এবং সার্বিক অর্থে তাঁর ছবির একটি reference বা উল্লেখ হিসেবে নির্ণয় করা এবং তাঁর সময়ের ভারতীয় শিল্পচর্চার ধারাগুলো থেকে দূরে এবং একই সঙ্গে পশ্চিম থেকেও তাঁর দূরত্ব বজায় রেখে এক নিজস্ব প্রকাশবাদী ধারা সৃষ্টি করলেন, যার সঙ্গে অন্যকোনো শিল্পীর মিল দৃশ্যগোচর নয়। তাঁর ছবিতে আঁকার দুর্বলতা আছে, সে কথা অনেকে লিখেছেন; কিন্তু সেই দুর্বলতা একটি self-reflexive পথে তাঁর চিত্রকলায় বৈচিত্র্য এবং নতুনত্বের যোগান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি আধুনিক ছিল ব্যক্তিকে এবং অথবা ব্যক্তির চিন্তাকে ক্যানভাসের মাঝখানে নিয়ে আসায়। এ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের অনেকের মধ্যেই ছিল না। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বলতে অবশ্য অবয়বধর্মিতাকে বোঝায় না–অবয়ব আর ত্রিমাত্রিক ব্যক্তি এক নয়, বরং সময়ের

ও সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিপতিত ব্যক্তির বোধগুলো যখন প্রধান হয় কোনো প্রকাশে, তাকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা এবং সময়ের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়টি শনাক্ত করা কঠিন নয়। তাছাড়া তার জীবজন্তুকে দেখে মনে হবে যেন তাদের মধ্যেও মানুষের সংকট-শঙ্কা-উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া লেগেছে; যেন তাদের পৃথিবীটা মানুষেরই পৃথিবী, মনুষ্যসমাজ থেকে দূরে কোনো অভয়ারণ্যে নয়। যেরকম টেড হিউজের কাক, জাগুয়ার, অথবা পাইক মাছ মানুষের জীবনের নানা ধূর্ততা-বিপন্নতা-নিষ্ঠুরতাকে মূর্ত করে, রবীন্দ্রনাথের জন্তুরাও যেন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণেই কিনা, রবীন্দ্রনাথের ছবি সপ্রাণ, সতেজ; এমনকি ঘন বাদামি লালের মিশ্রণে দেওয়া প্রেক্ষাপটে সামান্য একটু সাদা ঘের টেনে আলাদা করা ঘনরঙে আঁকা গাছ, মানুষ অথবা জন্তুর অদৃশ্যতার বিপর্যয়ে পড়ে না, কেননা, ওই প্রেক্ষাপটে যেমন প্রাণ ও শক্তি আছে, সেরকম শক্তি আছে ওই ফিগারেও।

নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাই ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। তিনি জানতেন বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয়টি একজন চিত্রশিল্পী ছিল না। ১৯২৮ সালের অনেক আগেই তিনি কবিগুরুর আসনে সমারূঢ়। তাঁর ছোট গল্পের তুলনা হতো বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের সৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর গান এক সম্পূর্ণ নতুন সংগীত ধারা তৈরি করেছে যার তুল্য কোনোকিছু বাঙালি অভিজ্ঞতার ছিল না। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি সর্বাগ্রদের কাতারে। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি অর্জন করেছেন এক অতিমানবীয় মহিমা। মানুষ নতুন করে তাঁর আরেকটি পরিচয়ে দেখতে উৎসাহ পাননি, বিশেষ করে তাঁর ছবির সঙ্গে সামান্য কিছু মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার কারণে। ১৯৩০-এর দশকে ছবির প্রতিলিপি করাটাও ছিল দুরূহ; অসম্ভব না হলেও। তাঁর গান যেখানে পৌঁছে যেত শুনতে আগ্রহী সকল বাঙালির ঘরে, তাঁর কবিতা পৌঁছে যেত পড়তে আগ্রহী সকল বাঙালির ঘরে, তাঁর চিত্রকলার ব্যাপারে এমন হওয়া সম্ভব ছিল না। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই এমনটি বলা যায়। ছবি নিয়ে লেখালেখি বা চিত্র-সমালোচনারও তেমন রেওয়াজ

ছিল না। অনেক মানুষ যা দেখেনি, যেগুলোর দু'এক প্রতিরূপ হয়তো মাত্র দেখেছে এবং যা নিয়ে তেমন আলোচনাও হয়নি, সেই ছবি নিয়ে ভারতীয়দের মধ্য উচ্ছ্বাস থাকবে, তেমনটি ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সে কারণে হতাশ ছিলেন, কিছুটা ক্ষুব্ধও ছিলেন– কেন ভারতীয়রা তাঁর ছবি বুঝতে পারেনি বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেনি, তা নিয়েও অভিমান ছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দেশে তাঁর ছবিগুলো আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না। মজার ব্যাপার চিঠিতে তিনি উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে 'আমার জন্মভূমি' কথাটি লিখেছিলেন, অর্থাৎ দেশের মানুষ তাঁর ছবির সমঝদার হতে না পারার দায় যেন তিনি জন্মভূমির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিলেন। "অযোগ্য, অভাজনদের স্থূল হস্তাবলেপ অসহ্য হয়ে এসেছে," তিনি লিখেছিলেন। ইন্দিরা দেবী এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশকেও তিনি একই সংকল্পের কথা লিখেছিলেন এবং যামিনী রায়কে তো এর একটা ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন তিনি "চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি।" (উদ্ধৃত অধিকারী :) তাঁর নাটক বা কবিতা নিয়ে যারা সমালোচনা করেছেন, তাদেরকে 'অযোগ্য, অভাজন' বলে তিনি কখনো অভিহিত করেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। সেরকম কড়া মন্তব্যও আমার চোখে পড়েনি। অথচ চিত্রকলা-অবোদ্ধাদের তিনি প্রায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। এ থেকে কী মনে হয় না, নিজের ছবির প্রতি কতটা সংবেদনশীল ছিলেন তিনি?

যে আঁকিবুকি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, একদিন সেটি আকারের মহাযাত্রায় দাঁড়িয়ে গেল। সেই যাত্রার ধ্বনি কাল থেকে কালান্তরে বাজবে, বাজতে থাকবে, এ কথা খুব প্রত্যয় নিয়েই বলা যায়।

সূত্র :

অধিকারী, সুশোভন, 'রবীন্দ্রনাথের ছবি : চিত্রির দৃষ্টিতে' পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২ : ৪৩-৪৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চতুরঙ্গ উপন্যাস সমগ্র,* ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৭।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দুইবোন, উপন্যাস সমগ্র,* ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ সপ্তক, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৯৬।

শিবকুমার, আর, 'রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান আর্ট সীন, মাই পিকচার্স : এ কালেকশন অফ পেইন্টিংস বাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিউ দিল্লি : ভিভা, ২০০৫ : ৬ - ১৪।

স্টাঙ্কেল, কেথেন আর, 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড দি ইসথেটিকস অফ পোস্টমর্ডানিজম' ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ পলিটিক্স, কালচার এবং সোসাইটি, ভল্যুম ১৭, সংখ্যা-২, শীত ২০০৩; ২৩৭-২৫৯।

হোসেন, সৈয়দ আকরম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা : একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড : ২০০১।

'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ' : "শিল্পচিন্তা, সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা : গ্রন্থলয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।

শাহ্ আব্দুল করিম : গণমানুষের বাউল

সাত আট বছর আগে, শাহ্ আব্দুল করিম যখন জীবিত ছিলেন এবং তাঁর সম্মতিতেই, তাঁকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ ও পাঠসংকলনের পরিকল্পনা করেন সিলেটের সুলেখক ও কবি শুভেন্দু ইমাম। আমাকে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানালে উপরের শিরোনামে একটি লেখা তাঁকে পাঠিয়ে দিই। শুভেন্দুর হাতে জমা পড়ে অনেক যশস্বী লেখকের প্রবন্ধ। কিন্তু নানা কারণে বইটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়। শাহ্ আব্দুল করিম প্রতিটি লেখাই পড়েছিলেন– এ রকমই লিখেছেন শুভেন্দু। হয়তো করিম জানতেন বইটি তিনি নাও দেখে যেতে পারেন। বাস্তবেও তাই হলো। তিনি দেহরক্ষা করলেন ২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, তিরানব্বই বছর বয়সে। আর শুভেন্দুর সম্পাদনায় 'শাহ্ আব্দুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি' বেরোয় ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু শাহ আবদুল করিম যে 'গণমানুষের বাউল' অভিধাটি মেনে নিয়েছিলেন, তাতে যে তাঁর আপত্তি ছিল না, সেটি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। প্রবন্ধটি লেখার বেশ আগে ২০০৩ সালের শেষের দিকে এক সকালে সিলেট শহরের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তিনি এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান শাহ্ নূরজালাল। একটি সংগঠন তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল। আর আমাকে অনুরোধ করেছিল তাঁর সম্পর্কে দুটি কথা বলার জন্য। অনুষ্ঠানে একজন সরকারি কর্মকর্তার আসার কথা ছিল; তাঁর বিলম্ব হচ্ছিল। একটা ঘরে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। শাহ্ আবদুল করিমের পাশে বসে আধাঘণ্টার মতো কথা বলার সুযোগ হয়েছিল

আমার। মিতব্যয়ী কথক ছিলেন করিম। কথা বলতেন কম। কারও কথা পছন্দ না হলে নিজের ভিতরে ডুবে যেতেন। খুব যে সুস্থ ছিলেন তা নয়; নূরজালাল মাঝে মাঝে উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, কিছু লাগবে কিনা। তারপরও আমাদের কথা এগোচ্ছিল। শাহ আবদুল করিমকে যখন জানালাম, তাঁকে আর দশজন বাউল থেকে আমি আলাদা করে দেখি, তিনি গণমানুষের বাউল, তিনি একটু হেসে বলেছেন, মানুষ ছাড়া কোনো বাউলের আর কোনো বিবেচনা কি থাকতে পারে না? মানুষকে না ভজলে কি সৃষ্টির রহস্য জানা যায়?

আমার মনে পড়ল তাঁর একটি গানের কথা, যেখানে মানুষ ছাড়া মানুষ যে বাঁচে না, তার কথা আছে। তাঁকে কথাটা বলতে তিনি চোখ বন্ধ করলেন এবং গুন গুন করে গানের মতো করে বললেন,

সব দেশে সব জায়গায় মানুষ
প্রেম মেলাতে নারী-পুরুষ
মানুষেতে আছে মানুষ
রয় না মানুষ মানুষ বিনা।

জীবনে ওই একবারই তাঁর কাছে বসার ও একান্তে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। সেজন্য ওই সংগঠনটিকে এবং দেরিতে আসা সেই সরকারি কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ।

ব্যক্তি শাহ আবদুল করিম নিয়ে আমার উৎসাহটা বাড়ে তাঁর 'কালনীর ঢেউ' বইটি পড়ার পর। ১৯৮১ সালে বইটি বেরুলেও এর কয়েক বছর পর এটি আমার হাতে আসে। করিমের সুনামগঞ্জেরই এক তরুণ কবি মোহাম্মদ সাদিক বইটি আমাকে উপহার দেন। মনে আছে, 'কালনীর ঢেউ'-এর প্রতিটি গান মুগ্ধতা নিয়ে পড়েছিলাম। এ বইটিতে আছে তাঁর বিখ্যাত 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' গানটি অথবা দেহতত্ত্বমূলক 'আমি তোমার কলের গাড়ি তুমি হও ড্রাইভার/ তোমার ইচ্ছায় চলে গাড়ি দোষ কেন পড়ে আমার' গানটি। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সহধর্মিণীকে, যাকে তিনি সরলা বলে ডাকতেন এবং তাঁর মুর্শিদ বলে বিবেচনা করতেন। বই প্রকাশের খরচ মেটাতে নিজের নয় বিঘা জমি তাঁকে বিক্রি করতে হয়েছিল।

বইটির মুখবন্ধে কবি দিলওয়ার লিখেছিলেন, "শিল্পী আবদুল করিম আমাদের কর্মবিমুখ বন্ধ্যাজনিত নৈরাশ্যের জগতে একটি গভীর নলকূপের সমান" এবং "আমাদের আবদুল করিম এ অমাবস্যার পাহাড়ে উজ্জ্বলতম অন্তর্জ্বালা নিয়ে প্রতিবাদে বিস্ফোরিত হয়ে সক্রিয় থাকুন, এটাই কাম্য।" অথচ বইয়ের ভিতরে পঁয়ষট্টি বছরের করিম জানাচ্ছেন–

কমিতেছি তিলে তিলে ছেলেরা মুরব্বি বলে
ভবের জনম গেল বিফলে, এখন সেই ভাবনায় রই।
এবং
যা হবার তা হয়ে গেছে আবদুল করিম ভাবিতেছে
এমন একদিন সামনে আছে, একেবারে করব সই।

এ কেমন মানুষ, যিনি বিস্তীর্ণ ভাটি বাংলায় ঘুরে বেড়ান, একসময় যেমন দূরবীন শাহ, বারিক মিয়া, কামাল উদ্দীনের সঙ্গে গান গেয়ে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে– মানুষকে উদ্দীপনা দেন, জেগে ওঠার মন্ত্র শোনান, শোষকের এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস দেন, একই সঙ্গে ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক ও দেহতাত্ত্বিক প্রভৃতি গানের সাথে জাগরণীমূলক ও দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান এবং একজন বাউল হয়েও গণমানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের কেন্দ্রে নিজেকে স্থাপন করেন? আমার সেই আধঘণ্টার বৈঠকে আমি চেষ্টা করেছি মানুষটিকে যত সম্ভব জানতে, বুঝতে; তাঁর মনোজগতে একটি উঁকি দিতে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা এমনই ছিল যে, একটি সৌজন্যের আড়ালের এপার থেকেই আমার কথাবার্তা শেষ করতে হয়েছে, কৌতূহলের পর্দা টানতে হয়েছে। শুধু যখনই নূরজালালের সঙ্গে পরিচয় হলো, এবং স্নিগ্ধ হেসে নূরজালাল জানালেন, তাঁর গলায় বাবার গান তুলতে তাঁর ভালো লাগে, শাহ আব্দুল করিম গলায় একটু বিষণ্নতা মেখে বলেছিলেন, 'হি দিন তো আর নাই।'

এ বছর বইমেলায় অন্বেষা- সুমন কুমার দাশের 'বাংলা মায়ের ছেলে' নামে শাহ আবদুল করিমের যে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তাতে

সিলেটের নাট্যকর্মী নিরঞ্জনদের নেওয়া তাঁর একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেল। করিম একবার ছেলেকে বলেছিলেন, "বাউল হয়ে তুমি তো আমার নাম ডুবিয়ে দেবে, যে পরিবেশ এসেছে এটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা এসে গেছে" (৭৪)। আগে যে দিন তিনি কাটাতেন, তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলে মিশে থাকার দিন পাল্টে এসে গেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর অমিলের দিন। তারপরও মানুষের ওপর তাঁর বিশ্বাসে একটুও চিড় ধরেনি। তাঁর সহজ সাধনার কেন্দ্রে ছিল মানুষ এবং সে মানুষ যে শুধু আত্মসন্ধানী তা নয়; সে মানুষ রাজনীতির, অর্থনীতির এবং পুঁজি বাজারের শাসন ও শোষণে বিপর্যস্ত। তবে যে মানুষ সমাজের নানা বিরোধ-অসংগতি সত্ত্বেও এসব থেকে অনেক উপরে ওঠে এবং নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখে। করিমের ভাবনায় ছিল বিপন্ন, কিন্তু স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং মুক্তিকামী এ মানুষ।

যতীন সরকারের মতে, শাহ আবদুল করিম "ধোঁয়াশাপূর্ণ মরমী তত্ত্বের কল্পনাজগৎ ছেড়ে এসে ....সর্বহারার দুঃখজয়ের পথ সন্ধানেও প্রবৃত্ত হয়েছেন" (ইমাম, ৪৮)। বস্তুত তাঁর বাউল সত্তাকে শাহ আবদুল করিম কোনো আধ্যাত্মিকতার চাদরে, কোনো মেটাফিজিক্সের আবরণে ঢেকে রাখেননি। বলেছেন, "মন্ত্রপড়া ধর্ম নয়, কর্মকেই ধর্ম মনে করি।"(ইমাম, ৯৫)। আর অসংখ্য গানে ভাটি বাংলার এ বাউল শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ডাক দেন।

বাউল আবদুল করিম বলে সূক্ষ্ম রাস্তা ধরো
শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে বাঁচার উপায় করো।

২.
শাহ আবদুল করিম তাই একাধারে বাংলাদেশের বাউল ঐতিহ্যের একজন সাধক, আবার গণমানুষের গীতিকার ও গায়ক; তিনি একই সঙ্গে বিচরণ করেছেন মরমীবাদী, দেহতত্ত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক গানের ভাবের জগতে এবং মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের নানা অঞ্চলে। তাঁর নিজস্ব যে সংগ্রাম ছিল অভাবের বিরুদ্ধে, শোষণবাদী সমাজের বিরুদ্ধে, তা তাঁর যুক্তিবাদী চেতনা ও কর্মীমনকে প্রেরণা

জুগিয়েছে নিজের ও মানুষের জন্য পথ খুঁজে নিতে; আবার শুদ্ধপ্রেমের মহিমায়ত্ত তিনি গেয়েছেন, অন্তরের স্বরূপ সাধনার কথাও বলেছেন। তিনি নিজেকে বাউল হিসেবেই দেখতেন, কিন্তু 'তত্ত্বগান' গাওয়া কোনো মরমী কবি হিসেবে নয় বরং সেই বাউল হিসেবে যিনি তুলে ধরেন দেশের দুঃখ-দুর্দশার ছবি। অনুভবের, ভাবের ও সাধনার এবং দুরন্তর জীবন সংগ্রামের দুই ভিন্ন জগতে এত সহজে একই সঙ্গে আর কেউ বিচরণ করতে পেরেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। তাঁর এ শক্তি, মানবপ্রেম ও শ্রেয়বোধে প্রচণ্ড আস্থা, এ অনিসন্ধিৎসু কিন্তু অস্থির ও প্রতিবাদী মন– তাঁকে গণমানুষের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। ভাটির সংগ্রামী জীবন, বেঁচে থাকার পথে বিচিত্র সব প্রতিবন্ধকতা তাঁকে ভিতরে ভিতরে এক যোদ্ধায় পরিণত করেছিল; কিন্তু ভাটির প্রকৃতি, এর বর্ষার উদাত্ত রূপ এবং দিগন্তবিস্তারী অনাকীর্ণতা তাঁকে এক উদার দৃষ্টি এবং সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য সহমর্মিতা দিয়েছিল। ফলে তাঁর গানে বাউল গানের মেজাজটা আছে, ভাবটা কিন্তু গানের বাণীতে প্রতিধ্বনিত হয় গণমানুষের প্রতিদিনের জিজ্ঞাসার সুর, অনেক অনিষ্পন্ন প্রশ্ন। কৃষকের কথা, শ্রমিকের কথা, সাধারণ মানুষের কথা তাঁর গানে এতবার উচ্চারিত হয় যে, তিনি এক বিপ্লবের বার্তাবহ হিসেবেই যেন ভাটি বাংলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেটিকে সম্পন্ন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, এরকম মনে হওয়াটাও খুব অমূলক নয়। বস্তুত সুমন কুমার দাশের জীবনীগ্রন্থ পড়লে এ ধারণার প্রতি একটি সমর্থনই পাওয়া যাবে। বিশেষ করে তাঁর দু'এক সাক্ষাৎকারও জানা মন্তব্য-বক্তব্য থেকে।

৩. শাহ আবদুল করিমের বাউল সাধনার রূপটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলে তিনি কীভাবে একই সঙ্গে বাউলের ভাবান্দোলন এবং সমান-রাজনীতি-ইতিহাস সচেতন গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন, তা সুষ্ঠু ভাবে জানা যায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় খণ্ড) বাউল শব্দটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করছে : "ভক্ত যখন বায়ুর মতো ভগবানে মিশিয়া যাইতে পারে তখনই তিনি প্রকৃত বায়ুর বা বাউল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। বায়ু যেমন নিজের অস্তিত্ব

হারাইয়া, সকল স্থানে সর্বাবস্থায় যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, লোকে যখন আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া তেমনইভাবে ভগবানে বিলীন হইতে পারে, তখনই সে প্রকৃত বাউল পদবাচ্য হইবে।" শাহ আবদুল করিমের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞাটি অনেকার্থেই প্রযোজ্য। তবে তাঁর ভগবান প্রাতিষ্ঠানিক ভগবান ছিলেন না, তাঁকে শুধু মসজিদে খুঁজতে যাননি তিনি। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে পেয়েছেন মানুষের মধ্যে। অসংখ্য গানে তিনি সৃষ্টিকর্তার অরূপ রূপের সন্ধান করেছেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসটি ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়-মনুষ্যকেন্দ্রিক। ফলে মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বর ভজনা সমাপ্ত করেছেন। লিখেছেন–

পূজবে কেন গাছপাথর আপন ঘরের খবর কর
আদম খোদার রংমহল ঘর গড়লো পাঞ্জাতন শানে।
অথবা,
মসজিদকে খোদার ঘর বলি
মন্দির ভগবানের ঘর
আসলে খোদার আরশ
ছয় জমিনের অন্তর...

একটি গানে তিনি দীনবন্ধুকে ডেকেছেন, বলেছেন, "ওরে বন্ধু দয়াল নামটি ধরো/কাঙাল জানিয়া তুমি আমায় দয়া করো, দীনবন্ধু রে।" দীনবন্ধুর কাছে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তার দয়ার লালায়িত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের মতো, তিনিও যেন বলেছেন, "তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে"। শাহ আবদুল করিম কাঙাল বিশিষ্ট অর্থে। তিনি কাঙাল অর্থাৎ দরিদ্র; আবার তিনি ক্ষুধার্ত ব্যগ্র। করিম কাঙাল হয়েছেন, দরিদ্র হয়েছেন, ক্ষুধার্ত হয়েছেন দীনবন্ধুর স্পর্শের জন্য, গাইছেন "দয়া দেখাও আমারে গো, দয়া দেখাও।" দয়া শুধু করুণা নয় গভীর করুণায় নিকষিত ঈশ্বরের একটি রূপ, তার পুলকময়, দীপ্তিময় প্রকাশ; তার বিমূর্ত ও অন্তর্লীন উপস্থিতি। এ পুলক ও করুণায় বায়ুর মতো নিজ অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছেন বলে শাহ আবদুল করিম বাউল। আবার বাউলের পক্ষে তাঁর ভগবানকে যদি

অনুভব করতে হয় মানুষের মধ্য দিয়ে, তাহলে সেই মানুষের সাধনায় এবং সেই মানুষের মধ্যে যখন "আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া" তিনি বিলীন হবেন, প্রকৃত বাউলের উপস্থিতি তখন তাঁর মধ্যে নিশ্চিত হবে। আবদুল করিমের মানব সাধনার ব্যাপ্তি সেই আদি মানব থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানব। সেই মানুষের তালাশে নামতে পারে এমন মানুষই– অর্থাৎ যে মানুষ একটি শুদ্ধরূপে, সকল মানুষের চেতনাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তৈরি হবে। ওই মানুষটিই বাউল-বায়ুর মতো সর্বত্র যার উপস্থিতি। তিনি যখন বলেন "মানুষ হয়ে তালাশ করলে মানুষ পায়/নইলে মানুষ মিলে না, বিফল জনম যায়" তখন প্রথম মানুষটি একটি পরিচিতি সেই বাউলের এবং দ্বিতীয় মানুষটি শুধু ভাটিবাংলা বা বাংলাদেশের মানুষরূপে, শাশ্বতরূপে সংহত বিশ্বমানুষ। একটি গানে তিনি লেখেন–

আবদুল করিম হুঁশে থাকো মানুষ ভালোবাসতে শিখো
অন্তরে অন্তরে মাখো রবে না ভবযন্ত্রণা।

শাহ আবদুল করিম বাউল সাধনার আরেকটি পথ অতিক্রম করেছিলেন প্রেমের গাড়িতে চড়ে। মোটর গাড়ি উপমাটি তাঁর গানে ঘুরে ফিরে আসে এবং রাস্তায় মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধবয়সী বাস বা 'কন্ডেম' গাড়িতে তিনি জীবনের একটি উৎপ্রেক্ষা হিসেবেও দেখেছেন। তাঁর প্রেমের গাড়ির যাত্রাও মসৃণ নয়। কখনও প্রেম তাঁকে কষ্ট দেয়, কখনো দেয় আনন্দ। "আসি বলে গেল বন্ধু আইল না/ যাইবার কালে সোনা বন্ধু / নয়ন তুলে চাইল না" অথবা, "বিচ্ছেদের অঙ্গারে পুরে/ কলিজা অঙ্গার"– এর পাশে "সখি কুঞ্জ সাজাও গো/আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে।" কিন্তু প্রেম এক অনিবার্য লীলা বাউলের জন্য এবং বাউলের অনুভব এরকম "আমি ফুল, বন্ধু ফুলের ভ্রমরা/ কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া।" প্রেমের প্রকাশে শরীরের একটি অবস্থান আছে, কিন্তু তা প্রধান নয়; যেহেতু প্রেমের সঙ্গে আরাধনার একটি যোগসূত্র আছে আবদুল করিমের সহজিয়া আরাধনায় শুদ্ধরূপের প্রাধান্য ছিল-সেই শুদ্ধরূপ ঈশ্বর এবং প্রেমের এবং পরস্পরের গূঢ় সম্পর্কের।

৪. যতবার শাহ আবদুল করিমের গান শুনি, তাঁর 'কালনীর কূলে' অথবা 'কালনীর ঢেউ' অথবা 'ভাটির চিঠি' উল্টেপাল্টে দেখি, পড়ি, মনে হয় এ মানুষটি তাঁর জীবনযাপনে, কর্মে, সাধনায় মানবদর্শনকেই প্রতিফলিত করে গেছেন। তাঁর হৃদয় ছিল বর্ষায় ভাটির হাওরের মতোই বিশাল এবং আর্দ্র। মানুষ তাঁকে কাছে পেয়েছে তাদের কষ্টের সময়ে, সংগ্রামে, প্রতিরোধে এবং উদ্দীপ্ত হয়েছে তাঁর প্রাণস্পর্শী গানে, যার কেন্দ্রে আবার সেই মানুষ। নিরঞ্জন দে-কে করিম জানাচ্ছেন, ১৯৭১ সালে, "খান মিলিটারি এসে গেছে তখন তারা (রাজাকার-আলবদর) গিয়ে সেখানে দোয়া করত, বলত আল্লা, ইসলামটিকে টিকিয়ে রেখো। তো আমি মরে যাচ্ছি, আমার মা-বোনের ইজ্জত চলে যাচ্ছে আমরা লাখো লাখো মানুষ মরে যাচ্ছি আর এখানে ইসলাম কীভাবে থাকতে পারে, তারা এটাকে ইসলাম বলল (!)। হউক মুসলমান আর হিন্দু। "শতবর্ণের গাভী একই বর্ণের দুধ, ত্রিজগৎ বিচারী দেখি একই মায়ের পুত" – এ ছিল তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস।"

শাহ আবদুল করিম ছিলেন গণমানুষের বাউল, তাদের দুঃখের দিনের কাণ্ডারি শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন। তিনি বেঁচে রইলেন অনেকগুলো পরিচয়ে, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যে একজন বাঙালি এবং বিশ্বমানব ছিলেন, সে পরিচয়টি আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণা দেবে, যেমন দেবে তাঁর বাউল সাধনার গানগুলো।

নজরুল ইসলামের বৈশ্বিক চিন্তা

১.

তৃতীয় সহস্রাব্দের দরোজায় দাঁড়িয়ে, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হয়েও আমরা দেখতে পাই, বৈশ্বায়নের তীব্র-স্রোতের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এবং স্রোতটি ক্রমাগত আমাদের পশ্চিমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে বৈশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি আসলে ওই পশ্চিমায়নই– সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ও মিডিয়া– সবক্ষেত্রেই এ কথাটি সত্য। পশ্চিম যদি এ বৈশ্বায়নের আওতায় প্রাচ্য থেকে এক আনা গ্রহণ করে, প্রাচ্য পশ্চিম থেকে গ্রহণ করে পনেরো আনা। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিম আবার প্রাচ্য-সক্রিয়, যেহেতু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং অনাবিষ্কৃত রাজ্যটি প্রাচ্যে। এজন্য পশ্চিমের একজন ব্যবসায়ীর কাছে বৈশ্বায়ন হচ্ছে 'পূর্বের' দেশগুলোর দিকে ধাবিত হওয়া। বৈশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত হেতুভাসের ইঙ্গিতবহ এ বিষয়টি। বৈশ্বিক চিন্তার পিছনে যে দর্শন এবং এর প্রায়োগিক যে রূপ, তার ওই বৈশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মতোই ভিতরে একটা গুরুতর ব্যবধান রয়ে গেছে। দর্শনের ক্ষেত্রে উদার হতে বাধা নেই– যদিও এডওয়ার্ড সাঈদ প্রমুখ প্রাচ্যবাদী দেখিয়েছেন সেই দর্শনও অনেক সময় অনুদার; ক্ষমতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা স্বার্থবাদী চিন্তায় আকীর্ণ সে কথা একটু পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার মাত্রাটি যে একটু বেশি সেটি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। সেই উনিশ শতকের বৈশ্বিক সংস্কৃতির চিন্তা থেকে নিয়ে বিশ শতকের 'বৈশ্বিক

গ্রামের' চিন্তা পর্যন্ত এ সীমাবদ্ধতাটি লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণকে টেনিশন, কার্লাইল এবং এন্টনি ট্রলোপ সমর্থন এবং অসমর্থন করেছেন, কিন্তু একথা তিনজনই মেনে নিয়েছেন যে, পশ্চিমা সভ্যতা পুবের সভ্যতাকে উন্নত করছে, যে কথাটি টমাস -ব্যাবিংটন- ম্যাকেলে তার 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন' প্রবন্ধে অনেক নগ্নভাবে উপস্থাপনা করেছেন। টেনিসন তার একটি কবিতায়– 'আকবরের স্বপ্ন' (১৮৯২)– দেখিয়েছেন, এক নব্য রাজা আর্যদের মতো আকবর অনুধাবন করেছেন তাঁর শুরু করা সভ্যতা বিস্তারের কাজটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে, কিন্তু ইংরেজরা সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উনিশ শতকের ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদদের কাছে বৈশ্বিক চিন্তার একটি অর্থ ছিল সারা বিশ্বে পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু এর পিছনে সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে ইংরেজদের আধিপত্যবাদী এবং অর্থনৈতিক চিন্তা। যারা পশ্চিমা সভ্যতায় 'সভ্য' হবে তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি, জীবনযাত্রাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে এবং এরাই পশ্চিমা পণ্যের প্রসারে ভূমিকা রাখবে। টেনিশন এ পণ্যের প্রসার নিয়ে ভাবেননি, কিন্তু তার চিন্তাচেতনা ও মনোভঙ্গি যে সমাজ গড়ে দিয়েছে, তাতে নিশ্ছিদ্রভাবে এসব স্বার্থচিন্তা লুক্কায়িত ছিল। উনিশ শতকে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজ এ ধারণাটি যথার্থ প্রমাণ করেছেন। 'ইয়ং বেঙ্গলবাদী বাবুরা যত না বুদ্ধিবৃত্তিক স্ফূরণ ঘটিয়েছেন, তার থেকে বেশি ইউরোপীয়।'

এ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে প্রসার শুরু হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ গুরু মার্শাল ম্যাকলুহান তাঁর বৈশ্বিক গ্রামের চিন্তাটি তুলে ধরেন। যোগাযোগ যেহেতু উন্নত হচ্ছে, তাৎক্ষণিক হচ্ছে, পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, সেহেতু বিশ্ব এখন একটি বড় একক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে, এরকম চিন্তা থেকে তিনি বলেছিলেন, মুদ্রিত পৃষ্ঠার দিন শেষ, এখন দৃশ্য মাধ্যমের দিন। দৃশ্য মাধ্যমে যেদিন ইন্টারনেট এবং ওয়েব সাইট যুক্ত হলো, পৃথিবীটা সত্যি হাতের মুঠোয় চলে আসল। কিন্তু কার হাতের মুঠোয়? বাংলাদেশের মাঠে কাস্তে হাতে ফসল কাটছে যে কৃষক

তাঁর হাতে, নাকি আমেরিকার বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে ট্রাক্টর চালিয়ে যে কৃষক জমি কর্ষণ করছে, তার হাতে? বৈশ্বিক গ্রাম একসময়ের জমিদার শাসিত গ্রামের মতোই; জমিদারের বাড়িটা আলিশান, যে বাড়িতে বসবাসরত কয়েকজন মানুষের হাতেই সারা গ্রামের সম্পদ– বাকিরা উদয়াস্ত খেটে যোগান দিচ্ছে সেই সম্পদের। এ বৈষম্যের কথাটা বৈশ্বিক গ্রামের প্রবক্তারা ভুলে যান, কারণ এটি ভুলে গেলে পশ্চিমের দৃশ্য মাধ্যম ব্যবসায়ীরা বিরক্ত হবে। এখন বৈশ্বিক সংস্কৃতির নামে যে আকাশ সংস্কৃতি চালু হয়েছে, তাতে প্রাচ্যের-আরও নির্দিষ্টভাবে বললে– বাঙালি সংস্কৃতির অংশ কতটা? সেই সংস্কৃতির শেঠরা হাসতে হাসতে যাচ্ছে ব্যাংকে এবং আমরা বাধ্য ভোক্তারা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে এক বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বাজারে নিজেদের ঢোকাবার চেষ্টায় তাদের মদদ দিয়ে যাচ্ছি। উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তা জিগম্যান্ট বাওম্যান তাঁর 'পোস্টমর্ডানিটি এন্ড ইটন ডিসকনটেন্ট' গ্রন্থে (ক্যামব্রিজ পোলিটি প্রেস, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫) লিখেছেন– বৈশ্বিক অর্থায়ন ও মূলধন, বাণিজ্য এবং তথ্য শিল্প তাদের অবাধ চলাচল এবং অনায়স স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের রাজনৈতিক-খণ্ডায়নের ওপর নির্ভরশীল। হয়তো বলা যায়, তাদের প্রত্যেকের 'দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর' ক্ষেত্রে একটি কায়েমি স্বার্থ আছে .... এসব রাষ্ট্র খুব সহজেই স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের (সুবিধাজনক) ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আইনশৃঙ্খলার একটি পর্যায় অন্তত নিশ্চিত করে কিন্তু বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো তাদের শক্তি থাকে না।

বাওম্যানের মতে, সাংস্কৃতিক বৈশ্বায়ন হচ্ছে 'বৈশ্বায়ন' এবং 'ভূমিদখলের' একটি পারস্পরিক প্রক্রিয়ার নাম, যা উভয়কে শক্তিশালী করে।

পশ্চিমের চিন্তাবিদরা, যারা বৈশ্বিক চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছেন নানা লেখায়, তারা যে সবাই এ 'প্রাচ্যবাদী' অথবা আরও বিশেষ অর্থে, স্বার্থবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন, সে কথা অবশ্যই বলা সংগত নয়। একে সত্যের অপলাপই বলা যাবে। কার্ল মার্কস অথবা ম্যাক্সমুলার, হেগেল অথবা আর্নল্ড টোয়েনবি, এদের কারও বৈশ্বিক চিন্তাকে

স্বদেশি নানা কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে কোনোক্রমেই জড়িত করা যাবে না। এদের চিন্তায় ইতিহাস ও অর্থনীতি চিন্তা, জ্ঞানতত্ত্ব অথবা বস্তুর দ্বান্দ্বিকতাবাদ অথবা সংস্কৃতির উজ্জীবনধর্মিতার প্রসঙ্গগুলো এক পরিব্যাপ্ত পরিসরে স্থাপিত। কাল মার্কসের লেখায় ভারতীয় সমাজের কোনো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি নিয়ে যারা ভাবেন, তারা মার্কসের বৈশ্বিক চিন্তার মডেলভিত্তিক রূপটিকে আমলে আনেন না। 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমির' ভূমিকায় উৎপাদন, উৎপাদনশীল শক্তিসমূহ, উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ এবং শ্রম সম্পর্কে যে চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, তার পিছনে ইতিহাস এবং সমাজবাস্তবতার অবদানটাই সর্বোচ্চ। সেই ইতিহাস ও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বের সংস্কৃতিসমূহ ভিন্ন হলেও তাদের উৎপাদন, উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কসমূহ এবং শ্রমের বিষয়গুলো অক্ষুণ্ন। এ মডেলগুলো সর্বত্রই প্রযোজ্য। কাজেই মার্কসের ভারত দর্শনে অপূর্ণতা থাকলেও তাঁর মডেল চিন্তায় কোনো অপূর্ণতা ছিল না।

একই কথা বলা যায় এ শতকের বিপ্লবী চিন্তাবিদ এবং জনমানুষের কবি এবং সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে। ফ্রানৎস ফাঁনো এবং চে গুয়েভারা, ম্যাক্সিম গোর্কি অথবা আরও সাম্প্রতিককালের ল্যাতিন গোর্ডিমারের বৈশ্বিক চিন্তা প্রথমে পরিস্ফূট হয়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে, তারপর সেটি প্রাসঙ্গিক হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অথবা এ দুই স্তরবিশিষ্ট প্রক্রিয়াটি আসলে একটিই এবং অথবা সমান্তরাল প্রক্রিয়া।

নজরুল ইসলামকে এ ধারাতে অতি সহজেই স্থাপন করা যায় এবং শুরুতেই বলা যায়–

ক. নজরুলের সমকাল দর্শন এ নির্বাচিত কিছু কবি এবং বিপ্লবীর মতোই স্থান, সমাজ ও ইতিহাসের অনুবিশ্বে স্থাপিত হয়েও কালোত্তীর্ণ।

খ. সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী এক প্রবল সময়ে তিনি মাত্র দুই দশকে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও ভাষণে যে দৃষ্টিভঙ্গিকে দেশবাসীর

কাছে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, তাকে শুধু বৈপ্লবিক বললে ভুল বলা হবে এবং বৈশ্বিক মাত্রাটি পরিমাপ করা যায় না; বরং বলা যায় এটি ছিল উত্তর-উপনিবেশী, প্রতি-প্রাচ্যবাদী এবং প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক এবং তাঁর ডিসকোর্স ছিল ক্ষমতাবিরোধী, মুক্তিপ্রবণ অথবা Liberatory।

গ. নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তা পশ্চিমা-আধিপত্যবাদের বিপরীতে প্রাচ্যের কিছু আদর্শ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মতো তিনি পশ্চিমের আধুনিকতাকে একমাত্র বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে আধুনিকতার সংজ্ঞাটি মোটেও এলিটিস্ট ছিল না, ছিল সাবঅল্টার্ন; কাজেই তাঁর বৈশ্বিক চিন্তাতে সেই নিম্নবর্গীয়তার মৃত্তিকা ও সংস্কৃতি সংলগ্নতার ছায়া পড়েছিল। তিনি তুরস্কের কামাল পাশাকে গণজাগরণের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন এজন্য নয় যে, তিনি মুসলমান ছিলেন (কামাল পাশার সেক্যুলার ধর্মচিন্তার সঙ্গে নজরুলের নিজস্ব চিন্তার মিল থাকা সত্ত্বেও), বরং এজন্য যে কামাল তাঁর নিজের মানুষ ও পরিবেশ এবং সংস্কৃতিকে তাঁর বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন– বাইরের কোনো উৎস থেকে নয়। পরাধীন ভারতে এ ভূগোল ও সংস্কৃতি চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ছিল। অর্থাৎ নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তার সূত্রপাত তাঁর নিজস্ব ভূগোল ও জনজীবন থেকে। এখানে তিনি অন্য বৈশ্বিক চিন্তার চিন্তাবিদ থেকে আলাদা।

ঘ. এন্টনিও গ্রামসি বলেছিলেন, 'নতুন শিল্প' নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে 'নতুন সংস্কৃতি' নিয়ে কথা বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ বাংলা সাহিত্যের তিরিশের আধুনিক সাহিত্যে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, যেমন একটি নতুন শিল্প বা আর্টের উদ্ভাবনে কবি ও সাহিত্যিকরা উদ্যোগী ছিলেন। গ্রামসির কথাও ক্ষুদ্র পরিসরে বিবেচনা করলে হয়তো এখানে এ উদ্যোগের একটি নেতিবাচক অর্থ করা যায়, কিন্তু সেটি উচিত নয়, গ্রামসিরও তা উদ্দিষ্ট ছিল না; কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে গ্রামসির মন্তব্য প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, তিনি প্রকৃতই একটি নতুন সংস্কৃতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন– এ সংস্কৃতিকে প্রতিরোধের সংস্কৃতি বলা যায়। ত্রিশের আধুনিক সাহিত্য একটি

নিজস্ব পথে গিয়েছে, বহুবিধ অর্জনে তা সমৃদ্ধ; কিন্তু এ প্রতিরোধের সংস্কৃতিতে এর কোনো অবদান নেই। নতুন আর্ট অবশ্যই আমাদের জন্য এক বড় অর্জন, কিন্তু এ আর্টে অংশগ্রহণ কতজনের? পরাধীন দেশে এ নতুন আর্টের রাজনৈতিক কোনো তাৎপর্য ছিল না, যদিও শৈল্পিক এবং নান্দনিক তাৎপর্যে তা ভাস্বর। অন্যদিকে, নজরুলের নতুন প্রতিরোধের সংস্কৃতিতে গণমানুষের অংশগ্রহণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সংস্কৃতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও এ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থানটি কিছুটা দূরে ছিল। তবুও রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক চিন্তায় যে উদারতা, প্রাচ্যদর্শন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন ও যোগাযোগ চিন্তা কার্যকর ছিল নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তায় এদের উপস্থিতির জন্য নজরুলের এ নতুন সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠিতে' এ নতুন প্রতিরোধের সংস্কৃতির প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত উত্তর উপনিবেশী সমালোচক, তাত্ত্বিক ড্যান জ্যাকবসন দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপন্যাসিক অলিভ শ্রাইনারের একটি বই– 'দি স্টোরি অফ এ্যান আফ্রিকান ফার্ম' (১৮৮৩) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, "উপনিবেশী সংস্কৃতির কোনো স্মৃতি নেই' (ইনট্রোডাকশন টু অলিভ শ্রাইনার্স-'দি স্টোরি অফ এ্যান আফ্রিকান ফার্ম" পেঙ্গুইন বুক্‌স; ১৯৭১ :৭)। জ্যাকবসন– এ স্মৃতিহীনতা বলতে যা বুঝিয়েছেন, তা সংক্ষেপে এরকম; উপনিবেশী সংস্কৃতি নিজের ইতিহাস আর অত্যাচারের দমনপীড়নের/পদানত হওয়ার কাহিনীকে ভুলে থেকে উপনিবেশকারীদের মূল ইতিহাস মিশে যেতে চায়। যদি সে নিজের ইতিহাসকে সর্বক্ষণ মনে রাখতে থাকে তাহলে তা কখনো এগিয়ে যেতে পারবে না। পিছিয়ে থাকতে চাইলে স্মৃতি উস্কে রাখতে আপত্তি নেই; কিন্তু সামনে যেতে হলে স্মৃতিহীন হতে হবে। মিশেল ফুকো হয়তো এ প্রবণতাকে ইতিহাসের সহিংসতা হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর ইতিহাস ভুলতে পারেনি; যে সম্প্রদায় পিছিয়ে গেছে। হিন্দুরা ভুলতে পেরেছে এবং উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনসমূহ নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে–তাই তারা এগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাঁর 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি উপন্যাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে তাদের গৌরবের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি ইংরেজদের ইতিহাসের সঙ্গে একটা সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। মুসলমান-উপনিবেশের তিক্ত ইতিহাস থেকে উত্তরণকারী– তিনি বর্তমানের ইতিহাসে আসতে চেয়েছিলেন, যাতে ইতিহাসের নতুন উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এক ধরনের Writing book হিন্দু সমাজ করতে পারে এক কালের, পরাক্রমশালী শক্তির কেন্দ্রের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ছিল জাতীয়তাবাদী, কাজেই এর কার্যকারিতার গণ্ডিও ছিল সীমাবদ্ধ। দেশের একটি প্রধান সম্প্রদায়কে পাশ কাটিয়ে গেছে সেই চিন্তা। সে তুলনায় নজরুলের চিন্তাভাবনা ছিল অনেক বেশি অগ্রসর, বহু সম্প্রদায়কেন্দ্রিক এবং এক বিশেষ অর্থে বৈশ্বিক। তিনি কলোনিয়াল স্মৃতিহীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু এক নতুন ইতিহাস চর্চার সূত্রপাতই করলেন না, যেখানে বহু-সম্প্রদায় তাদের নিজেদের এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ অভিন্ন ইতিহাসের উদ্ধার কাজ হাতে নিবে। এ ম্যাক্রো-ইতিহাস উপনিবেশী উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং কর্মপদ্ধতিকে গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্থিতধী এবং সচেতন লেখকের ইতিহাস চর্চা উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেনি– বরং এক সম্প্রদায়-ধর্মী হওয়ায় তা শেষ বিচারে উপনিবেশের Complicit শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে নজরুলের মতো, 'বাউন্ডেলের' পথে সম্ভব হয়েছিল একটি প্রতিরোধক সংস্কৃতি তৈরি করা, যা কলোনিয়াল শাসনের স্মৃতিহীনতা মেনে নিতে প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জানায়।

নজরুলের সময়টাও এক্ষেত্রে বিচার্য, কারণ সময় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি প্রতিরোধের আয়োজনে শক্তি সঞ্চার করতে পারে, অথবা একে নস্যাৎ করে দিতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ঢেউটি একটি অভিঘাত সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল– সময় ঠিক ছিল; যোগাযোগ ছিল না। বিদ্রোহের যারা বেনেফিশিয়ারি, তারা অনেকে জানেইনি, বিপ্লব হচ্ছে। বিদ্রোহের বাণীগুলো ছড়িয়ে পড়েনি। হোমি ভাবা প্রমুখ উত্তর–উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা Nation এক নহে Dissemination- অর্থাৎ জাতি/

রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রচার/প্রসারের একটা অস্থানিক সম্পর্ক দেখেন, ১৮৫৭ সালের স্বল্পজীবী স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর বৈধতা স্পষ্ট, নজরুলের ক্ষেত্রে এ dissemination ছিল ব্যাপক। ফ্রানৎস ফানোঁর বিপ্লবী বাণী যেমন আলজিরিয়ার মানুষ গ্রহণ করেছিল- যদিও তিনি ছিলেন ভিন্ন জায়গার, ফরাসি উপনিবেশ মার্টিনিকের– সেই বাণীর content-এর নব্য এবং এর দ্বারা প্রতিরোধের সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য; নজরুলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ভৌগোলিক সীমানা ফানোঁর জন্য কোনো বাধা ছিল না, নজরুলের জন্যও না। বৈশ্বিক চিন্তার প্রথম শর্তই এ ভূগোলহীনতা, কিন্তু ইতিহাসহীনতা নয়। তবে নিজের ভূগোলে যিনি সুস্থিত, তাঁর পক্ষেই ভূগোল ভাঙা যায়। যিনি নিজের ইতিহাসে উজ্জীবনের এবং দর্শনের উপাদান খোঁজেন, তিনিই পারেন ইতিহাসকে বৈশ্বিক মাত্রায় স্থাপন করতে। এলিটরা এটা সহজে করতে পারেন না; কিন্তু সাবঅল্টার্ন নজরুল পেরেছেন। তাঁর চিন্তায় মাটি এবং মানুষ, সম্প্রদায়সমূহ এবং সম্প্রদায় ইতিহাসসমূহ ভীত করেছিল। তাঁকে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণের জন্য অতিরিক্ত কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক আয়োজন করতে হয়নি। নজরুলের সময়– অর্থাৎ এ শতাব্দীর কুড়ি ও তিরিশের দশকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক চেতনার একটা বিকাশ ঘটেছিল। ব্যাপারটা স্বাভাবিক এক ঘটনাপ্রবাহে অথবা ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় ঘটেছিল। মধ্য কুড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ বিশ্বজুড়ে বিকাশমান আন্দোলনটির চেতনা আমাদের চিন্তাবিদদেরকে-সর্বহারাদের সংগঠিত করতে উদ্দীপ্ত করেছিল। প্যান-ইসলামিক চিন্তার প্রকাশও প্রকৃত অর্থে ছিল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি সংস্থার প্রয়াস। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি ছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে decolonization-এর একটি সুনির্দিষ্ট ছায়াপাত। Decolonization, অথবা উপনিবেশ মুক্তির আন্দোলন এ কুড়ি-তিরিশের দশকে দক্ষিণ এশিয়াতে যেভাবে সূচিত হয়, তার স্বাভাবিক পরিণতিতেই ষাটের দশক পর্যন্ত সারা বিশ্বে উপনিবেশ উৎখাত চলে। নজরুল ইসলাম এ তিনটি বৈশ্বিক আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। সর্বহারা– বিশেষ করে কৃষক শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামে তিনি শুধু বুদ্ধিবৃত্তির নয়, একটি রাজনৈতিক ভূমিকাও রাখেন। এ উদ্দেশ্যে

তিনি শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় গঠন করেন। এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে 'লাঙল' পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর। 'লাঙল'-এ দলের যে উদ্দেশ্যাবলি ও মেনিফেস্টো ছাপা হয়, তাতে বলা হয় "নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এ দলের উদ্দেশ্য।" এবং 'চরম দাবির' অধীনে বলা হয়, "ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণক্ষম স্বায়ত্ত-শাসন-বিশিষ্ট পল্লিতন্ত্রের উপর বর্তিবে- এ পল্লিতন্ত্র ভদ্র, শূদ্র সকল শ্রেণির শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।" (নজরুলের রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ.-৭৩ ও ৭৬)। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ চিন্তাগুলো ছিল বৈপ্লবিক, কিন্তু রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব এ চিন্তাসমূহের পিছনে যেমন সক্রিয় ছিল, তেমনি নজরুলের সাবঅল্টার্ন চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশও ছিল এজন্য দায়ী। একই সঙ্গে প্যান 'ইসলামিক আদলে ইসলামি এক পুনর্জাগরণের স্বপ্নও নজরুল দেখতেন, যে ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের কোনো স্থান নেই, আছে শুধু চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মহিমার সমন্বয়। ইসলামি পুনর্জাগরণ নিয়ে নজরুলের লেখা অসংখ্য কবিতা ও প্রবন্ধে এবং তাঁর নানা অভিভাষণে এর প্রকাশ করা হয়েছে।

আর decolonization বিষয়ে নজরুলের ধারণা ছিল পরিষ্কার– প্রয়োজনে সশস্ত্র আন্দোলন এবং সর্বহারাদের সংগঠিত করে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা। 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজ' প্রবন্ধে তিনি লিখেন: "আজ এ শব-সাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে- এস ভাই, তোমাদের মরণমুখীপণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক এবং "কৃষক ও শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজন তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়।"(নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ.-৫১ ও ৫০) অন্যত্র তিনি বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে ভবিষ্যতের মুক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন।

বস্তুত নজরুলের সমসাময়িক খুব কম কবি-সাহিত্যিকই এত খোলাখুলিভাবে এ 'শব-সাধনা' এবং 'শক্তি পীঠের' প্রতিষ্ঠান বাঙালি

তরুণকে ডাক দিয়েছেন। তাঁকে যে কারাগারে যেতে হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় বরং সাম্রাজ্যের প্রতি তার Writing back-কে মাত্র দু'একটি বই/লেখা নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে থামানো যাবে, কর্তৃপক্ষের এরকম ধারণা পোষণ করাটা। বস্তুত নজরুলের– 'অগ্নিবণা', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা'সহ অন্যান্য কবিতাগুলোতে decolonization এর প্রতি যে প্রবল পক্ষাবলম্বন এবং ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রতি লেখালেখির মাধ্যমে যে প্রবল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া, সে বিষয়টি স্থানীয় গোয়েন্দা আর নিম্ন-মধ্যম সারির সরকারি আমলার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না।

নজরুল তাঁর কবিতায় শিল্প ও নন্দনচিন্তার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটি অতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। কুড়ি-তিরিশের দশকে পশ্চিমে যে চকচকে আধুনিকতা তার নানা প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে সংহত হচ্ছে, তা নজরুলকে আকৃষ্ট করেনি এবং তিনি তাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। কবিতায় ইমেজিম, ভার্টিসিজম, "দি ওয়েসল্যান্ড সিন্ড্রোম, পরাবাস্তববাদ, মুক্তছন্দ, ইন্টেরিওর মনোলগ, চেতনাপ্রবাহ, আভাঁত-গার্দিজম- ইত্যাদি চিন্তা, নানা ধারণা, প্রকরণ ও শৈলী ও শিল্পের প্যাক্রিল কোনো রেখাপাত করেনি তাঁর কবিতায়। যেমন করেছিল তিরিশের কবিদের কাজ ও শিল্পদর্শনে। নজরুল বরং আস্থাশীল ছিলেন শেলী, কীটস, বায়রনের রোমান্টিক কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতায়। তাঁর আস্থা ছিল এক রোমান্টিক পুরাণে, যাতে ব্যক্তির উত্থান ও বিদ্রোহ একটি আকর্ষণীয় বৈশ্বিক উত্তরাধিকারে তাঁকে এর অন্তর্জগতে আত্মস্থ করেছিল। নজরুলের রোমান্টিকতাও এক বৈশ্বিক চিন্তার অবদান– তিনি তাঁর রোমান্টিকতার সূত্র ধরেই বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে নিজের একটা সংযোগ সৃষ্টি করেছিলেন।

২.

নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তাটি তাহলে কি? আমরা এভাবে কথাটির একটি উত্তর অথবা ব্যাখ্যা দিতে পারি– বিশ্বকে নজরুল যেভাবে দিয়েছিলেন এবং বিশ্ব যেভাবে নজরুলকে স্পর্শ করেছিল, তার যোগফলই ওই বৈশ্বিক চিন্তা। ওই চিন্তার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি নজরুলের কবিতা ও চিন্তাচেতনার সমকালীন বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক

চিন্তাভাবনার প্রভাব এবং দ্বিতীয়টি বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনা, ঘটনাপ্রবাহ, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে নজরুলের নিজস্ব অনুধাবন।

দ্বিতীয় প্রকাশটি শনাক্ত করা সহজতর। একটু আগে বৈশ্বিক চিন্তার যে রূপের প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার অনেক উদাহরণ রয়েছে তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে, অভিভাষণে। তিনি ভারতের পরাধীনতাকে দেখেছেন এক বৈশ্বিক-ইতিহাসের অংশ হিসেবে এবং রাশিয়ায় সর্বহারাদের জয়ের ফলে যে মুক্তি তারা অর্জন করেছে, তার তুল্য একটি মুক্তি আন্দোলনও তিনি ভারতে কল্পনা করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেটি একটি Libratory ডিসকোর্স : যেখানে বিশ্বমানবের মিলনটাই বড়– "কে তুমি? পার্সী? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?/কনফুসিয়াস চার্বাক-চেলা? বলে যাও বল আরো! ইত্যাদি। (নজরুলের রচনাবলী, খণ্ড-১, পৃ.-২৩৩) কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট সর্বমানবের সাম্য প্রতিষ্ঠা, যার রাস্তা ধরে আসবে মুক্তি। সর্বমানবের উত্থানে তাই "জগতে লাগল সাড়া/ জেগে ওঠ, উঠে দাঁড়া" (যুগান্তরের গান)। নজরুলের কবিতা থেকে অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায় তাঁর মুক্তিকামী চিন্তার এবং ডিসকোর্সের : এবং এ মুক্তিকে তিনি কখনো স্বদেশের সংক্ষিপ্ত পরিবর্তে দেখেননি; দেখেছেন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে। 'ব্যর্থতার ব্যথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেন : "প্রাণের গহন অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল : "মিথ্যা কথা। তোমার ব্যথা, তোমার ব্যর্থতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে জেগেছে। প্রতীচীর স্বার্থ মন্দির ভেঙে পড়েছে; মিসরে পিরামিড কেঁপে উঠেছে, চীনের প্রাচীরে ভাঙন লেগেছে; হিমালয় দুলে উঠেছে। তোমার ব্যথার ভিতর দিয়ে সত্যের বাণী এসেছে;– মানুষ পাবে তার মানবীয়-সর্ব প্রয়োজনের সমঅধিকার।" (নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ.-৩৮) লক্ষণীয়, নজরুলের স্বরাজ্য চিন্তার সঙ্গে সাম্যের এবং সর্বহারার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অস্থায়ীভাবে মিশেছিল; তাঁর কাছে স্বরাজ শুধু ইংরেজ হটিয়ে ভারতীয় এলিট শক্তি-কেন্দ্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল না, ছিল সাবঅল্টার্নদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। 'অন্তর-ন্যাশনাল সংগীত' এ তিনি এরকম একটি আহ্বান জানান :

জাগো অনশন-বন্দি, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী,
ওরে ওই আগত" (নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-১, পৃ.-৩৩০)

এ আগত নবজন্ম জগতের লাঞ্ছিতদের। নজরুলের decolonization এর এখণ্ডটি পরিব্যাপ্ত ছিল বর্তমানের তৃতীয় বিশ্বের-ভূগোলময়।

তবে সমসাময়িক বিশ্বের কোথাও ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, কোনো বিপ্লব অথবা কোনো বিপ্লবী-এমনকি কোনো বিজয়ী অথবা মুক্তিকামী আদর্শবাদ নিয়ে লিখলেই যে কারো লেখায় একটা বৈশ্বিক মাত্রা চলে আসে, তা নয়। এরকম একটি চিন্তা ক্ষুদ্র একটি মাত্রায় বা সরাসরি হয়তো প্রণিধানযোগ্য, প্রকৃত বৈশ্বিক মাত্রাটি আরো ব্যাপক এবং গভীর এবং এজন্য কবি বা লেখকের একটি নিজস্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন, নিজস্ব চিন্তার ও ভাবাদর্শের ব্যাপকতা প্রয়োজন। নজরুলের ক্ষেত্রে তা ছিল এবং এর পিছনে সক্রিয় ছিল তাঁর বৈশ্বিক চিন্তার প্রথমোক্ত রূপটি। বিশ্ব তাঁকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁর বৌদ্ধিক এবং আবেগগত অংশগ্রহণ ছিল সমকালের অনাকীর্ণ ইতিহাসে। এজন্য কামাল পাশা, জগলুল পাশা, আনোয়ার এসব নায়কের এক একজন প্রতীকও বটে, তারা নজরুলের প্রস্তুতির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সেই প্রস্তুতির পাঠ তিনি গ্রহণ করেন উপনিবেশী শাসনের অন্ধকার দিক থেকে, হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সাবঅল্টার্নের নিজস্ব ইতিহাস থেকে।

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর 'ওরিয়েন্টালিজম' গ্রন্থে প্রাচ্যবাদ এবং এর মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা যে কয়েকটি উপনিবেশী সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, নজরুলের ক্ষেত্রে সেগুলোর উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক এবং এতে তাঁর বৈশ্বিক চিন্তার প্রস্তুতির বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে। সাঈদের চিন্তায়, পশ্চিম প্রাচ্যকে দেখেছে তার প্রজা হিসেবে,

প্রজাভূমি হিসেবে। প্রাচ্যকে সে ভৌগোলিক এবং শারীরিকভাবে জয় করেছে; আবার জ্ঞানতত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেও জয় করেছে। ফ্রান্সিস বেকন জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক দেখেছিলেন, যা মিশেল ফুঁকো আরও ব্যাপকভিত্তিতে পরীক্ষা করেছেন, তার প্রয়োগ ঘটিয়ে পশ্চিম দীর্ঘমেয়াদি Colonization প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে। জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের জন্য এটি শুধু রাজনৈতিক বিষয় হয়ে থাকেনি বরং, সাঈদের ভাষায় 'সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ' সক্রিয়ভাবে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছে। কাজেই ধর্মপ্রচারক থেকে নিয়ে সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক থেকে নিয়ে প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত– সবই এ coloniztion প্রক্রিয়ায় নানাভাবে জড়িত হয়েছেন এবং মননের উপনিবেশিকতাকে নিশ্চিত করেছেন। ভৌগোলিক উপনিবেশমুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েও তা সম্ভব হয়েছে। decoloniztion of the mind এত সহজ নয়। নজরুল ইসলাম এ কঠিন কাজটিকে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক যুক্তির মতোই– অথবা এর থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। 'মুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা' শীর্ষক অভিভাষণে তিনি এ প্রসঙ্গটিকে অত্যাবশ্যকীয় করে তোলেন। তিনি বলেন, "ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এ যে, তার শিক্ষাদীক্ষার চমক দিয়ে যে আমাদের এমনি চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এ দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষাদীক্ষার সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে।"(নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ.-১০৪)

অর্থাৎ নজরুল ইংরেজের প্রাচ্যবাদী, উপনিবেশী ফাঁদটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং তা থেকে সাবধান থাকার জন্যও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এ ফাঁদে নিজে পা দিয়েছেন। সাঈদের ভাষায় বলা যায়, পশ্চিম যা চেয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী উপন্যাসগুলোতে সেটি প্রতিফলিত হয়েছে; অর্থাৎ ইংরেজের ভেদনীতির কৌশলে তিনি অজ্ঞাতে শক্তি যুগিয়েছেন; কিন্তু নজরুল তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নজরুলের বৈশ্বিক চিন্তা পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী প্রকল্পসমূহকে শনাক্ত করে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

নিজের সময় ও যুগকে কিছুটা হলেও অতিক্রম করে যাওয়াটাই বৈশ্বিকতার একটি পর্যায়। নজরুলের ক্ষেত্রে সেটি আমরা দেখি– তাঁর রাজনৈতিক আদর্শবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ, সাবঅল্টার্ন ইতিহাসচিন্তা এবং তার প্রতিরোধের সংস্কৃতিচর্চায়, যদিও একটা প্রচলিত ধারণা এরকম যে, তিনি অল্প শিক্ষিত ছিলেন, আবেগপরায়ণ ছিলেন, উচ্চকণ্ঠ ছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু যে কবি মানুষের মুক্তির কথা শুধু বলেন না, সেই মুক্তিকে একটি বৈশ্বিক মুক্তি আন্দোলন decolonization এর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেন; যিনি তাঁর সাহিত্যে ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে Write back করেন, যিনি শিল্পের নতুনত্বের পরিবর্তে সচেতনভাবে সংস্কৃতির নতুনত্ব প্রতিরোধের সংস্কৃতি উদ্ভাবনে কুশলী- তাঁকে আমরা অল্প শিক্ষিত বলি কোন যুক্তিতে?

প্রবন্ধে উল্লেখকৃত গ্রন্থাবলী :

১. নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-১, ২, ৩ এবং ৪, : সম্পাদনা আবদুল কাদির (নতুন সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি আনিসুজ্জামান); ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

২. এডওয়ার্ড সাঈদ, 'ওরিয়েন্টালিজম', লন্ডন, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৭৮।

শিক্ষার সংস্কৃতি

১.

শিক্ষা বিষয়টাই পরিশ্রমের, চর্চার। শিক্ষাদানে পরিশ্রম আছে, শিক্ষা গ্রহণেও আছে– এ পরিশ্রমের কায়িক অংশটি গুরুতর নয়, এর তুলনায় ইট ভাঙা অথবা লঞ্চঘাটে মাল টানা অনেক বেশি পরিশ্রমের। কিন্তু শিক্ষার শ্রম অংশটি আসে মেধা ও মননের অঞ্চল থেকে। অনেক পুরোনো চিন্তা, মত, সংস্কার, অভ্যাস ও চর্চাকে বদলানোর মধ্যে নিহিত শিক্ষা শ্রম। এ শ্রম দিতে যারা আগ্রহী, তারাই শিক্ষার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেন। সংস্কৃতি কোনো জড়পদার্থ নয়; এটি একবারে অর্জন করা অপরিবর্তনশীল কোনো সামাজিক চর্চা নয়। সংস্কৃতি সতত পরিবর্তনশীল, যদিও এ পরিবর্তনটি খুব সহজে বা সর্বৈব দৃশ্যমান উপায়ে ঘটে না। সংস্কৃতির ভিতরের সময়টি খুব দীর্ঘ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পিছনে রয়েছে কার্যকর শিক্ষা। বিষয়টি একটু ঘুরিয়ে নিলে, এরকম বলা যায়; সংস্কৃতির গতিশীলতার পিছনে আছে শিক্ষা, যেমন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করে সংস্কৃতি। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি খুবই ঘনিষ্ঠ।

কিন্তু এ শিক্ষা বললে যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথাই শুধু উল্লেখ করা হয়, তাহলে আমরা একটি বড় ভুল করব। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমদের জন্য– প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া জগতে আমরা অচল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার এ শিক্ষাই আমাদের দেয়। কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই পূর্ণ হয় না, যদি

না তাতে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক শিক্ষা। সাংস্কৃতিক শিক্ষা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় দিতে পারে না, বরং এর বিরুদ্ধ শিক্ষাই তারা দেয় মাঝে মাঝে। সাংস্কৃতিক শিক্ষা দেয় পরিবার ও সমাজ, প্রধানত পরিবার। পরিবার অথবা সমাজ থেকে তা না পেলে একজন শিক্ষার্থী কখনো সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষও পরিবার থেকে সাংস্কৃতিক শিক্ষা পেলে তথাকথিত অনেক শিক্ষিত মানুষ থেকে বেশি শিক্ষিত হতে পারে, যেহেতু শিক্ষার সংস্কৃতিকে সে গ্রহণ করে অনেক সহজে। দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক।

বছর পাঁচেক আগেও দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের মাত্রা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কাগজে ছবি দেখেছি, বিএ পরীক্ষার সময় পরিবারের লোকজন– বাবা, চাচা, মামা, দুলাভাই– পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করছে। এ রকম নকল করে যে ছেলে পরীক্ষায় পাস করে, সে হয়তো এক সময় চাকরি নেয়, হর্তা-কর্তা হয় অথবা রাজনীতি করে দেশের নীতি নির্ধারক, সাংসদ ইত্যাদি হয়। কিন্তু যে নকল করে শিক্ষার স্তরগুলো পার হয়ে সনদ হাতে বেরিয়ে আসে, সে কাগজে কলমে শিক্ষিত হলেও এ শিক্ষার প্রয়োগযোগ্যতা কী, গ্রহণযোগ্যতাই বা কি? সে কি শিক্ষিত? তার পরিবার কি শিক্ষিত? তার পরিবারে মূল্যবোধ এবং রুচির অবস্থা কী রকম, সেতো বোঝাই যায়। গত কয়েক বছরে পরীক্ষায় নকল কমেছে, কিন্তু মনোবৃত্তিটি রয়ে গেছে। কথা কিন্তু একই দাঁড়াল। সুযোগ পেলেই যারা নকল করে, তাদের সংখ্যা কমেনি, বেড়েছে বরং। সুযোগ পায় না বলে অনেকে নকল করতে পারে না। কিন্তু এর মানে এ নয়, নকল উঠে গেছে। নকল করে পাস করা এ অশিক্ষিত শিক্ষিতদের দৌরাত্ম্যে ইতোমধ্যে সমাজ জীবনে পচন ধরেছে। এবং সমাজে পচন ধরেছে বলে আরও অশিক্ষিত-শিক্ষিত তৈরি হচ্ছে। এক অনতিক্রান্ত বৃত্তের ভিতর আটকা পড়ে যাচ্ছি আমরা।

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিজ্ঞানের একটি বিষয়ে প্রথম হয়ে এম এসসি পাস করেছে একটি ছেলে এবং দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করল সে। তারপর বিদেশে গেল,

পিএইচডি করল, তারপর দেশে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনা শুরু করল। কিন্তু তার আচার আচরণে শিষ্টতা অথবা সৌজন্য কিছুই নেই। পশ্চিমে সহকর্মীরা একে অপরের, এমনকি ছাত্ররা শিক্ষকদের নাম ধরে ডাকে, সেটিই স্বাভাবিক আচার সেই খানে। কিন্তু আমাদের দেশে তো তা নয়। আবার গুরুজনের সামনে সিগারেট খাওয়াটাও আমাদের দেশে ভালো চোখে দেখা হয় না, যদিও পশ্চিমে তা একটি প্রচলনই বটে। আমাদের তরুণ অধ্যাপক পশ্চিম থেকে এসব চর্চা শিখে এলো। তার ওপর একদিন শুনলাম সে বাসার কাজের ছেলেকে এমন প্রহার করেছে যে, ছেলেটি প্রাণভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এ তরুণ অধ্যাপক উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু তার সাংস্কৃতিক শিক্ষাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সে সারাজীবনে অনেক সফল গবেষণা হয়তো করবে, হয়তো অনেক গবেষকও তৈরি করবে, কিন্তু মানুষ তৈরির কারিগর তাকে বলা যাবে না। যে কারিগর তার উৎপাদিত বস্তুর সকল প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাকে উন্নত কারিগর নিশ্চয় বলা যাবে না।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং শিক্ষার সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্রটি এই যে, উভয় ক্ষেত্রে মানুষ তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো প্রাধান্য পায়। এ উপাদানগুলোর মধ্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ যার অভাবে মানুষ মানুষ হয় না, শিক্ষা শিক্ষা হয় না, তা হচ্ছে দৃষ্টির প্রসারতা। সংকীর্ণতা হচ্ছে এ প্রসারতার বিপরীত। আমরা প্রতিদিনে দিনযাপনে সংকীর্ণতাটাই বেশি দেখি, প্রসারতা, গভীরতা দেখি না। স্বার্থপরতা, আত্মাদর, অহমিকা হচ্ছে এ সংকীর্ণতা; আর একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সহনশীল এবং প্রজ্ঞাবান দৃষ্টি, নিজের বাইরে অন্যের দিকে, সমাজের দিকে মনোযোগী হওয়া হচ্ছে প্রসারতার লক্ষণ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য মুখস্থবিদ্যা-পারদর্শী কিছু তোতাপাখি সৃষ্টি নয় বরং যুক্তিতর্ক এবং বিচার বোধসম্পন্ন মনন সৃষ্টি করা। বলা হয়ে থাকে পশ্চিমের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-এর সময় থেকে এবং এটি একটি উচ্চতর ধাপে উঠে এসেছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানালোক প্রাপ্তি কালে। এ সময়ের মানুষ নিজের মধ্যে বিশ্বকে অবলোকন করেছে, প্রশ্ন করেছে, সংস্কার ও

অন্ধ প্রচলনকে ভেঙেছে। বস্তুত, যে মানুষ প্রশ্ন করতে জানে না, যুক্তি বিচার ছাড়া অন্ধভাবে সকল কিছু গ্রহণ করে, আবেগটাকেই সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে দেখে, সে আধুনিক মানুষ নয়। শিক্ষার সংস্কৃতি হচ্ছে এ আধুনিক মনস্কতাকে গ্রহণ করা।

শিক্ষা-সংস্কৃতি হচ্ছে ভালোমন্দ, শুভ-অশুভের বিশ্লেষণ ও পার্থক্য করতে শেখা এবং নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী হওয়া। এ সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষার অনেকটা ঠোঁট সেবার মতো দেওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে হৃদয়ে তা ধারণ করা অনেক ব্যাপক ব্যাপার। আমাদের দেশে দুর্নীতিতে গত চার বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষে আমরা। একটি চাঞ্চল্যকর, যদিও সবার জানা, সত্য বেরিয়ে এসেছে কোনো কোনো প্রতিবেদনে। দুর্নীতির প্রায় নব্বই ভাগের জন্য দায়ী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঘুষ নেওয়া যে খারাপ কাজ, কাজে ফাঁকি দেওয়া যে দুর্নীতি এবং মানুষের সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, খারাপ আচরণ করে মানুষকে অকারণে বিপদে ফেলা যে অনৈতিক ব্যাপার সেই বিচার বোধটাও মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। আমরাও এসব অনৈতিকতাকে সয়ে নিয়েছি। এ জন্যে সকালে খবরের কাগজে ভয়ানক সব অন্যায়-অবিচারের খবর পড়েও আমরা নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল মনে অফিসে যাই, স্কুলে-আদালতে যাই। আমরা শিক্ষা পেয়েছি, পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শিক্ষার সংস্কৃতি রয়ে গেছে আমাদের নাগালের বাইরে।

শিক্ষার সংস্কৃতিই সভ্যতাকে নির্মাণ করে এবং ভিতটি গেঁথে এর দরদালান তুলে দেয়। অবশ্য শুধু শিক্ষাটা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না, এজন্য একটি আবহের প্রয়োজন হয়। আবহটা আসবে সমাজ থেকে, জনগোষ্ঠী থেকে এবং এ সমাজ বা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিনের চর্চায় এবং একটি গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের উপাদানগুলো ছেঁকে আনবে অসুন্দরকে বিসর্জন দিয়ে। একটি জাতি যদি শিক্ষার সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়, দেখা যাবে সেই জাতির সকল কাজেই সৌন্দর্য রয়েছে। সে জাতির দৈনন্দিন জীবনাচরণে, আহার গ্রহণে, ঘর সাজানোতে, শহর পরিকল্পনায়, শিশুদের লালন পালনে সকল ক্ষেত্রে সৌন্দর্য থাকে। কিন্তু আমরা

বুকে হাত দিয়ে জোর গলায় কি বলতে পারব, সেই সৌন্দর্য আমাদের মধ্যে আছে? আমাদের রান্নাঘর আর বাথরুমের দিকে নজর দিলে বুঝতে পারব, কী অসম্ভব অসুন্দর আমাদের জীবনযাত্রা। যে ঘরে খাদ্য তৈরি হচ্ছে, সে ঘরটিই সবচেয়ে নোংরা আমাদের দেশে। শিশুদের অসম্ভব আদরযত্নে লালন করি বটে, কিন্তু তাদের জন্য পরিবেশটা অসম্ভব নোংরা করে রাখি। যে মানুষ জঙ্গলের গাছ কেটে চোরাই বাজারে পাঠায়, যে অকাতরে বৃক্ষ নিধন করে, পাহাড় কাটে, জলাভূমি ভরাট করে জবর দখল করে, সে কি শিশুদের, এমনকি তার নিজের সন্তানদের, ভালোবাসে? না। তার ভালোবাসাটি ভয়ানক স্বার্থপর কিন্তু অপ্রকৃত। সে ভালোবাসে নিজেকেই, অথচ সে বুঝতে পারে না এ অনাদর কী সর্বনাশ করছে প্রকৃতির, সভ্যতার। সেটি যখন যে বুঝতে পারে, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

একইভাবে, যারা সন্ত্রাস ও সহিংসতার পথ বেছে নেয় সমস্যা সমাধানের জন্য, যুক্তিতর্ককে আমলে আনে না, তারাও সমাজ, প্রকৃতি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বড় অপরাধী। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, এ অপরাধীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং এদের নিয়েই থাকতে হচ্ছে আমাদের। এদের কেউ শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষার সংস্কৃতি এদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে।

অন্য দুঃখজনক সত্য হচ্ছে এই যে, আমাদের মুখস্থবিদ্যা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতি পুরোপুরি অবহেলিত। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিটা আমার একেবারেই মনঃপূত নয়। এ ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীর সৃজনশীলতা মোটেই উৎসাহিত হয় না। হয় শুধু মুখস্থ করার মনোবৃত্তি। অন্যের লেখা জিনিস মুখস্থ করে প্রথম দ্বিতীয় হওয়া কি গৌরব? আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতাটাই মুখ্য, অথচ আদর্শ হওয়া উচিত নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। নিজের ষোল আনা মেধা ও মনীষাকে কাজে লাগানোর প্রতিযোগিতা। পাঁচজন প্রাইভেট টিউটর রেখে আঠারো ঘণ্টা পাঠ মুখস্থ করে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে বাবা মাকে সোফায় দু'দিকে বসিয়ে ছবি তুলে ছাপানোয় কোনো বড় কৃতিত্ব নেই, যতটা আছে নিজের সৃজনশীল ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ

করায়। একটি বোর্ডে এসএসসি এবং এইচএসসিতে উপরের দিকে স্ট্যান্ড করা এক ছাত্র একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে ভর্তি হতে না পারায় তার অভিভাবকরা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন আমাদের দিকে। সে আজ বছর ষোলো-সতেরো আগের কথা। আমি তখন বিভাগের চেয়ারম্যান। তখনও এমসিকিউ নামক অদ্ভুত পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, ভর্তিচ্ছুদের মাথা খাটিয়ে অজানা কোনো বিষয়ে লিখতে হতো। ওই ছাত্রটির খাতা পুনরায় পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম তার একটি ইংরেজি বাক্যও শুদ্ধ হয়নি। ওর বাবা-মা প্রথমে বিশ্বাস করেননি, পরে নিজেদের চোখে দেখে আর কীভাবে অবিশ্বাস করেন। কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা? ওই ছেলেটি ভালো টিউটর রেখে নোট মুখস্থ্ করে পরীক্ষা দিয়েছে। ইংলিশে লেটারও পেয়েছে। কিন্তু নিজে বানিয়ে নিজের ভাষাতেও কিছুই লিখতে শেখেনি। এটি শিক্ষা নয়, অপশিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী করে, নিজের শক্তির বিকাশ ঘটায়। এক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টোটি।

যারা নিজেদের মেধার চর্চা করে, পাঠ্য বইয়ের অতিরিক্ত বই পড়ে লেখালেখির চেষ্টা করে, সমাজের মানুষের কথা ভাবে, যাদের আচরণে গরিব মানুষ ব্যথা পায় না, বরং সন্তুষ্ট হয়। যারা নিজেদের স্বার্থকে প্রধান করে না, যাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ প্রবল তারা প্রত্যেকে নিজস্ব পথে শিক্ষার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে অথবা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। একজন সত্যিকার শিক্ষার্থী শিক্ষা এবং শিক্ষার সংস্কৃতি উভয়কেই গ্রহণ করে জগৎটাকে একটা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারে, কারণ জগৎটা বিশাল, অবারিত। দৃষ্টিস্বল্পতা বা মায়োপিয়া আক্রান্ত মানুষ সেই জগৎকে পড়তে পারবে না। যাদের দৃষ্টি প্রসারিত, তাদের মনটা সংকীর্ণ নয়। শিক্ষার সংস্কৃতি, আমি আগেই বলেছি, দৃষ্টি ও মননের প্রসারতা ঘটায়।

শিক্ষার সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পরিবারগুলোকেই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। আর ব্যক্তির উন্নতির বিষয়টি তখন হবে স্বতঃসিদ্ধ।

আমি আশা করি, শুধু একাডেমিক শিক্ষা নয় সাংস্কৃতিক শিক্ষা নিয়েও দেশের মানুষ ভাববেন, কারণ এটি অর্জনের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিহিত।

বাঙালিয়ানার পুনর্জন্ম

বাঙালি কিছুকাল পর পর নতুন করে জন্মায়, অথবা ধারণা করে, সে নতুন করে জন্মায়। এ জন্যই শিরোনামে পুনর্জন্ম কথাটির ব্যবহার। তাছাড়া পুনর্জন্মের একটি ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রতীকী সংশ্লিষ্টতা আছে চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে ইউরোপে ঘটতে থাকা রেনেসাঁস অথবা নবজন্ম লাভের সঙ্গে, যার বাংলাদেশে সংস্করণের সাক্ষাৎ পেতে মোটামুটি চার শ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ নবজন্ম লাভের আরেক নাম হতে পারে পুনর্জাগরণ অথবা নিজেদের পুনরায় আবিষ্কার করা। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দোহাই মানা হয়েছিল ধ্রুপদী সময়কালকে, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ধ্রুপদী সময়ে ইউরোপের এক জন্ম হয়েছিল, পঞ্চদশ শতকে হলো আরেক জন্ম।

তবে উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁস ইউরোপীয় বাতাবরণ ছেড়ে এক সময় দেশি পথে হেঁটেছে, যেহেতু ওই সময়ের বাস্তবতা ছিল উপনিবেশী শাসন। এটিই কাম্য ছিল এং স্পষ্টতই সেই সময়ের চিন্তাবিদ, লেখক, মনীষী এবং সমাজসংস্কারকরা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল ধারণাগুলো ধরে রেখে এর বাহ্যপ্রকাশগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। মূল ধারণাগুলোর মধ্যে তাঁরা মানবতাবাদ এবং ব্যক্তির গুরুত্বকে বড় করে দেখেছেন। সংস্কৃতিকে সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার চালিকা শক্তি হিসেবে দেখেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রসার ঘটানো এবং চিন্তার গভীরতা সন্ধান করে ব্রত হিসেবে

নিয়েছেন এবং ধর্মের তত্ত্বকথা ও আচারকে মানবতার নিক্তিতে ফেলে মেপেছেন। বাঙালি অবশ্য এর আগে ষোড়শ শতাব্দীকালের প্রথম দিকেও একবার নতুন করে জন্মলাভ করেছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে তা ছিল 'চৈতন্য দেবের জন্য, তাঁহার প্রবর্তিত নতুন বৈষ্ণব ভক্তি প্রচারের ফলে' (১৫)। চৌধুরী এ নবজন্মকে বলেছেন বাঙালির বিপ্লববাদ এবং এর ফলে সমাজ সংস্কারের পথটি প্রশস্ত হয়েছিল বলে তিনি মত দিয়েছেন। তবে এ নবজন্মের অঞ্চলে বাঙালি মুসলমান ঢোকেনি। তার জন্য কোনো রাস্তাও খোলা ছিল না।

বাঙালি সমষ্টিগতভাবে জাগলে তার অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারে। ঊনিশ শতকে সে তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছিল, শিক্ষা নিয়ে যে পশ্চাৎপদতা ছিল, তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে পেরেছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মীয় বিভাজন ছিল, তার সমাধান করতে পারেনি। এ সমাধান সম্ভব ছিল যদি হিন্দু ভদ্রলোকেরা তাদের শ্রেণি ও ধর্মের অবস্থান থেকে সরে এসে মুসলমানদের, যাদের বেশির ভাগ ছিল নিম্নবর্গীয়, পাশে দাঁড়াতেন এবং তাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার একটি শক্তিশালী প্রকাশ ঘটাতেন। মুসলমানরা নিম্নবর্গীয়তার চাদরে এমনভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে, তারা আঠারো-ঊনিশ শতকজুড়ে প্রায় অদৃশ্য একটি অবস্থানে চলে গিয়েছিল।

তাদের যেহেতু চোখে পড়ত না, তাদের কথাও কেউ মনে করত না। এ জন্য একটা সময়ে বাঙালি ও মুসলমান দুটি পরিচয় আলাদা হয়ে দেখা দিল। অনেক ভদ্রলোক হিন্দুর কাছে বাঙালি মুসলমান পরিচয়টি ছিল স্ববিরোধী। যে ক'জন মুসলমান লেখক-চিন্তক-ঊনিশ শতকে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরাও তাঁদের বাঙালিত্বকে-বাঙালিয়ানাকে বড় করে দেখেননি। কেউ কেউ তো তা অস্বীকারও করে বসেছিলেন।

এই বিরোধ মেটানোর উদ্যোগ বাঙালি নিয়েছে কুড়ি শতকের রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ হলে কলকাতাকেন্দ্রিক সুশীল সমাজ, পূর্ববঙ্গীয় জমিদার শ্রেণি, যাদের

একটা বড় অংশ জমিদারি থেকে অনেক দূরে কলকাতাতেই বছরের বেশিরভাগ সময় থাকতেন, এবং রাজনৈতিক বিপ্লবীরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এই প্রতিরোধের তেজ পূর্ববঙ্গে অনুভূত হতে থাকে এবং মুসলমানরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক ভাতঘুম থেকে জেগে ওঠে। এ জেগে ওঠাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড় ফেরার ঘটনা। জেগে ওঠে বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালি, যারা বঙ্গভঙ্গের ফলে নানাভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনায় ছিল, তারা একটি রাজনৈতিক বিকল্প অবস্থান খুঁজতে লাগল এবং একই সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ হলো। রাজনৈতিক বিকল্পটি ছিল নিজেদের সংঘবদ্ধ করা এবং আত্মশক্তির অন্বেষণে নামা। এ দুটিই তারা করেছে তাদের বাঙালি অবস্থানকে বিসর্জন না দিয়ে বরং একে সুসংহত করে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দূরপ্রসারী চিন্তা ছিল। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালি মুসলমানের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হল। তারপর যত দিন গেল, হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং বিভেদ কমল। হিন্দু ভদ্রলোকেরাও মেনে নিলেন, মুসলমান বাঙালি এবং হিন্দু বাঙালির মধ্যে ধর্ম ও ধর্মাচার বাদ দিলে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই, বরং মিলগুলোই বেশি। একটি বিষয় তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উদযাপন করতে পারে এবং তা হচ্ছে বাঙালিয়ানা।

বাংলাদেশের কীর্তিমান লেখক, চিন্তাবিদ এবং সমাজসংস্কারকরা এ বাঙালিয়ানাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। যেহেতু তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদটা কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-মধুসূদন-নজরুল সবাই সামষ্টিক বাঙালিকে তাঁদের চিন্তা ও লেখার মাঝখানে স্থান দিয়েছেন, কোনো একটি সম্প্রদায়কে নয়। বাঙালিয়ানার প্রথম শর্ত তাই ধর্ম-সময়ে পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর বাঙালি সত্তাকে ধারণ করা।

১৯৪৭ সালে আবার বঙ্গভঙ্গ হলো, কিন্তু এবার কলকাতার সুশীল সমাজ ও জমিদার শ্রেণি একে সাদরে গ্রহণ করল। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা হয়ে বাঙালির দুই ভূখণ্ড দুটি পৃথক কক্ষপথে ঘুরতে থাকল। ততদিনে পূর্ববঙ্গের বাঙালি রাজনৈতিকভাবে

সচেতন ও শক্তিশালী হয়েছে। শিক্ষাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, বাঙালিয়ানার একটা মালিকানাও গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং সংস্কৃতি চর্চায় সব সময় এগিয়ে ছিল। সেও তার বাঙালিয়ানাকে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন করে পরখ করতে থাকল। কিন্তু দুই বাংলার বাঙালি একটা রাজনৈতিক সংকটেও পড়ল। পশ্চিমবঙ্গ ভারত প্রজাতন্ত্রের একটি প্রদেশ হল, অনেক প্রদেশের একটি, কিন্তু ভারতের ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেল। ক্ষমতাকেন্দ্রটি ছিল হিন্দুবলয়ে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বুঝতে পারল, ভারতের ক্ষমতা অথবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নামার তার সম্ভাবনা নেই। এর ফলে তার জীবন একটা প্রাত্যাহিক চর্চায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। উনিশ শতকে যে উদ্যম, প্রত্যয় এবং একাগ্রতা নিয়ে সে রেনেসাঁসের পথে হাঁটছিল, সে রকম তেজি ভাব নিয়ে হাঁটা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার একটি সুবিধা ছিল, ভারত রাষ্ট্র আর দশটা রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গকে নিজের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ায় তাকে সেই অবস্থানে যেতে বলা হলো না, যে অবস্থানে পূর্ববঙ্গের বাঙালি পাকিস্তানের সঙ্গে সংসার বাঁধার প্রথম দিনটিতেই নিজেকে আবিষ্কার করল, অর্থাৎ নিতান্ত উনজনের অবস্থানে। দিনে দিনে স্পষ্ট হল, এ অবস্থানটি উপনিবেশী প্রজার। ইংরেজদের উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা পড়ল পাকিস্তানি উপনিবেশের খপ্পরে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি যখন নিরুদ্বেগ হাঁটছে চেনা পথে, পূর্ববঙ্গের বাঙলিকে তখন রীতিমতো দৌড়াতে হচ্ছে এক প্রতিকূল যাত্রাপথে।

এই দৌড়ানোটা অবশ্য একটা দিগন্তের সন্ধান দেয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালিকে। এ দৌড় দিগন্তের না স্বাধিকারের? স্বাধীনতা, মুক্তি এবং নিজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিক্ষার মালিকানা নিজের হাতে নেওয়ার অনিবার্যতা।

বাঙালিয়ানার দ্বিতীয় শর্তও পূর্ববঙ্গের বাঙালি ততদিনে পালন করতে শুরু করেছে এবং তা হচ্ছে প্রতিকূল অবস্থানেও নিজস্বতাকে চিহ্নিত করা এবং পালকের মতো তা টুপিতে পরা।

২.

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে নানাভাবে পড়া হয়– ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ থেকে নিয়ে স্বাধীনতার প্রথম স্ফূরণ পর্যন্ত। আমি ১৯৫২ কে পড়ি বাঙালিয়ানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসার হিসেবে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার একটি দায়িত্ব পূর্ববঙ্গের বাঙালি নিজের হাতে তুলে নিল। ফল সব জায়গায় এসে এক হল। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর অনেক হিন্দু পরিবার বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, কিন্তু তারপরও অসংখ্য হিন্দু পরিবার বাংলাদেশে থেকে যায়। ভাষা আন্দোলনের পর যখন পাকিস্তানি শাসকের চোখ রক্তবর্ণ হলো, তখনই প্রথম বাঙালি মুসলমান দেখতে পেল, হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়ার, এদের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্বটা এখন তার ওপরই পড়েছে। সে বুঝল, এ দায়িত্বটা তাকে নিষ্ঠা দিয়ে সততার সঙ্গে পালন করতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বড় ঐক্যের জায়গা খুঁজতে হবে। ওই ঐক্যের জায়গাটাই বাঙালিয়ানা।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলমানই যখন ছিল ঊন-অবস্থানে, সেখানে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর অবস্থান কোথায় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। বাঙালি মুসলমান যদি নিজের বাঙালি পরিচয়টি গৌণ করে ফেলত, তাহলে সে পাকিস্তানি উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সফল হতো না, হয়তো তার প্রয়োজনও বোধ করত না। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি পরিচয়টিকে গুরুত্ব দিত না। ফলে তারা যে একটি উপনেবেশী শক্তির স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে, পাকিস্তানিদের সমান মর্যাদায় নয়, এ বিষয়টিও তাদের বিবেচনায় ছিল না। কিন্তু ১৯৫৪-এর নির্বাচনে এদের হঠিয়ে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরই বাঙালি রাজনৈতিকভাবে তার বাঙালিয়ানা প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ পেল, যার পিছনে প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন। এ বাঙালিয়ানায় মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান– সবার ছিল সমান প্রবেশাধিকার। বাঙালিয়ানার তৃতীয় একটি শর্ত হল এ যে, এ পরিচয়টি প্রধানত সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক হলেও একে রাজনৈতিক কষ্টিপাথরে মাঝেমধ্যেই পরখ করে নিতে হয়, এবং সেই রাজনীতির চরিত্র গণমুখী, গণতান্ত্রিক,

সবার অংশগ্রহণমূলক এবং অসাম্প্রদায়িক। পুরো ষাটের দশকজুড়ে আমরা পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছিলাম বৃত্তের বাইরে। তাতে অবশ্য একটা লাভ হয়েছে আমাদের, যেহেতু সেই রাজনীতি ছিল সমরবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং স্বৈরতান্ত্রিক। সেই রাজনীতির বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ষাটের দশকে বাঙালি সংগ্রাম করেছে গণতন্ত্র, শান্তিবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য। এ আকাঙ্ক্ষা ও চেতনা সমৃদ্ধ করেছে আমাদের বাঙালিয়ানার চিন্তা এবং প্রকাশকে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সব বাঙালি যে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের মাঠে নামল, তা ওই বাঙালিয়ানার একটি মহৎ প্রকাশ। একাত্তরে বাঙালিয়ানার একটি পরীক্ষা হয়েছে এবং তাতে আমরা সফল হয়েছি। ফলে একাত্তরের বাঙালিয়ানা একটা মডেল হয়ে রয়ে গেছে আমাদের কাছে।

বাঙালিয়ানার চতুর্থ একটি শর্ত তাহলে এই : এর বলিষ্ঠ প্রকাশের জন্য একটা শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হয়। প্রতিদিনের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনে বাঙালিয়ানাতে আমি ঘুমোতে দেই, অথবা যখন স্বার্থের কলহে লিপ্ত হই, অথবা রাজনীতির লাভক্ষতির অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন বাঙালিয়ানাকে একটি পোশাকি বিষয়ে পরিণত করে ফেলি। কিন্তু কঠিন সময়ে, শীতল ও শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যখন আমরা দাঁড়াই, আমাদের তখন শক্তি ও সাহস জোগায়, আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে বাঙালিয়ানার অভিমান এবং অহংকারগুলো, এর অন্তর্নিহিত শ্রেয়বোধ এবং সুন্দরের চিন্তাগুলো। কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁর এক কবিতায় অদম্য আইরিশিয়ানা বা Indomitable irishry-এর উদ্‌যাপন করেছিলেন। আমরাও অসংখ্যবার অদম্য বাঙালিয়ানার উদ্‌যাপন করেছি। বাঙালিয়ানা কোমলে-কঠোর-প্রেমে-দ্রোহে-আগুনে-জ্বলে-তেলে-তেজে-মমতায় মেশানো এক অস্তিত্বশিল্পের নাম, যেখানে শিল্প ও শিল্পী এক হয়ে যায়। আবারও ইয়েটস থেকে ভাষা ধার করে বলা যায়, নৃত্য থেকে নর্তকীকে তখন আলাদা করা যায় না। বাঙালিয়ানার মৌলিক উপাদানে বৈপরীত্যের অবস্থান এবং বাঙালিয়ানার বিপদটাই সেখানে। কোমল যখন কঠোরের সঙ্গে

দ্বান্দ্বিক একটি অবস্থানে থাকে, তখন কোমলের সব চিহ্নকে শনাক্ত করা যায় এবং বিপরীত অবস্থানের বিচারে সেগুলোকে পরিমাপ করা যায়। এই দ্বান্দ্বিক অবস্থান তাকে একটি শুদ্ধতা দেয়, যা কোমলের সারবস্তু, এর মৌলিক রূপ। কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে কোমল যদি একক একটি অবস্থান নেয়, তখন কোমল অতি-কোমল হয়ে দাঁড়াতে পারে, তার শুদ্ধতা চলে যেতে পারে। কঠোর, একইভাবে, কোমলের হাত ছেড়ে দিলে অতি-কঠোরে পরিণত হতে পারে, এবং তখন সেই অশুদ্ধ কঠোরে বীভৎসতা, সহিংসতা– এসব ঢুকে যেতে পারে। বাঙালি চরিত্রে মাঝেমধ্যেই যেসব অশুদ্ধতা সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো ঘটে দ্বান্দ্বিক ভারসাম্যটি নষ্ট হলে। এ ভারসাম্য রক্ষা করে বুদ্ধি, যুক্তি এবং কিছু পরিমাণ আবেগ; ভারসাম্য হারালে আবেগটা প্রকাণ্ড হয়ে পড়ে। তখন ক্রুদ্ধ কুপিত বাঙলি প্রতিবেশীকে আঘাত করে, নিজের পায়েও কুঠার চালাতে পারে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙালি চরিত্র পড়েছেন খুব নিস্পৃহভাবে, কখনো একজন উন্নাসিকের দৃষ্টি দিয়ে। এবং তিনি তাতে বাঙালির আত্মঘাতী প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছেন। 'আত্মঘাতী বাঙালি' নামে তিনি একটি বই লিখেছেন, যেখানে তিনি পরিতাপের সঙ্গে বলেছেন, 'আজ বাঙালি জীবনে যে জিনিসটা প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ সেটা এই : মৃত্যুযন্ত্রণারও অনুভূতি নাই; আছে হয় পাষাণ হইয়া মুখ বুঝিয়া সহ্য করা; অথবা সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রাণমাত্র রাখা; আরেকটা ব্যাপারও আছে– জাতির মৃত্যুশয্যার চারিদিকে ধনগর্বে উল্লসিত বাঙালি প্রেত ও প্রেতনীর নৃত্য'(১১)। আমি যে ভারসাম্যের কথা বলেছি, যে ভারসাম্য বাঙালিয়ানার সুষম প্রকাশের জন্য একটি আবশ্যকতা, নীরদ চৌধুরী তার অভাবের কথাই লিখেছেন। মৃত্যুযন্ত্রণার অনুভূতি তখনই প্রবল হবে, যখন জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা হবে। যদি জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো অস্পষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট থাকে, তাহলে মৃত্যুর পাল্লাটি ভারী হয়ে যায়। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বরাবরই বৈষম্য ছিল, এখনো আছে, এবং বৈষম্য প্রকট হচ্ছে, কিন্তু কৃষিনির্ভর সমাজে শ্রেণিগুলোর মধ্যে একটা যোগাযোগ অন্তত ছিল। 'ধনগর্বে উল্লসিত বাঙালি প্রেত ও প্রেতনী' সাম্প্রতিক সময়ের সৃষ্টি, যার মূলে আছে

কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্প ও বিশাল নিয়োগনির্ভর অর্থনীতির দিকে আমাদের যাত্রা। বাঙালিয়ানার একটি পরিচয় সাম্য এবং সংঘবদ্ধতা। 'ধনগর্বে উল্লসিত বাঙালি' সেই সাম্যের এবং সংঘের ধারণার বাইরে বা বিপরীতে অবস্থান করে।

আমি যে ভারসাম্যের কথা বলেছি, তা বুদ্ধি এবং যুক্তির পথে অর্জন করেছে বাঙালি, তার আবেগকে শুদ্ধতার পথে পরিচালনা করেও। আবার ভাবের সংহত চর্চাতেও সেটি সম্ভব হয়েছে। বস্তুত বাঙালির লোকজ জীবনে ভাবের ও সহজিয়া চিন্তার মাধ্যমে এ ভারসাম্যটি যুগ যুগ টিকে আছে। আমাদের বাউল কবিরা বহু আগেই দেহ ও আত্মার, অন্তর এবং বাহিরের, শান্ত এবং অনন্তের মিলের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেছেন। বাঙালির লোকজ মনীষা বাঙালিয়ানাকে উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছে। নীরদ চৌধুরী উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে পশ্চিমা শিক্ষার আচারকে লোকজ মনীষার বিকল্প ভেবে তাকে অবহেলা করার ফলেই বাঙালি তার চিরায়ত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। চৌধুরী অবশ্য উল্লেখ করেছেন, 'বাঙালির বাঙালি বলিয়া যতদিনের ইতিহাস আছে তাহার সবটুকু জুড়িয়া ভাল বাঙালি শুধু আপন ভোলা বাঙালির মধ্যেই দেখা দিয়েছে' (১৩৮)।

আপন ভোলা, অর্থাৎ বিষয়চিন্তা যাকে অধিকার করেনি; পরশ্রীকাতরতা যাকে কাবু করেনি, জীবনের ছোট-বড় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যাকে উতলা করেনি। বাউলিয়ানার মধ্যে একটি সহজাত আপন ভোলা প্রকাশ দেখা যায়। এবং বাঙালিয়ানার মধ্যেও। বাঙালিয়ানার আরেকটি শর্ত এ 'আপনাতে আপনি পূর্ণ' আপন ভোলা, উদারদৃষ্টি। বিষয়চিন্তায় যে পিষ্ট, ধনগর্বে যে উল্লসিত, তার বাঙালিয়ানা প্রকৃত নয়, আরোপিত।

বাঙালিয়ানার অনেক রূপ। হালের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো, জীবনশৈলীর প্রচারক ও প্রসারকরা, দৃশ্য মাধ্যমের কারিগররা বাঙালিয়ানাকে পণ্যপ্রবাহের মাঝখানে ফেলে দিয়েছে। তাতে একটা আরোপিত বাঙালিয়ানাই যেন মুখ্য হয়েছে। বলা যায়, বাঙালিয়ানাকে একটা ব্র্যান্ডের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। বাঙালিয়ানার একটি শর্তও বোধ হয় এ যে, একে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ

একভাবে করেছেন; 'ভদ্র মোরা' শান্ত বড়, পোষ মানা এ প্রাণ/ বোতাম আঁটা জামার নিচে বাঙালি সন্তান; যেখানে শ্লেষ ও কৌতুক দিয়ে তিনি আড়ালে পড়া প্রকৃত বাঙালিয়ানার ছবিটা তুলে ধরতে চাইছেন; নীরদ চৌধুরী আরেকভাবে করেছেন, আবার এ সময়ের মিডিয়া এবং জীবনশৈলী বিষয়ক ম্যাগাজিনগুলো অন্য একভাবে করছে।

তাতে ক্ষতি নেই। যুগটা উত্তরাধুনিকতার, পণ্যপ্রবাহের, মুখ ঢেকে যাওয়া বিজ্ঞাপনের এবং জমকালো প্রদর্শনী বা Spectacle- এর। রবীন্দ্রনাথ সেই কবে ঠাট্টা-কৌতুক করে বাঙালিয়ানার স্খলনগুলো যদি চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে করপোরেট বাঙালিয়ানার ইমেজ থেকে আসল বাঙালিয়ানার দিকে দৃষ্টি কেন দেওয়া যাবে না। এবং এই 'আসল' বলতে আদৌ কিছু আছে কিনা, থাকলে কার বা কাদের বিবেচনায় আসল, কোন মাপকাঠিতে ইত্যাদি সেসব প্রশ্নও তোলা যায়। বাঙালি বনাম বাংলাদেশি নিয়ে যেমন কূটতর্ক হয়েছে, সে রকম বাঙালিয়ানা নিয়েও তর্ক হতে পারে। আমরাই তো দাবি করি, পাঁচ বাঙালিকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখলে দু'দিন পর ছ'টি রাজনৈতিক দল তৈরি করে তারা বেরিয়ে আসবে; তাহলে তর্কাতর্কিকে বিসর্জন দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।

বাঙালিয়ানার একটা শক্তি মেলাবার, নানাবিধ সমীকরণের। এখন যে পয়লা বৈশাখে দেশ জাগে এক বিশাল উদ্‌যাপনে, ফেব্রুয়ারিতে দেশ জাগে শোকের উৎসবে, মার্চে আন্দোলিত হয় স্বাধীনতার চেতনায়, ফাল্গুনের প্রথম দিনে, এমনকি করপোরেট ঠাকুরদের তৈরি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে প্রেমঘন চোখে তাকায় জগতের দিকে এবং সারা বছর এমন অসংখ্য আয়োজনে আনন্দ খুঁজে নেয়, তাতে বোঝা যায়, বাঙালিয়ানার দায়িত্ববোধের সঙ্গে যোগ হয়েছে এর আনন্দ এবং উদ্‌যাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

বিশ্বায়নের যুগের, উৎকর্ষ-সন্ধানী প্রযুক্তির যুগে বাঙালি বোতাম আঁটা জামা পরে ঘরে বসে থাকতে পারবে না, তাকে বরং যোগ দিতে হবে জগতের কর্মপ্রবাহে, উৎসবে-আয়োজনে, জ্ঞানসাধনা এবং সৃষ্টিশীলতার নানা চর্চায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এ জন্য বাঙালিয়ানার একটি বৈশ্বিক রূপও তৈরি করতে

হবে। আজকের পণ্যবাজারের পরিভাষায় বলা যায়, বাঙালিকে নতুন করে একটি ব্র্যান্ড তৈরি করতে হবে। এই ব্র্যান্ড বা পরিচয়কে খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি ভিন্ন ও নেতিবাচক পরিচয়কে ভাঙতে হবে, যে পরিচয়ে বাঙালি অলস, কলহপ্রিয়, আত্মঘাতি। যেমন বাংলাদেশ সম্পর্কে পরিচয়টি হচ্ছে এটি দুর্যোগপ্রবণ, দারিদ্র্যপীড়িত, সহিংসা এবং রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটি দেশ। বাঙালিয়ানার নতুন পরিচয়টি কি হতে পারে না শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, আত্মবিশ্বাসী, উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতার অধিকারী এবং জীবনবাদী হিসেবে? অবশ্যই পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বাঙালিয়ানারা এই পরিচয়গুলো নিজেদেরই ধারণ করতে হবে, যেগুলোর চর্চা করতে হবে। প্রযুক্তি বিত্তশালীদের দেয় জীবনকে উপভোগ কারার অনেক সুযোগ কিন্তু দরিদ্রদের জন্য এটি অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় বঞ্চনার একটি হাতিয়ার, কোনো কোনো সময় অভিশাপ। ধনী-দরিদ্রে এখন শ্রেণির মতো 'ডিজিটাল ডিভাইড' বা প্রযুক্তিগত ব্যবধানও প্রকট। কিন্তু এই প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে ব্যবধান বা বিভাজন ঘুচিয়ে একটা সম্মিলনের ক্ষেত্র আমরা বরং প্রস্তুত করতে পারব।

দৃশ্যমান বা দৃশ্যসংস্কৃতির এক বড় ভিত্তি হচ্ছে প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের ঢেউ দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পেছনে আছে এই প্রযুক্তি। পশ্চিম এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক, কিন্তু এখন আর একচ্ছত্র মালিক নয়। এতদিন পশ্চিমের দৃশ্যসংস্কৃতিকেই আমরা গ্রহণ করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আমরাও পারি পশ্চিমের কাছে আমাদের সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতে। অবশ্য এই পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক শক্তি। আজকাল পকেটে টাকা আর মাথা বোঝাই জ্ঞান না থাকলে বিশ্বসভায় কেউ ঠাঁই পায় না। আমাদের জ্ঞানের কমতি নেই, টাকার দিকে থেকে যে ফকির তা নয়। একজন অর্থনীতিবিদ লিখেছেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের কুড়িটি বড় অর্থনৈতিক শক্তির একটি হতে পারে। সত্য-মিথ্যা পুঁজিবাজারের ঈশ্বর জানেন।

আজ না হোক, কাল অথবা পরশু তো আমাদের অর্থনীতি শক্ত হবে, আমরাও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন করব। তখন বিশ্ব আগ্রহ ভরে তাকাবে আমাদের দিকে। আর আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়টিই

তখন বিশ্বকে দেব, সেই পরিচয়টি যোগ হবে নবজন্ম লাভ করা বাঙালিয়ানায়।

বাঙালিয়ানার একটা ঘরোয়া রূপ আছে, একটা বৈঠকি রূপ আছে, একটা পোশাকি রূপও আছে। প্রযুক্তির কল্যাণে দৃশ্যমাধ্যমে এবং জীবনশৈলীর ম্যাগাজিনসহ ছাপা মাধ্যমে এখন বাঙালিয়ানার একটা স্মার্ট পরিচয়ও দেখা যাচ্ছে, যাকে ব্র্যান্ড হিসেবে চালিয়ে দিতে ফ্যাশনশিল্প এবং ফ্যাশনের সঙ্গে সম্পর্কিত এর আগ-পাছের বাজার সক্রিয়। আগেই বলেছি, এই স্মার্ট পরিচয়টি ভাবের, ভাবনার অথবা অনুভবের নয়, বরং বাহ্যিক প্রকাশের। অনেকে এই বাঙালিয়ানা নিয়ে আপত্তি তোলেন; বলেন, এটি আরোপিত অথবা নির্মিত, প্রকৃত নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য, তাতে কিছু যায় আসে না। স্মার্ট ব্র্যান্ডটা প্রতিষ্ঠা পেলে তাতে সারবত্তা ঢোকাতে সময় লাগবে না। লাগেও না বস্তুত। দৃশ্যমাধ্যম একজনকে লাখোজনের সঙ্গে মেলাচ্ছে, একটি স্থানীয় ইমেজকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক করছে। এতে স্থান-কালের খুঁটিতে বাঁধা অনেক বর্ণনা-আখ্যান-চিন্তা-তত্ত্ব সর্বগামী হয়েছে। এই যুগের কাজই হচ্ছে ছড়িয়ে দেয়া, ছড়িয়ে পড়া। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Dissemination। বাঙালিয়ানাও বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরার দেয়ালের মধ্যে বাঁধা পড়বে কেন? তৃতীয় বাংলা বলতে অনাবাসী বাঙালির যেসব জঙ্গম সংঘ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো তো সর্বত্রই বাঙালিয়ানাকে ধারণ করে। লেখার শুরুতে আমি যে পুনর্জন্মের কথা বলেছি, দৃশ্যমাধ্যম তথা দৃশ্যসংস্কৃতির বিস্তার তাকে অনিবার্য করেছে। এই সাংস্কৃতিক বহুতত্ত্ববাদ, উত্তর-পুঁজিবাদ, বিশ্বব্যাপী ছাড়ানো ডায়াসপোরা এবং ভার্চুয়াল অস্তিত্বের যুগের বাঙালিয়ানাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হবে, এর মৌল চরিত্রগুলোর সঙ্গে আমাদের সময়ের অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনিবার্যতাকে যুক্ত করতে হবে। তাতে বাঙালিয়ানা নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাবে নিজের ভিতরে।

বাঙালিয়ানার একটা দিক হচ্ছে এর অনাগ্রাসী চরিত্র। কিন্তু বাংলাদেশেই পাহাড়িদের, আদিবাসীদের, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ওপর এর হামলে পড়াটা বড় একটা ধাক্কা দিয়েছে এর অনাগ্রাসী

পরিচয়ে। এই আগ্রাসন রাজনৈতিক, বৈষয়িক, মতলবি। এ জন্য বাঙালিকে দায়ী করা যায়, বাঙালিয়ানাকে নয়। আমি নিশ্চিত, রাজনীতি যখন সমাধান করতে উচ্ছুক হবে পাহাড়ি-আদিবাসীদের নানান সমস্যার, তারাও স্বীকার করবে, বাঙালিয়ানা নয়, সমস্যাটা তৈরি করেছে কিছু মতলববাজ বাঙালি ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন এবং পাহাড়ে নিরাপত্তার দায়ে নিযুক্ত প্রহরীরা।

যেহেতু চারদিকের প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালিয়ানা আমাদের প্রতিরোধের মন্ত্র দিচ্ছে, আমরা ধরে নিতে পারি, বাঙালিয়ানার একটা পুনর্জন্ম হয়েছে। এই পুনর্জন্মে বাঙালিকে প্রথম নিজের শক্তিগুলোকে জাগাতে হবে। জাগছে কিছুটা, কিন্তু জাগানোটা অনেক বড় ও ব্যাপক করে চাই। তারপর দেখা যাবে, বাঙালিয়ানার অনেক রূপের সঙ্গে বৈশ্বিক একটি রূপও যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে বেড়াতে আসা এক মার্কিন চিত্রকর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত কষ্ট, এত প্রতিকূলতা, এত অভাবের মধ্যে তোমরা খালি হাস। এত হাসতে পার কিভাবে?

আমি বলেছিলাম, এর কারণ আমাদের বাঙালিয়ানা। অদম্য বাঙালিয়ানা।

প্রতিবছর এই হাসিটি বিস্তৃত হচ্ছে, একদিন এবং অচিরেই বাঙালিয়ানার অট্টহাসি প্রতিপক্ষকে হতভম্ব করবে, তার সংবিৎ ফেরাবে, তাকে পথ দেখাবে, আলোটা চেনাবে, খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার আহ্বান জানাবে।

সেই দিনের লক্ষ্যেই বাঙালিয়ানার একটা পুনর্জাগরণ হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গোস্বামী, পরিমল, রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি, বাংলা ভাষা ও নানা নিবন্ধ, কলিকাতা; প্রাইম পাবলিকেশনস, ১৯৮৮। চৌধুরী, নীরদচন্দ্র, 'আত্মঘাতী বাঙালি', কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮৮।

বাঙালিয়ানা, এজন্যই কিনা, কোন স্থির নির্দিষ্ট কিছু নয়, হওয়ার কথাও নয়। এটি সময়ে-সময়ে পাল্টায়, যদিও এর মৌল

চরিত্রগুলো, যেগুলোর বর্ণনাও ওপরে দেওয়া হয়েছে, পাল্টায় না, অথবা সেগুলো একের সঙ্গে অন্যে নতুন-নতুন সমীকরণে জড়িয়ে পড়ে। এ পরিবর্তনশীল বাহ্যপ্রকাশগুলোই বাঙালিয়ানাকে ক্রমাগত আবিষ্কারের এবং পুনরাবিষ্কারের বিষয়ে পরিণত করেছে।

তিন.

আমাদের সময় বাঙালিয়ানার একটি নতুন জাগরণ, অথবা নতুন জন্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, অথবা আমাদের ধারণা দেখতে পাচ্ছি। দুই কারণে এটি ঘটতে পারে। প্রথমত, এমন হতে পারে যে, প্রকৃতই বাঙালিয়ানার পুনর্জন্ম হচ্ছে, যেহেতু বাঙালিয়ানা কোনো একক নির্দিষ্ট জলরোধক প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত কোনো সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক সম্পত্তি নয়, বরং যুগে যুগে এর প্রকাশে পরিবর্তন ঘটে, এর মৌল চরিত্রগুলো না বদলালেও। অথবা এমনও হতে পারে, আমরা চাইছি, বাঙালিয়ানা সময়ের ডাকে নতুন করে জাগবে, যেহেতু সময়টা বৈরী। দুটোই হয়তো হচ্ছে, দ্বিতীয়টাই হয়তো প্রথমটিকে অনিবার্য করে তুলছে।

আমি আগেই বলেছি, সময় প্রতিকূল হলে, প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে বাঙালিয়ানার একটা বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। বলা যায়, দ্বান্দ্বিকতার শক্তিতেই তা বলীয়ান হয়। গত কুড়ি বছরে বাঙালি সংস্কৃতি বিপদের মুখে আছে– আগেও ছিল, কিন্তু এখন প্রতিপক্ষ মূলধারাতেই একটা পা যেন রেখেছে। এ প্রতিপক্ষের যে অবস্থান, তা বাঙালিয়ানার বিপরীতে যায়– যেমন প্রতিপক্ষ উদার ও অগ্রসর চিন্তার নয়; প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন; জাতির শৌর্য-বীর্যের ইতিহাসকে তারা অস্বীকার করে; প্রতিপক্ষ আমাদের সংস্কৃতিতে বহুজনের মিলনের বিষয়টি মেনে নিতে পারে না; প্রতিপক্ষের আধিপত্যবাদী চিন্তায় সহিংসতা একটি অনিবার্য শর্ত; প্রতিপক্ষের দৃশ্যকল্পনায় ঔদার্য নেই, সেখানে আছে সংকীর্ণতা, এরা নৃত্য-গান নববর্ষ উদ্‌যাপন অথবা প্রতীকী যে-কোনো আচারকে বিজাতীয় ভাবে। এরকম প্রতিপক্ষ সব সময়েই ছিল, কিন্তু এরা শক্তিশালী, সংগঠিত। অন্য অনেক দেশে এ রকম বিরোধ নিষ্পত্তি হয় যুক্তিতর্কে, আলাপ-আলোচনায় অথবা সহিংসতায়। প্রতিপক্ষ হিংসায় বিশ্বাস না করলে পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্ক করে, সহিংস হলে

প্রতিপক্ষও সহিংস হয়। কিন্তু বাঙালিয়ানা অহিংসায় বিশ্বাসী। এর আদর্শে আছে নান্দনিকতা এবং রুচিশীলতা। ফলে প্রতিপক্ষের বিপরীতে তাকে দাঁড়াতে হয় একটা অহিংস কিন্তু প্রত্যয়ী অবস্থান থেকে। তাকে মানুষকে উজ্জীবিত করতে হয় তাদের শ্রেয়চিন্তা জাগিয়ে, শুভ-অশুভের প্রভেদটা বুঝিয়ে। প্রতীক এবং ইমেজের সাহায্যে প্রেরণা জোগাতে হয়। মানুষকে জাগাতে বিপরীত সম্ভাবনার ছবিটাও তুলে ধরতে হয় তাকে– কী হতে পারে, যদি প্রতিপক্ষের শক্তি বাঙালিয়ানার শক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে? তবে একই সঙ্গে এই বাণীও মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, বাঙালিয়ানার আসল শক্তি অন্তরের, মাটির ও শিকড়ের। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন মতাদর্শ কখনো বাঙালিয়ানার মৌল শক্তিগুলোকে পরাভূত করতে পারে না। পাঠান-মোগল এ দেশে এসে বাঙালিকে পাঠান-মোগলের সংস্কৃতিতে স্থানান্তর করতে পারেনি, উল্টো তারাই সহ-অবস্থানের একটি নীতি নিয়েছিল। ইংরেজদের থেকে বড় প্রতিপক্ষ তো এ দেশের কেউ ছিল না। ইংরেজরাও পারেনি ইংরেজিয়ানার চাদরে আমাদের মুড়ে দিতে। এমনকি ইংরেজি শিখিয়ে বাদামি সাহেব তৈরি করতে পারেনি। পাকিস্তানিরাও তো কম করেনি। তারা তো গোড়াতেই উর্দুভূত করতে চেয়েছিল আমাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে। পারল কই? ১৯৭৫ থেকে নিয়ে অনেকগুলো বছর তো চেষ্টা হলো বাঙালিয়ানার ভিতর অনেক অশুদ্ধতা ঢুকিয়ে একে দুর্বল করে ফেলার। বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিতর্কিত করে, অসত্য-অর্ধসত্য ঢুকিয়ে একটা খিচুড়ি বানিয়ে দুই-তিন দশক শিক্ষার্থীদের একটা বিকল্প ইতিহাস শেখানো হলো, আমাদের সংস্কৃতির অনেক সূক্ষ্ম জায়াগায় ছুরি চালানো হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যারা জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাদের বাদ দিলে বাকিরা কেউ দিশেহারা হয়নি। সত্য রয়ে গেছে সত্যের জায়গায়। সম্প্রতি শাহবাগ এ সত্যটি আবার প্রমাণ করে দিয়েছে। এ হচ্ছে বাঙালিয়ানার অন্তরের শক্তি। মনে আছে, চিরদিনের গায়েহলুদ উৎসবকে হঠাৎ একদিন অনেককে বলতে শুনলাম মেহেন্দি উৎসব। মেহেদিও গায়ে হলুদের একটি উপাদান বটে, কিন্তু হলুদকে বাদ দিয়ে 'মেহেন্দি'কে সেই জায়গা দেওয়ার পিছনে একটি মতলব আছে এবং সেটি সাম্প্রদায়িক। কিন্তু এখন আর মেহেন্দি উৎসবের

কথা শুনি না, গায়েহলুদ আবার ফিরে এসেছে। এ রকম আরও উদাহরণ আছে। তবে আগামীতে এ রকম অপতৎপরতা আরও যে বাড়বে, তা বলে দেওয়া যায়। তাতেও শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

বাঙালিয়ানার পুনর্জাগরণ ঘটেছে নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। বাঙালিয়ানা পরমুখাপেক্ষি নয়, সে নিজেতে নিজেই পূর্ণ। এজন্য এমনকি কলকাতার বাঙালিয়ানা থেকেও এটি আলাদা। কলকাতার বাঙালিয়ানাতে আচারটা আমার বেশি মনে হয়েছে। এর একটি এলিট প্রকাশ যেমন আছে, একটি মধ্যবিত্তীয় প্রকাশও আছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিয়ানা রাজনৈতিক সক্রিয়তার জায়গায় নেই, একসময় থাকলেও। এতে সংখ্যালঘুদের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতি– না, দলীয়, নির্বাচনমুখী অথবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি নয়, মানুষের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য যে রাজনীতি- বাঙালিয়ানার একটি শক্তি জোগায়; এ বাঙায়িনায় এলিট চিন্তা নেই, আছে সকল মানুষের সমান অংশগ্রহণের আহ্বান এবং সুযোগ। এ বাঙালিয়ানায় আচার এবং অন্তঃসার মিশে থাকে, আলাদা হয়ে থাকে না।

বাঙালিয়ানার যে করপোরেট রূপের কথা আমি বলেছি, তারও দেখা অবশ্য বাংলাদেশে মেলে, তবে তা নির্মিত একটি রূপ। এর ধারক ও বাহক পণ্যসংস্কৃতি, দৃশ্যমাধ্যম এবং শহুরে মধ্য ও উচ্চবিত্ত। সমাজের ইমেজের গুরুত্ব সৃষ্টি করে এধরনের আরোপিত সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে পণ্যায়নের উদ্দেশ্য সফল করাই করপোরেট ঠাকুরদের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক আগে ১৯৬৭-৬৮ সালে গি ডিবর্ড নামের এক ফরাসি নৈরাজ্যবাদী মার্কসবাদী এক বই লিখেছিলেন, "দ্যা সোসাইটি অব দ্য স্পেকট্যাকল' যাতে তিনি দেখিয়েছিলেন, পুঁজি ও পণ্যসংস্কৃতি কীভাবে সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করে এবং এ পণ্যায়নে প্রধান ভূমিকা রাখে ইমেজ ও তার জমকালো দৃশ্যমানতা। ডিবর্ড জানান, এ স্পেক্ট্যাকল বা ঝলমলে প্রদর্শনীর পিছনে আছে ইমেজের মোহ, যা পণ্যসংস্কৃতির প্রসারের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি। বাঙালিয়ানার কিছু গূঢ় প্রকাশ আছে– যেমন এর অসাম্প্রদায়িকতা, এর অগ্রসরবাদিতা– যেগুলো দেখার বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়। ইমেজ সংস্কৃতি এগুলোকে

তুলে ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য পায় না। তাই নতুন নতুন ইমেজ তৈরি করে এগুলোকে কাজে লাগাতে চায়। মোবাইল ফোনের অথবা স্বাস্থ্যসেবার বিজ্ঞাপনে অনুভবের বিষয়গুলোকেও ইমেজের জেল্লা দিয়ে আকর্ষণীয় করে দেখানো হয়। কিন্তু বাঙালিয়ানার কিছু বাইরের প্রকাশ আছে এর উদ্‌যাপনের, সম্মিলনের বিষয়গুলো যেমন— বাঙালির পোশাক— পশ্চিমবঙ্গের পুরুষের ধুতি-পাঞ্জাবি, বাংলাদেশের পাজামা-পাঞ্জাবি এবং উভয় ভূগোলে নারীর শাড়িকে বাঙালিয়ানা উপস্থাপনার একটি মোড়ক হিসেবে দেখা হয়। লক্ষণীয়, বাঙালির লুঙ্গি এ তালিকা থেকে বাদ, যেহেতু পণ্যপৃথিবীতে ঢুকতে পারে তারা, যারা খরচ করতে পারে। মধ্যবিত্ত এ জন্য পণ্যপুঁজির আসল লক্ষ্য। যেহেতু মধ্যবিত্ত কখনো তার স্থিতাবস্থা নিয়ে খুশি নয়, সে উপরে উঠতে চায়, পারলে মধ্যবিত্তের দাগটা শরীর থেকে মুছে ফেলে একটা প্রমোশন চায়, মধ্যবিত্ত উৎসবে-পার্বণে লুঙ্গি পরে না। সেজন্য বাঙালিয়ানার ছবিতে লুঙ্গি নেই।

তবে এসব বাহ্য এবং বাহ্য হলেও, তৈরি করা হলেও পণ্যপুঁজির কারসাজিতে হলেও এবং মিডিয়া ও জীবনশৈলী ম্যাগাজিনগুলোর কল্যাণে চাহিদা ও জোগানের চক্রে পড়ে পুনরাবর্তিত হতে থাকলেও এরও প্রয়োজন আছে। এমন তো নয় যে বাঙালিয়ানার এ বাহ্য প্রকাশ এর খুব ক্ষতি করছে। কেতাদুরস্ত, পরিপাটি, উৎসবপ্রিয় এবং সংঘপ্রিয় হিসেবে এ পরিশীলনে একটা মধ্যবিত্তীয় উপস্থাপন করা হয়েও থাকে গড় বাঙালিকে। তাহলেও তো দোষের কিছু নেই। বাইরের প্রকাশ তো আর অন্তরের মূল্যবোধগুলোকে ঢেকে দিতে অথবা এসবের ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বাঙালিয়ানার একটা যে পুনর্জন্ম হয়েছে, অথবা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা, অথবা হওয়া উচিত বলে আমাদের অভিপ্রায়, তার দুটি রূপের কথা একটু আগে বলেছি। বাহ্য রূপটা তো ইমেজের সার্বভৌমত্ব এবং সর্বগামিতার কল্যাণে আমরা ক্রমাগত দেখছি। এ বাহ্য রূপে বাঙালিয়ানা শুধু স্থানীয় নয়, বৈশ্বিকও। ফলে বাঙালিয়ানা এখন একটি স্বাধীন জাতিসত্তার স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশও। অনেকের একটা ধারণা, বাঙালিয়ানার ব্যাপারটা প্রকাশের ব্যাপার।

অন্য অনেকের ধারণা, এটি অনুভবের ব্যাপার। দুই চিন্তাতেই সার আছে। পঞ্চাশ বছর আগে পরিমল গোস্বামী একটি লেখায় এরকম মন্তব্য করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ইংরেজি ভালো জানে, (বিলেতে কিছুকাল বাস করে এলে আরও ভালো হয়) অথচ যে ব্যক্তি বাড়িতে খালি গায়ে থাকেন, চটি পরেন, বিলেতে থাকা সত্ত্বেও পূজার্চনাদি করেন, তারা খাঁটি বাঙালি' (১৯)। তাঁর মতে, পায়ে চটি আছে কিনা তা দেখে বাঙালিত্ব নির্ণয় করতে হবে। এটি বাঙালিয়ানার খুব দুর্বল একটি বর্ণনা। এতে বাঙালিয়ানা কিছু ব্যবহারে, আচারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন বাঙালি ইংরেজি না জেনেও, বাড়িতে খালি গায়ে না থেকেও, পূজা-অর্চনা না করেও খাঁটি বাঙালি হতে পারেন, যদি তার মনটা জুড়ে বাংলাদেশ থাকে, মানুষের জন্য হিতাকাঙ্খা থাকে, প্রকৃতির জন্য আকুলতা থাকে, সবার জন্য তার দ্বার অবারিত থাকে এবং যিনি কিছু আচারের বৃত্তে নিজেকে বন্দি না করে বহুজনের জীবনকৃত্যে সংযুক্ত করতে পারেন। পরিমল গোস্বামীর খাঁটি বাঙালি যখন পূজায় বসেন, তখন তার মুসলমান প্রতিবেশী একটা অনুরোধ অথবা দাবি নিয়ে এলে যদি ধর্মেকর্মে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য তিনি তার ওপর বিরক্ত হন, তবে তার বাঙালিয়ানায় একটা কালো দাগ পড়বে। বাঙালিয়ানার একটি পরিচয় এর ঔদার্য্য এবং প্রসন্নতা। শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের মধ্যে যা সব সময় দেখা যায়।

বাঙালিয়ানার পুনর্জন্ম হয়েছে, যেহেতু এটি সময়ের একটি দাবি। এ বাঙালিয়ানার আত্মবিশ্বাস আছে, কিন্তু ঔদ্ধত্য নেই। আমি সুযোগ পেলেই ঢাকার বাইরে যাই এবং দেখি, যত কুসংস্কার বাড়ছে, সংঘাত-দ্বন্দ্ব বাড়ছে মানুষে-মানুষে, কিছু মানুষ পিছন দিকে ঠেলে দিতে চাইছে দেশটাকে এবং নারীদের চার দেয়ালের ভিতর ফিরিয়ে দেওয়ার আয়োজন চলছে, তত মুক্ত হচ্ছে মানুষ, আরোপিত চিন্তার অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসছে। আপন শক্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এবং যারা আশা জাগাচ্ছেন, তাদের বেশিরভাগ তরুণ।

একসময় আমি নিশ্চিত, যারা অন্ধকারে পথ হাঁটছে, যারা বিভ্রান্ত এবং বাঙালি পরিচয় নিয়ে কুণ্ঠায় আছে, তারাও জেগে ওঠে তরুণদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

বাঙালি সমাজ

বাঙালির সবচেয়ে বড় সমালোচক বাঙালি নিজেই। বাঙালির মতো এত আত্মসমালোচনামুখর জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ! এ সমালোচনা প্রায়শ নেতিবাচক এবং এর একটি সারাংশ দিতে গেলেও কয়েকটি দীর্ঘ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। আমার ছেলেবেলায় যে কয়েকজন শিক্ষক আমাকে আকর্ষণ করতেন, তাঁদের একজন, যিনি নিজে ছিলেন আসাম থেকে আগত, প্রায়শ আমাদের বলতেন, 'এই জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, এ জাতি ভালো জিনিসের মূল্য দিতে পারে না।' আমরা ধরে নিতাম তিনি অসমী হওয়ার জন্য হয়তো বাঙালির সমালোচনা করছেন। কিন্তু তিনি এদেশে বসত গেড়ে মনেপ্রাণে বাঙালি হয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি হয়তো এজন্য যে বাঙালির মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, তারা বিশৃঙ্খলাকে ভালোবাসে। বাঙালিরা কোনোদিন খুব ভালো নেতৃত্ব পায়নি (নেতৃত্ব কথাটি শুধু রাজনৈতিক অর্থে নয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক অর্থেই ধরা উচিত)। যাদের তারা পেয়েছে, তারাও কেউ নির্বাসনে মারা গেছেন (সুভাষ বসু), কেউ নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে (শেখ মুজিবুর রহমান), কেউ এত বড় সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন যে মূল অচলায়তনটি ভাঙা আর সম্ভব হয়নি (বিদ্যাসাগর)। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বার্থপর। আমার অসমী শিক্ষক একটি সিলেটি প্রবাদ বলতেন প্রায়শ: 'যেমন গরু তেমন রাখাল।' সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের কাছে এ প্রবাদটির অর্থ খুব প্রাঞ্জল হওয়ার কথা নয়; কাজেই তিনি সোৎসাহে বর্ণনা

করতেন রাখাল ও গরুর সম্পর্ক। 'আমাদের গ্রামের গরুগুলো হার জিরজিরে, শরীরে তাদের শক্তি নেই। কাজেই রাখালেরা গাছের নিচে ঘুমায়, নয়তো বাঁশি বাজায়। তাদের কাজটা ওই ঘুমিয়েই করে ফেলা যায়। এর বিপরীতে দেখ আমেরিকার রাখালদের– সেই কাউবয়দের। তারা গরুর দেখাশোনা করে ঘোড়ায় চড়ে। আর গরুগুলো কী তাগড়া! রাখালদের একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে সাবাস!' ইত্যাদি আমরা বুঝতাম, আমরা সেই হাড় জিরজিরে গরু। আমাদের নেতারা সেই অলস, বাঁশি বাজানেওয়ালা রাখাল। তখন আবার মিলিটারি লৌহমানব ক্ষমতায়। আমার এক সহপাঠী স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিল, বেশ উৎসাহ নিয়ে, কারণ তার ধারণা হয়েছিল সে স্যারের একটা ভুল ধরে ফেলেছে, 'কেন আইয়ুব খান তো তাগড়া মানুষ। তার গোঁফটাও মস্ত বড়।'

আমাদের শিক্ষক একটু না থেমে, একটু ভয় না পেয়ে (তখন আইয়ুব খান সম্পর্কে এরকম মন্তব্য বড় বড় রাজনীতিবিদরাও করতে সাহস পেতেন না হয়তো) বলেছিলেন, আইয়ুব খান রাখাল নয় দারোয়ান। রাখাল আর দারোয়ান দুই জিনিস।

অনেক পরে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কথার অর্থ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। নিজেদের গরু মনে করায় যে মন :কষ্ট পেয়েছিলাম, তাও লাঘব হয়েছিল। এজন্য দুটো জিনিস সাহায্য করেছিল। এক, সেই শিক্ষকের কিছু উপদেশ। দুই, মিলান কুন্ডেরা।

স্যার আমাদের উপদেশ দিতেন, পড়তে এবং শুধুই পড়তে। তাঁর আদর্শ ছিল বাংলার জাগরণের অগ্রদূতরা। যারা বাঙালি সমাজের একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক জাগরণ চেয়েছিলেন, বুদ্ধির মুক্তি চেয়েছিলেন– যা সকল কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জাতিকে মুক্ত করবে। পিছনদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে হয় সেই শিক্ষক বুঝতে পেরেছিলেন, এ জাতির উন্নতির জন্যে সেই সভ্যতার চর্চা প্রয়োজন, যার রূপটি লিখিত। কারণ শোনা ও দেখার একটা সীমাবদ্ধতা থাকে, তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে একটা সময়ভিত্তিক সম্পর্ক থাকে (স্থায়িত্ব অর্জন দুরূহ হয়ে পড়ে)। কিন্তু লিখিত পৃষ্ঠা সময়কে শাসন

করে, (ইতিহাসকে অর্থাৎ এর খামখেয়ালিপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে)। আমার শিক্ষক চাইতেন, আমরা যেন সম্পূর্ণ মানুষ হই এবং দেশটির রাখালিপনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। খুবই মর্মস্পর্শী ছিল তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু মোট সময়ের বহু আগেই তিনি দেখতে শুরু করেছিলেন! আমাদের তিনি যখন উপদেশ দিতে, তাঁর কণ্ঠস্বরে একটি ঋজু ভাব আসত, একাগ্রতা আসত। যেন এ জাতির মুক্তির একটি ইঙ্গিত তিনি পাচ্ছেন। সেজন্য তাঁর সমালোচনাকে আমরা মাথা পেতে মেনে নিতাম।

স্কুল পেরিয়ে গেলেও সমাজ নিয়ে ভাবনাটা আমরা ভুলতে পারিনি। ষাটের দশকটা ছিল কোন কিছু ভুলে না যাওয়ার দশক। এ দশকে আত্মসমালোচনার চাইতেও আত্মশক্তি অর্জনের প্রয়াসটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তবুও বাঙালি পুরো ষাটের দশকে নিজেকে ব্যাখ্যা করেছে, বিশ্লেষণ করেছে, তার ত্রুটিগুলো শনাক্ত করেছে। এটি বাঙালি করেছে বলেই আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা পথে নেমেছে, ছয় দফার দাবিতে দেশ উত্তাল হয়েছে, ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানিদের সেবাদাসরা, মোনেম খানদের মতো মানুষেরা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, বাঙালিদের কেউ কেউ মুক্ত মানুষের দারিদ্র এবং অনিশ্চয়তার চাইতে একজন গৃহভৃত্যের নিশ্চয়তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে। কিছু বাঙালি নিজের মানুষদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের পিঠে ছুরি মেরেছে। একাত্তরে বাঙালি চরিত্রের দুই পরস্পরবিরোধী দিক সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার পর আমরা আশা করেছিলাম, বাঙালি চরিত্রের যেসব নেতিবাচক, পরিত্যাজ্য এবং অন্ধকার দিক মানুষ দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে– সেগুলো বর্জিত হবে। মানুষ আত্মশুদ্ধির পথে নামবে। কিন্তু তা মোটেও হয়নি। বরং চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ থেকে নিয়ে জিয়াউর রহমান-এরশাদের সামরিক শাসনের সময় মনে হয়েছে, বাঙালির একটি অংশ (কত বড় সেটি গবেষণার বিষয়) সব ভুলে আবার পাকিস্তানি মডেলটি নিয়ে যেন মেতে ওঠেছে। যেন গৃহভৃত্য মুনিবকে হারিয়ে নিজেই বসেছে মুনিবের চেয়ারে এবং মুনিবের অসম্পন্ন কাজগুলো সমাপ্ত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। এ স্মৃতি-বিস্মৃতির বিষয়টি অবশ্য

পরের- তার আগে ঊনসত্তর-সত্তর সালে যখন বাঙালি যুদ্ধ করেছে পাকিস্তানি সামরিক ক্ষমতার সঙ্গে, তখন বাঙালি চরিত্রের একটি দিকের সাথে নতুন করে পরিচয় ঘটেছে আমার এবং অভাবনীয়ভাবে চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরার মাধ্যমে। কুন্ডেরার 'দি জোক' বইটি ঠাট্টা নামে অনুবাদ করেছিলেন আব্দুর রহমান। সম্ভবত: ১৯৬৯-৭০ সালে। সেই প্রথম কুন্ডেরার নামের সঙ্গে পরিচয়। আরও বিস্তারিত জানার জন্য বৃটিশ কাউন্সিলে দু'একটা বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে কুন্ডেরার উদ্ধৃতি চোখে পড়ল। উদ্ধৃতিটি একটি কাগজে তুলে নিয়েছিলাম– এখনো এর অন্তর্গত সত্যের কাছে আমি ফিরে যাই। কুন্ডেরা বলেছিলেন, "ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আসলে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম।' কথাটি নিশ্চয় তিনি পরেও বহুবার ব্যবহার করেছেন, কুন্ডেরার অনেক কথাই অনেকবার তাঁর গল্প-উপন্যাসে আসে। কথাটি নিয়ে ভাবতে বসে আমার মনে হয়েছে, বাঙালির জীবনের এক বড় অংশই ব্যয়িত হয় এ দ্বিবিধ সংগ্রামে। আমাদের চিরন্তন সংগ্রাম ক্ষমতার বিরুদ্ধে। এ ক্ষমতা বরাবরই আমাদের নিষ্পেষণ করে। এ ক্ষমতা পরিবারে পিতার হাতে থাকে পুঞ্জীভূত (যে ক্ষমতার কাছে মাতাও অনেক ক্ষেত্রে অসহায়); এ ক্ষমতা সমাজে বা সম্প্রদায়ে অশিক্ষিত মোড়ল/ চেয়ারম্যানদের হাতে, গডফাদারদের হাতে, টাউট মাস্তানদের হাতে, প্রশাসনে ক্ষমতালোভী আমলাদের হাতে, রাষ্ট্রে ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের হাতে। ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাবানরা এ ক্ষমতাকে সবসময়ই ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। যেখানে গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাতেও ক্ষমতা ব্যক্তির জন্য বিপদ নিয়ে আসে নানাভাবে, সেখানে স্বৈরশাসক কত ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সেটি সহজেই বোঝা যায়।

ক্ষমতার সঙ্গে এ যে নিরন্তর সংগ্রাম, এ সংগ্রামে ভুলে যাওয়াটাইতো নিয়ম। ব্যক্তি ভুলে যাবে তার শ্রেণি, তার অবস্থান, এমনকি তার নাম। জর্জ অরওয়েল যেমন দেখিয়েছেন তাঁর 'নাইনটিন এইটি ফোর' গ্রন্থে, যে-পর্যন্ত ব্যক্তির একটি নিজস্ব পরিচিতি থাকে, সে পর্যন্ত এস্টাব্লিশমেন্ট নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। স্বৈরশাসন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিতে চায়। রাষ্ট্রের ক্ষমতার কাছে তার সব

নিজস্ব ক্ষমতা– এমনকি তার দীর্ঘ চুল রাখার অথবা মধ্যরাতে রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতা সমর্পণ করে দিতে হয়। ব্যক্তিকে ভুলতে হয় তার ব্যক্তিগত ইতিহাস, তার সমষ্টিগত ইতিহাস। আমাদের দেশে স্বৈরশাসকরা ইতিহাসকে নিজেদের প্রয়োজনে নতুনভাবে লেখান এবং এ নতুন ইতিহাসে তাঁরাই হন নায়ক।

বাংলাদেশে গত একুশ-বাইশ বছরে, এমনকি গণতন্ত্রের পাঁচ বছরে (১৯৯১-১৯৯৬) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছিল সামরিক লৌহমানবদের ইচ্ছানুগ ইতিহাস। বিস্মৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে জাতি ক্লান্ত হয়, তার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়।

কুন্ডেরার কথাটি আমাকে এতটা শক্তি নিয়ে আঘাত করেছিল, কারণ ঊনসত্তর-সত্তরের সময়টাকে আমার মনে হতো বাঙালি জাতির একটা নতুন জাগরণের সময়। এবং এ জাগরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার মনে হত, যেন জাতিটা নিজের অস্তিত্বের মর্মমূলে একটা শক্তির স্থান পেয়েছে, যা তাকে প্রণোদনা দিয়েছে। বস্তুতঃ এক নিষ্ঠুর এবং পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি নিজের বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনরাবিষ্কার করেছিল সে সময়, সেই ইতিহাসের অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা ও পাঠকে আবার স্মৃতির ভাণ্ডারে সযত্নে সাজিয়েছিল। এবং এ পুনরাবিষ্কারের প্রকাণ্ডতা আমাকে এ বিশ্বাস দিয়েছিল যে, বাঙালি সমাজের যেসব পরিত্যাজ্য, অন্ধকার দিক রয়েছে, সেগুলো অবশেষে আমরা ত্যাগ করতে পারব। সাপ যেমন তার খোলস ফেলে উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসে– আমরাও পারব সেরকম।

আমার শিক্ষক যে দারোয়ানের কথা বলেছিলেন, সে তখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, তাঁর বর্ণিত রাখাল এক উজ্জীবিত জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন-সময়টা ছিল অনুপ্রাণিত এবং আশান্বিত হওয়ার। কিন্তু কয়েকটি বছরের ব্যবধানে বাঙালি সমাজ আবার সেই দারোয়ানি সংস্কৃতিতে ফিরে গেল। রাখালরা নির্জীব থেকে নির্জীবতর হয়ে পড়ল। কাজেই আত্মসমালোচনাও শুরু হলো আগের মতোই। এখনো তার কমতি হয়নি। যেকোনো ঘটনা বড়

অথবা ছোট হোক, গুরুত্বপূর্ণ অথবা অগুরুত্বপূর্ণ হোক, সেখানে একজন বা দশজন মানুষ জড়িত হোক, শেষ পর্যন্ত জাতির বিচারের দিকে ধাবিত হয়। ঢাকার শেয়ার বাজার যখন চাঙ্গা হলো, অস্বাভাবিক হয়ে উঠল তার আচরণ, তখন সবাই বলল, বাঙালি হুজুগে জাতি, বিচার-বিবেচনা করে কাজ করে না। এ সমালোচনায় নিষ্ঠুরতা ছিল, কিন্তু হুজুগটা কেন, কি জন্য হুজুগে মাতে এ সমাজ, তার কোন ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু এ ঘটনাতে শুধু হুজুগ ছিল না– বহু কর্মহীন, আত্মমর্যাদাহীন বেকার যুবক নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার শেষ লড়াই হিসেবে শেয়ার যুদ্ধে সেদিন অবতীর্ণ হয়েছিল; অনেক গরিব হতে সারা পরিবার একটা অবলম্বন খুঁজতে চেয়েছে শেয়ারের মধ্যে। ভেবেচিন্তেই পয়সা খাটিয়েছে অনেকে। কিন্তু আড়ালে বসে যারা কলকাঠি নাড়ে, তারা তাদের কাজ করে গেছে। বাজারে ধস নেমেছে। সরকারের মন্ত্রীরাও বলেছেন, এ হচ্ছে হুজুগের পরিণাম। ক্রিকেটে জিতল বাংলাদেশের দল, আর সারাদেশ হুজুগে মাতল। কিন্তু একি শুধু হুজুগ? একি এ জাতির গর্বিত হওয়ার, অহংকারী হওয়ার যে প্রত্যাশা ও অধিকার, তার একটি বহিঃপ্রকাশ নয়? পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি হল। কিন্তু কিছু মানুষ সেই চুক্তি নিয়ে এমনভাবে মাঠে নামল যেন পুরো পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে তারা প্রতিপক্ষ বানিয়ে ছাড়বে। একি শুধুই বিদ্বেষ, শুধুই রাজনৈতিক কূটচাল? নাকি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার পুরোনো মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ যেখানে বাঙালি নিজেদের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সবকিছু সন্দেহ করছে এবং নিজের ক্ষতি করে হলেও পরের উন্নতি প্রতিহত করছে। কারণ নিয়ন্ত্রণহীন মানুষ ভালোমন্দের বিচার ছেড়ে দিয়েছে অন্যের ওপর। বাঙালি সমাজের অস্থিরতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংঘাত, হীনমন্যতা, নিষ্ঠুরতা-এর সবকিছুই একটা জটিল আন্তঃসম্পর্কে স্থাপিত। খুব সাদাকালো বিভাজনে এদের ফেলা যাবে না, মোটা রেখায় এদের আলাদা করা যাবে না। এগুলোর উৎপত্তি আমাদের সংঘাতমুখর ইতিহাসে, যে ইতিহাসে ক্ষমতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটমান বিষয়।

বস্তুতঃ ক্ষমতাকে যতভাবেই আমরা ব্যাখ্যা করব, একটি অভিন্ন বিষয় এর সকল ব্যাখ্যাতেই দেখা যাবে এবং তা হলো ব্যক্তি ও

সমাজকে এ ক্ষমতা নানাভাবে অপদস্থ এবং প্রতিহত করেছে। মানুষকে ভুলতে হয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু মানুষ অনেক কিছু ভুলতে চাইলেও তার গৌরবের বিষয়গুলো ভুলতে চায় না। সেখানেই প্রতিরোধটা বেশি গড়ে ওঠে। যে বিষয়গুলো পরবর্তী কর্মকাণ্ডের মান নির্ণায়কের ভূমিকায় চলে আসে। কাজেই মানুষ সমালোচনা মুখর হয়, কারণ মান থেকে নিচে নেমে যাওয়া অথবা মানের কাছাকাছি আসতে না পারার জন্য ক্ষোভ জাগে। ক্ষোভ থেকে সমালোচনা, নিন্দা।

বাঙালি সমাজের নিরন্তর আত্মসমালোচনা শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক কোন ব্যাপার নয়। এটি ইতিবাচকই বটে। যে সমাজ নিজের সমালোচনা করে সরল এবং অকপটভাবে, সে সমাজের মানগুলো যে উঁচু, সেটিও বুঝতে হবে। সেই মান যদি অর্জন না করা হয়, তার একটিও যদি অর্জন করা না হয়, তাহলেও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। একদিন যে মান অর্জিত হবে, সেই ইঙ্গিতই আসলে তা দেয়।

বাঙালি সমাজ অত্যন্ত গতিশীল, এর কাঠামোটি স্থিতিস্থাপকের ভিতরের প্রাণটি সতেজ। আমাদের আশপাশে তাকালেই বুঝতে পারব এ গতিশীলতার চরিত্র। বাঙালি তরুণরা মাত্র কুড়ি বছরে একটি অভিবাসী জনসংখ্যা সৃষ্টি করেছে সারাবিশ্বে। বাঙালি তরুণ বলিভিয়ায় চাষাবাদ করছে, বাঙালি তরুণী ভিয়েনায় ফুল বিক্রি করছে। মাত্র পনেরো বছরে বাঙালি নারী ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দলে দলে জীবিকার সন্ধানে অসংখ্য পেশা গ্রহণ করছে। বেরিয়ে আসার পনেরো বছরের মাথায় পনেরো লক্ষ মেয়ে একমাত্র পোশাক শিল্পেই চাকরি করছে। এ দুই ঘটনাই গতিশীলতার একটি চিত্র তুলে ধরতে যথেষ্ট। যেহেতু পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া, অনেক সমস্যাও এতে সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সমালোচনামুখর এ সমাজ তার মানগুলোর দিকে যত ধাবিত হবে, সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে।

বাঙালির আত্মসমালোচনার মুখে ছিপি এঁটে কেউ সভ্য-ভব্য হতে গেলে সেই সভ্যতা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং মেকি, যে সমালোচনা

নিজেকে নিয়ে শুরু হয় তা অন্যের সমর্থন পাওয়ার আগেই প্রশংসায় পরিণত হতে পারে। আমাদের সমাজের ত্রুটিগুলোও হয়তো একদিন শুধরে যাবে এবং সেদিন এ ত্রুটি কেন নেই সে বিষয় নিয়েই অনুসন্ধানী আলোচনা অথবা সমালোচনা হয়তো শুরু হয়ে যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

বাঙালি

১.

এ লেখাটি 'বাঙালি' জাতির নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত নয়, বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্পর্কেও এ লেখাটি মৌনতা অবলম্বন করবে। বাঙালির ভূগোলও থাকবে এ লেখার ধর্তব্যের বাইরে।

কাজেই আদিতে "অস্ট্রিক মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠী থেকে বাঙালির উদ্ভব; অথবা তামাটে বাঙালি জাতি দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল (অথবা এখনো আছে)– এ ধরনের জ্ঞান-প্রদায়ী বক্তব্য এ লেখায় পাওয়া যাবে না। যারা নৃতত্ত্ব এবং জাতি-ইতিহাসের ছাত্র, তারা শিরোনাম দেখে এবং এ পর্যন্ত পড়ে হতাশ হবেন। তবে তাদের জন্য সুখবর রয়েছে– নীহার রঞ্জন রায়সহ অসংখ্য পণ্ডিত এক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ইত্যাদি লিখেছেন। আজকাল ইন্টারনেটে একটু ঘুরে বেড়ালেও এনথ্রোপলোজিক্যাল এবং এথনোগ্রাফিক অনেক গবেষণা ও লেখালেখির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটবে।

২.

আমি যে আর্কাইভ ঘেঁটে এ লেখাটি তৈরি করেছি, সেটি প্রধানত সাংস্কৃতিক এবং এরপর জীবনাচরণ সম্পর্কিত। বাকিটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। আমার মতো পাঁচ দশকের বেশি যারা এ বাংলাদেশের জল হাওয়ায় বৃদ্ধি পেয়ে আসছেন, এবং এখন এ একই জল হাওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হবার পথে রয়েছেন, তাদের অনেকেই এ আর্কাইভের সঙ্গে

পরিচিত। তাদের অভিজ্ঞতাও আমার অভিজ্ঞতার মতোই– অথবা কাছাকাছি- এরকম একটি ধারণা আমার রয়েছে। এ সাক্ষী মানার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার অভিজ্ঞতার একটি সামান্যিকরণ করা যাতে বাঙালি সম্পর্কে আমার বক্তব্যগুলো যে একদেশদর্শি নয়– তা প্রমাণিত করা।

৩.

বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবি বাঙালিকে, কখনো কখনো অন্তত, খুব ভালো চোখে দেখতেন না। বাঙালিকে তিনি 'ভদ্র, শান্ত এবং পোষ মানা প্রাণের প্রাণি হিসেবে একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন। যে প্রাণি বোতাম আঁটা জামা পরে তক্তপোষে বসে দিনাতিপাত করতে পছন্দ করে। তুলনায় কবি হতে চেয়েছেন আরব বেদুঈন- ছুটন্ত ঘোড়ায় সমাসীন, যার পায়ের নিচে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন। বাঙালি ঘরকুনো, পোষ-মানা এবং ভীরু। অনিশ্চিতকে সে ভয় পায়। বাঙালি নিয়ে এ দুঃখবোধ এক সময় একটি ভয়ানক চিন্তার কাছে কবিকে নিয়ে যায়। দেশ জননীর কাছে তিনি অভিযোগ করেন এক সময়, যে এ এতগুলো বাঙালিকে তিনি বাঙালি করে রেখেছেন, মানুষ করেননি।

বাঙালি যদি মানুষ না হয়, তাহলে তারা কি? অমানুষ? যুক্তি তো তাই বলে।

৪.

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে অবাক হয়ে দেখতেন, তক্তপোষ ছেড়ে বাঙালি রাস্তায় নেমেছে এবং ঘোড়া না হোক অন্য কোনো বাহনে (প্রধানত বাংলাদেশ বিমান এবং মধ্যপ্রাচ্যীয় কয়েকটি বিমানসংস্থার আকাশযানে) আরবে গেছে। তারা মরুভূমিতে সবুজ ফসল ফলাতে গিয়ে মারাও পড়েছে। তাদের ৫/৬ বছরের সন্তানেরা উটের জকি হয়ে ছুটেছে বালিময় প্রান্তর। তাদের পায়ের নিচে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন হয়েছে এবং তাদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং মানুষ হিসেবে তাদের পরিচিতিগুলোও একসঙ্গে বিলীন হয়েছে। তবে বাঙালিরা আরবের নানা দেশে পৌর সংস্থাগুলোর বোতাম আঁটা জামা পরে

রাস্তাঘাট সাফসুতরো করে। আরব দেশগুলোতে তারা মিসকিন নামে পরিচিত। এ ডাকটি শুনতে খুব মিষ্টি, মিস-কিন। বাহ! কিন্তু এ নামের পিছনে একটা দুর্গন্ধ আছে। সেই দুর্গন্ধের নাম দারিদ্র্য।

কেন বাঙালিরা দারিদ্র্য? কারণ বাঙালি অমানুষ হয়েছে এবং অমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার কঠিন পথটাতে কোনোদিন যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৫.

বাঙালিদের মনুষ্যত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ সত্ত্বেও, একটা সময় পর্যন্ত জাগ্রত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয় বাংলাদেশে, সেই দুর্ভিক্ষ-কাল থেকেই এ মনুষ্যত্বে ভাটা পড়তে শুরু করে। তারপর ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঙালিকে নিঃস্ব করে দেয়। তারপরও বাঙালি জাতির নানা বিপদের সময় মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে বাঙালি প্রকৃত মানুষ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যখন উত্তর বঙ্গ থেকে খাদ্য ও চিকিৎসার আশায় পীড়িত মানুষরা ঢাকায় আসা শুরু করে তখনই বোঝা গিয়েছিল বাঙালি আর মানুষ নেই। একাত্তরে যে নাগরিক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে গরিব কৃষকের ঘরে, সেই নাগরিক চুয়াত্তর সালে আশ্রয়-প্রার্থী সেই কৃষকের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ঢাকার রাস্তায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে থাকা সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষগুলোকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, বাঙালি মানুষ থেকে আবার অমানুষ হয়েছে। অমানুষের সংখ্যা অতঃপর বেড়েছে। আজকে এ সংখ্যা ভয়াবহ।

– বাঙালি এখন দুর্নীতিতে বিশ্বে এক নম্বর।
– বাঙালি এখন মেয়েদের মুখে এসিড ছুঁড়ে মারায় সারাবিশ্বে এক নম্বর।
– বাঙালি এখন নারীনির্যাতনে বিশ্বের সম্মুখ সারির একটি দেশ।
– বাঙালি এখন অন্য বাঙালিকে জলন্ত ইটের ভাটায় ছুঁড়ে মারে।

মানুষ মেরে লাশ টুকরো করে। যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। উপাসনালয়ে বোমা মারে। মাজারের পুকুরে বিষ ঢেলে

মাছ এবং কচ্ছপ নিধন করে। আমার বিশ্বাস ছোট ছোট কাজের মেয়েদের পেটানো এবং নির্দয়ভাবে নির্যাতন করার ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বে এক নম্বর। এই কাজ করেন, 'শিক্ষিত' গৃহকর্ত্রী এবং মোটা তাজা শরীরের কর্তা।

আমার আরও বিশ্বাস বাঙালির মতো ভৃত্য মানসিকতার জাতি এ জগতে কমই আছে। একাত্তরে যে দেশটি আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করল, ধর্ষণ করল হাজার হাজার নারীকে, সেই দেশের পতাকা আমাদের তরুণ-তরুণীরা গালে এঁকে ক্রিকেট খেলার মাঠে যায়। পাকিস্তান জিতলে মিষ্টি বিতরণ করে পাড়ায়। 'পাকিস্তান' নাম শুনলেই কত মানুষের বুকে আবেগের ঝড় উঠে যায়। অথচ বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন পাকিস্তানে খেলতে গেল, মুলতান বা করাচি স্টেডিয়ামে একজন পাকিস্তানি সমর্থককেও দেখলাম না বাংলাদেশের পতাকা দোলাচ্ছে। আমাদের ক্রিকেট দলের ম্যানেজার সে দেশে গিয়ে নিজের ভাষা ভুলে যান। প্রভুর ভাষা ব্যবহার করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

ভৃত্য পরিচয়ে বাঙালি স্বস্তি বোধ করে। যারা ক্ষমতাবান– মন্ত্রী, সাংসদ, লৌহমানব– তাদের পিছনে স্তাবকরা লাইন দিয়ে দাঁড়ান। তাদের কৃপাদৃষ্টি পড়লে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

ফরাসিদের সম্পর্কে বলা হয়, পাঁচ ফরাসিকে এক কামরায় পাঁচ দিন রাখলে ছ'দিনের দিন তারা ছ'টি রাজনৈতিক দল তৈরি করে বেরিয়ে আসবে। আর বাঙালিদের ক্ষেত্রে বলা যায়, পাঁচজনকে এক ঘরে রাখলে ছ'দিন পর নিদেনপক্ষে এগারোটা দল নিয়ে বেরুবে। ওই ফরাসিদের মতো পাঁচজনের একটি করে এবং সকলে মিলে একটা। তারপর ১ নম্বর ব্যক্তি ২ নম্বরের সঙ্গে আরেকটি দল, ৩ নম্বরের সাথে আরেকটি ৪ নম্বরের সাথে আরও একটি। আর ২ নম্বর ব্যক্তি ৩ নম্বরের সঙ্গে একটি, ৪ নম্বরের সঙ্গে আরেকটি.......। অর্থাৎ বাঙালি দলবাজি পছন্দ করে। বাঙালি কলহপ্রিয় জাতি, 'পায়ে পা বেঁধে ঝগড়া করা'– এ রকম বাগধারা অন্য কোনো ভাষায় আছে কিনা জানিনা। এ ঝগড়ার মনোবৃত্তি থেকে সবখানেই একটা

গোলমাল বাঁধাতে ওস্তাদ বাঙালি, রাজনীতি তাই এখন ঝগড়ানীতি। দলগুলোর নেতানেত্রীদের দিকে তাকান। আরও তাকান ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর দিকে। সব পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রধান উপাদান কলহ। অসহিষ্ণুতা আর বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

বাংলাদেশে এ রাজনীতিকে বলা হয় পলিটিক্স। পলিটিক্স একটি নঞর্থক শব্দ। পলিটিক্স মানে ষড়যন্ত্র, বাঙালি ষড়যন্ত্রে নিতান্ত পারঙ্গম, তা জাতীয় থেকে নিয়ে উপ-জাতীয় সকল পর্যায়ের রাজনীতিতেই সুস্পষ্ট।

৭.

বাঙালির আরও অসংখ্য সমস্যা আছে। সেগুলোর তালিকা করলে একটা বই হয়ে যায়। আমাকে একটি ছোট নিবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে, বই নয়। তাই ওই দীর্ঘ তালিকা থেকে ৪/৫টি বড় সমস্যার কথা লেখা হলো। অবশ্য এ সঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় বাঙালির যে চরিত্রগুণের কথা, তা হলো ক্রমাগত আত্মসমালোচনা। বাঙালির মতো নিজেকে নিয়ে এত বেশি সমালোচনা আর কাউকে করতে আমি দেখিনি। এ লেখাটাও তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আর বাঙালি একজন যখন আরেকজনকে কিছু বলতে যায়– ধরুন সমালোচনা অথবা উপদেশ– তখন সে ধোঁয়া তুলসি পাতা হয়ে যায়। তুমি-থেকে- বেশি-পবিত্র। তখন নিজেকে সে বিরাট কিছু ভাবে। বাঙালি ভাবে না তার তখন বাঙালির চরিত্রগুণ– অথবা দোষ– তাকে স্পর্শ করে না। এ লেখাটি সেই চরিত্রগুণেও গুণান্বিত, অথবা চরিত্রদোষে দুষ্ট।

কি আর করি, বাঙালি তো!

৮.

তাই বলে বাঙালির মধ্যে মনুষ্যত্ত্বের কোনো উপাদান কি আর কিছু নেই। আছে। প্রচুর আছে। কিন্তু সেগুলো যে প্রকাশিত হবে, তার পথ রূদ্ধ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর চিন্তা ও সৃষ্টির জগৎ

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পরিচয় অনেক– তিনি একজন শিক্ষক, একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, একজন মননশীল লেখক, তিনি সৃষ্টিশীল লেখালেখিও করেছেন, গল্প লিখেছেন, নাটক অনুবাদ করেছন। তাঁর লেখালেখি ওই মননশীল-সৃজনশীল বিভাজনটিকে গৌণ করে ফেলে; যেহেতু তাঁর প্রবন্ধ, অথবা সাহিত্য ব্যাখ্যা অথবা সমাজচিন্তা বিকশিত হয় সৃষ্টিশীলতার সূত্রগুলো ধরে। তিনি একসময় খবরের কাগজে কলাম লিখতেন গাছপাথর কলম-নামের আড়ালে। সেই কলামগুলোকে আমার কখনো মনে হতো সমকালীন রাজনীতির ব্যাখ্যা, কখনো মনে হতো অর্থনীতি অথবা সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন, কখনো কখনো আত্মজৈবনিক কোন বয়ান। তিনি শ্রেণিকক্ষে যখন পড়ান, তাঁর বিষয় শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ থাকে না– সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব অথবা সাহিত্যের রাজনীতিতে তা পরিব্যাপ্ত হয়। পশ্চিমা এবং পরবর্তীতে আমাদের ভূখণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ব্যাপকভাবে সাহিত্যতত্ত্বের পঠনপাঠন শুরু হয়, তার প্রভাবে সেই জেফ্রি চসার থেকে নিয়ে গার্সিয়া মার্কেজ পর্যন্ত কবি সাহিত্যিকদের লেখার নতুন মূল্যায়ন হয়েছে। মার্ক্সবাদী তত্ত্বের আলোকে পড়া হয়েছে চার্লস ডিকেন্স বা জেন অস্টেনকে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলো ফেলা হয়েছে ডিএইচ লরেন্স অথবা টিএস এলিয়টের ওপর। এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবিদ্যার চিন্তা ও সূত্রগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে জোসেফ কনরাড অথবা ই. এম ফস্টারের ক্ষেত্রে। সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ অনেকটাই

বদলে দিয়েছে প্রথাগত সমালোচনা সাহিত্যকে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তাঁর নিজস্ব জ্ঞানচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তাঁর ক্লাসে, এডওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম (১৯৭৮) গ্রন্থটির অনেক আগে, প্রাচ্যবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ফ্রয়েডীয় চিন্তা তাঁকে উৎসাহিত করত; সেই উৎসাহে চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির বিশ্লেষণে অথবা কোন ঔপন্যাসিক/কবির ব্যাখ্যাদানে ফ্রয়েডের সূত্রগুলো আমরা ব্যবহার করতে শিখেছি। মার্ক্সবাদে অধ্যাপক চৌধুরীর দীক্ষা ছাত্র জীবনের শুরুতেই; এ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জীবন দর্শনের প্রতি তাঁর বিশ্বাসটি এখনো অটুট। তাঁকে আমি মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে উল্লেখ করি শুধু তাঁর ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের নিজস্বতার জন্য নয়, বরং পুব-পশ্চিম মিলিয়ে সামগ্রিক বৈশ্বিক চিন্তার জগৎটাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেও তিনি নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতীয়তা-চিন্তা, শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবনাচরণকে পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যেভাবে এসব সম্বন্ধে নতুন পাঠ উপহার দেন, সেজন্য। একজন চিন্তাবিদ তখনই মৌলিক যখন তিনি প্রচলিত জ্ঞানের কাঠামোটিকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন। অধ্যাপক চৌধুরী পশ্চিমা জ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন। তিনি জ্ঞানের পিছনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশ্ন করেছেন। পশ্চিমা একাডেমি যে জ্ঞান উৎপাদন করে, বিতরণ করে পূর্বে, তার সবটাই কি নির্মোহ, অথবা স্থান-কাল নিরপেক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে কি আধিপত্যবাদ অনুপস্থিত? অথবা জ্ঞানের রাজ্যে সহিংসতা? যে epistemological violence-এর কথা সাঈদ অথবা গায়ত্রী স্পিভাক বলেন, তা কি বায়বীয় কোনো বর্ণনা? অবশ্যই নয়। অধ্যাপক চৌধুরী জ্ঞানের রাজ্যে স্ববিরোধী এসব সূত্রগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। আধিপত্যবাদ নিয়ে তাঁর অসংখ্য লেখালেখিতে জ্ঞানতাত্ত্বিক আদর্শবাদ ও তার ক্ষতিকর দিকগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বায়নের ঢেউ এখন আছড়ে পড়ছে আমাদের তীরে। জলোচ্ছ্বাস হয়ে সেই ঢেউ ডুবিয়ে দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অর্থনীতির নানা স্থাপনা। বিশ্বায়ন শব্দটি সচল মুদ্রা হওয়ার অনেক আগেই এ দিকটি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

পশ্চিমা সংস্কৃতির কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কতটা গ্রহণীয়, কতটা বর্জনীয়– এ ধরনের পরিমাণসূচক আলোচনা তিনি কখনো করেননি, কেননা তিনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্রে, তার পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি সংস্কৃতির শক্তি ও শক্তিহীনতার বিষয়টি কীভাবে দেখেন। তাঁর উদ্বিগ্নতা বাড়ে যখন পড়ার সংস্কৃতি হারিয়ে যায়, দেখার সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। পড়া ও দেখার মধ্যে এ যে দ্বন্দ্ব, তাকে তিনি বিচার করেন একটি সামগ্রিক সংস্কৃতি চিন্তার প্রেক্ষিতে।

ব্যক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক চৌধুরীর যে-বিশ্বায়নের কথা উল্লেখ করা হল তার সঙ্গে যোগ করতে হয় সমষ্টির কথাও। বস্তুত যদি তাঁর ব্যক্তি ও সমাজচিন্তার একটি সারাংশ করতে হয়, তাহলে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একই বন্ধনীতে রাখতে হবে। তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ব্যক্তিচিন্তাকে যতখানি মূল্যবান মনে করেন, বাঙালি রেনেসাঁসের সমাজচিন্তাকেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহন রায় অথবা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর লেখালেখিতে সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে আসে। সমষ্টির মঙ্গলচিন্তার কথাটি অবধারিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমা বিশ্বে ব্যক্তির বেড়ে ওঠা আর আমদের ভূখণ্ডে ব্যক্তির বেড়ে ওঠার মধ্যে তফাৎ আছে। এ তফাৎটুকু সমষ্টির গুরুত্বের নির্ণায়ক। অধ্যাপক চৌধুরী ব্যক্তির উত্থান চান, বরাবরই চেয়ে এসেছেন, কিন্তু ব্যক্তি যেন সমষ্টিকে ছাড়িয়ে না যায়, তার উত্থান যেন স্বার্থপর কোন আকাশ-যাত্রা না হয়, সেদিকে তিনি ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে অধ্যপক চৌধুরী অনেক লিখেছেন, শেক্সপিয়রের নারীদের নিয়ে লিখেছেন। শেক্সপিয়রের নারীদের মধ্যে তিনি রেনেসাঁসের ব্যক্তি-জিজ্ঞাসা আরোপ হয়ে ওঠার সূত্রগুলোর সন্ধান করেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী (অথবা পুরুষ) চরিত্রে এসবের বাইরেও সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়গুলোর সংবেদী ব্যাখ্যা করেন। এ সমাজ-মনস্ককতা শুধু তাঁর মার্ক্সবাদী বীক্ষণের বহিঃপ্রকাশ নয়, এর শিকড়টি অনেক গভীরে প্রোথিত। বাংলাদেশের শ্রেণি-বিভাজিত সমাজে নিম্নবর্গীয়দের বঞ্চনা ও শোষণের সঙ্গে এর সম্পর্ক, তাদের অধিকারহীনতা ও

সামাজিক কাঠামোও তাদের প্রান্তবর্তিত– এ পুরো ইতিহাসটিই তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। ওই অনুসন্ধানে ধর্ম, সংস্কৃতি, সংস্কার, কুসংস্কার– এগুলোর স্বরূপও চিহ্নিত হয়।

সমাজ ও মানুষ নিয়ে অথবা সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে যখন ভাবেন অধ্যাপক চৌধুরী, তখন তাঁর কিছু চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর মার্ক্সবাদী ও সমাজবাদী বিশ্বাসের কথা আগেও উল্লেখ করেছি। এর সঙ্গে আগে যুক্ত হয় তাঁর সামগ্রিক বা holistic দৃষ্টিভঙ্গি। অধ্যাপক চৌধুরী কোন সমাজ বা সাহিত্য ভাবনাকে খণ্ডিতভাবে দেখতে নারাজ। তিনি এর বিস্তৃত প্রেক্ষাপট খোঁজেন, যে প্রেক্ষাপটে সমাজ নির্মাণের উপকরণসমূহ ছাড়াও মানুষের চিন্তার ইতিহাসটি সম্পর্কিত। পুঁজিবাদের যে বিকাশ সমাজকে বিভাজিত করছে এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক ধস নামিয়েছে, তাকে তিনি শুধু পশ্চিম থেকে আসা একটি অপশক্তি হিসেবে দেখেন না; আমাদের সামন্তবাদী সমাজে আমাদের ভূমিতেই যে বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণের ক্ষেত্রটি বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে, তাকেও চিহ্নিত করেন। পুঁজি যদি শুধুই পশ্চিমা একটি উদ্ভাবন এবং আধিপত্য ও শোষণের হাতিয়ার হয়, তাহলে আমাদের দেশে এত দ্রুত এর সমর্থক-পূজারি-প্রচারক কিভাবে তৈরি হয়? পুঁজি যে শুধু একটি অর্থনৈতিক শক্তি অপশক্তি নয়, একটি প্রবণতারও নাম, সে বিষয়ে অধ্যাপক চৌধুরী আমাদের সজাগ করেন।

তাঁর সমাজচিন্তায় সামগ্রিকতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। এবং গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এতে অনেক ঘটনা এবং মতবাদের কার্যকারণ সূত্রটি আমরা শনাক্ত করতে পারি। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো পরিষ্কার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র ছিল সংবিধানের একটি মূল সূত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল অন্য একটি মৌল চিন্তা। এ দুটি বিষয় নিয়ে মানুষের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার শেষ ছিল না। আমাদের খণ্ডিত ধারণায় এভাবে বিষয়টি ধরা পড়েছিল; যে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক চেতনা এখন শক্তিশালীভাবে ক্রিয়াশীল হবে; এবং ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক চিন্তার দিন চিরতরে গত হবে। মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে নতুন এক স্বাধীন দেশে

দাঁড়িয়ে এমনটি ভাবা আমাদের জন্য হয়তো খুবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরী সেই ইউফোরিয়ার দিনগুলোতেই আমাদের জানিয়েছেন, সমাজের মৌল কাঠামোগুলো না বদলালে, ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত না হলে, ব্যক্তি ও সমাজ যে বিপ্লবী চিন্তাকে গ্রহণ করবে, তার স্থায়িত্ব হবে স্বল্পদিনের। শাসকদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হল না, তাদের শ্রেণিগত অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হল না, রাষ্ট্রের কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হল না– তাহলে সর্বত্র এত বড় বৈপ্লবিক সব পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অধ্যপক চৌধুরী দেখেছেন, সমাজতন্ত্রের নতুন প্রবক্তরা কীভাবে শুধু কিছু আদর্শিক কাঠামো তুলে পুরো বিষয়টিকে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছেন। সমাজের মৌলিক পরিবর্তনে আজীবন প্রত্যয়ী অধ্যাপক চৌধুরী। তিনি আশা করেন, তিনি বিশ্বাস করেন সমাজ বদলাবে। সমাজ কখনো স্থবির নয়। সমাজের ভেতরে অসংখ্য দ্বন্দ্ব থাকে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে। এসবের প্রভাবে সমাজ গতিশীল হয়। সমাজের ভেতরে অনেক প্রতিক্রিয়াশীলদেরও বসবাস– অনেক অন্ধতা, অনেক বিমূঢ়তার উপস্থিতি সমাজে। কিন্তু এরপরও সমাজে অগ্রসর চিন্তার প্রভাবটা টিকে থাকে- সমাজ এগোয়। কিন্তু এর জন্য সমাজের দেহে শক্তির জোগান দিতে হয় এবং সেই শক্তি আসে শিক্ষা থেকে, সংস্কৃতি ভাবনা ও সংস্কৃতিচর্চা থেকে। ব্যক্তির, বিশেষত নারীর অবস্থার উন্নয়ন থেকে। যে সামগ্রিক দৃষ্টির কথা একটু আগে বলা হয়েছে, সেই সামগ্রিকতার সূত্রে এগুলো সবই গ্রন্থিত– শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন এবং ব্যক্তির উন্মোচন। তিনি শিক্ষাকে কখনো জীবনযাপনের একটি উপায় সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেননি। আজ শিক্ষাকে যে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, এবং অনেক উচ্চমূল্যে– সাধারণ মানুষজনের ক্রয়ক্ষমতার অনেক বাইরে যে শিক্ষা বিকোচ্ছে, তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি আমাদের অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। এ উচ্চমূল্যের শিক্ষা মানুষকে স্বার্থপর করে দেয়, সমষ্টি থেকে তাকে আলাদা করে দেয়। আরও ভয়ানক যা, ব্যক্তি সেই শিক্ষার প্রভাবে সৃষ্টিকে ব্যবহার ও শোষণ করতে শেখে। অধ্যাপক চৌধুরী যে শিক্ষার কথা বলেন, তা সহজিয়া কোনো বিষয় নয়, সেটি চর্চা ও অর্জনের বিষয়– সেটি

শ্রেণিকক্ষে আহরণ করা যায়, অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে, কিন্তু সেই আহরণের পদ্ধতিটি হবে বৈজ্ঞানিক এবং সেই শিক্ষার ভিত্তি হবে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর শিক্ষাভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত তার ভাষা-চিন্তা, যে ভাষা হবে শিক্ষার বাহন। তিনি বিশ্বাস করেন, মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। কেননা, তার ভাষার, মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ইতিহাসটি এবং এ দুয়ের প্রাসঙ্গিকতা শুধু মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে তিনি প্রাধান্য দেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও তিনি মাতৃভাষার বিষয়টিকে সবার ওপরে তুলে ধরেন– কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষা শিখবে, কিন্তু তার চিন্তা ও চিন্তা প্রকাশের জন্য মাতৃভাষাকেই বেছে নেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভাষার ক্ষেত্রে একটি অরাজকতা আমরা দেখেছি। ইংরেজিকে বর্জন করা হলো, আবার গ্রহণ করা হলো। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হলেও এর শিক্ষণ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো না, ইংরেজিকে নানাভাবে পুনর্বাসিত করা হলো। অথচ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রাবল্যে সত্ত্বেও দৈন্য রয়ে গেল। অধ্যাপক চৌধুরী মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের গ্লানিকে আমাদের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করেন। একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য একটি যথাযোগ্য পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি অনেকবার বলেছেন। অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর চিন্তা চেতনার একটা স্থানে ক্লাসিসিস্ট, অর্থাৎ ধ্রুপদীপন্থি। সেটি তাঁর সাহিত্য রুচিতে- যদিও নতুন সাহিত্য এবং বিশ্বজুড়ে নিরীক্ষাধর্মী। সাহিত্যের প্রকাশকে তিনি স্বাগত জানান, তাঁর পড়াশোনার পরিধিতেও এসব সাহিত্য স্থান পায়। ধ্রুপদী চিন্তাটি তাঁর দুটি ক্ষেত্রে সক্রিয়–একটি ঐতিহ্য নির্ণয়ে এবং অন্যটি জীবনদর্শনে। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য যে ঐতিহ্য উপহার দিয়েছে আমাদের তাকে তিনি মূল্য দেন। এর অন্তর্গত জীবনদর্শনের যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, তাকেও তিনি উচ্চ স্থান দেন। এ ধ্রুপদী চিন্তার মূলে আছে কিছু

সর্বজনীন বিষয়-আশয়, যেমন : ব্যক্তির দায়দায়িত্ব, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক, প্রকৃতি, প্রেম ইত্যাদি। একই সঙ্গে একটি চিন্তার কাঠামো। যে কাঠামোটি গভীরতা প্রত্যাশী। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে এ সমাজ ও কাঠামো চিন্তার প্রেক্ষিতটি আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। যে মাতৃভাষা একজন ব্যক্তিকে নির্মাণ করবে তার ভাবনা ও চিন্তার জগৎ তৈরি করে দেবে, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কটি অবারিত করবে, তাকে অবহেলা করলে মানুষ শেষ পর্যন্ত অনিকেত ও উন্মুল হয়েই থাকবে। তাছাড়া মাতৃভাষা চর্চা একজন ব্যক্তিকে অপসংস্কৃতি অথবা উন্মুল সংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে অধ্যাপক চৌধুরীর মূল্যায়নের এ বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়। নীরদ সি চৌধুরী অবশ্যই মেধাবী মানুষ ছিলেন, ইংরেজি ভাষার ওপর তাঁর দখল ছিল, মাতৃভাষাতেও ঈর্ষণীয় অধিকার ছিল। কিন্তু ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করতে গিয়ে তিনি যে ইংরেজি প্রীতিতে পড়লেন, তার প্রভাবে স্বদেশিকতাকে অবহেলা ও বিদ্রুপ করেছেন নীরদ সি চৌধুরী। তিনি একটি ভাষার পিছনে ছুটতে গিয়ে ক্রমাগত নিজের সংস্কৃতি থেকে দূরে চলে গেলেন। তিনি ইংল্যান্ডকে নিজের বাড়ি বলে ভাবলেন, যদিও ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন না, ইংল্যান্ড তাকে কীভাবে দেখছে। অধ্যাপক চৌধুরী ভাষার সঙ্গে ব্যক্তির মানস গঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন।

তাঁর আরেকটি প্রিয় বিষয় ইতিহাস। তবে প্রথাগত ইতিহাসে তার বিশ্বাস নেই- সে ইতিহাস বা ক্ষমতাবানদের ক্রনিকলকে তিনি প্রশ্ন করেন। তাঁর বিশ্বাস গণমানুষের ইতিহাসে। শেষ সত্তর-আশির দশকে অনিবাসী ও নিবাসী কিছু ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ববিদ মিলে যে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করেন, যা প্রথাগত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বিদ্যাকে চ্যালেঞ্জ করে; প্রান্তজনকে কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং কেন্দ্রাস্থিত গুরুত্বপূর্ণদেরকে প্রান্তে নিয়ে আসে, সেই ইতিহাস চর্চা তাঁর সায় পায়। তিনিও বিশ্বাস করেন প্রথাগত ইতিহাস আধিপত্যবাদকে মাথায় রেখে লঘু-গুরু বিচারে নামে, অনেক রক্তারক্তির ইতিহাসকে নানান বর্ণনায় মহিমান্বিত করে। এ ইতিহাসে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ; সমাজ অধীনস্থ রাষ্ট্র নামক

একটি যন্ত্রের। অথচ সাধারণ মানুষই ইতিহাসের প্রকৃত আকর। সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে বৃহত্তর ইতিহাস কাঠামোর। এক দিক থেকে দেখতে গেলে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিকে ভুল দিগন্ত থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের ভেতরে স্থাপন করে। অধ্যাপক চৌধুরী ইতিহাসের মোড় ফেরাগুলোকে, তার ছোট-বড় ঘটনা সমষ্টিকে সাধারণ মানুষের জীবন ও সময় এবং তাদের আশা-আকাঙ্খার আলোকে বিশ্লেষণ করাকে ইতিহাসের একটি পদ্ধতিগত আবশ্যকীয়তা বলে বিবেচনা করেন।

অধ্যাপক চৌধুরী যে মানবতাবাদে বিশ্বাস করেন সেটি গত শতাব্দীর শুরুর দিকের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের চিন্তাভাবনার সমান্তরাল। এম এন রায় সম্পর্কে অধ্যাপক চৌধুরীর অভিমত এজন্য প্রশংসনীয়। অধ্যাপক চৌধুরীও বিশ্বাস করেন, মানবতাবাদ শুধু একটি সামাজিক বিবেচনা বা দর্শন চিন্তা নয়, এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি সক্রিয় শক্তি হওয়া উচিত, মানব ইতিহাসে শ্রেণিগত বিভাজন ও বঞ্চনা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি মানবতাবাদকে প্রায় মরমী একটি অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাবানরা তাদের শোষণ প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করে। মানবতাবাদ যখন সক্রিয় রাজনৈতিক চিন্তা হয়, তখন শ্রেণি, পুঁজি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থানটি চিহ্নিত হয়। অধ্যাপক চৌধুরীর চিন্তাভাবনায় মরমীবাদের কোনো স্থান নেই– আমার অন্তত চোখে পড়েনি। যেহেতু তিনি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের যুক্তিতে তাঁর বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করেন। তাঁর চিন্তায় যুক্তিবাদের যতটা অবস্থান, মরমীবাদের ততটাই অনুপস্থিতি। কিন্তু একটি জায়গায় অধ্যাপক চৌধুরীর যুক্তিবাদ কিছুটা ভূমি ছাড়তে রাজি হয়, এবং সেটি হচ্ছে মানুষের অন্তর্গত রোমান্টিক চিন্তার ক্ষেত্র। অধ্যাপক চৌধুরীও মানুষের স্বপ্ন দেখার, আপ্লুত হওয়ার, ভালোবাসার অথবা কষ্ট পাওয়ার বিষয়গুলোকে মেনে নেন। তিনি নিজেও স্বপ্ন দেখেন, বিশেষ করে সমাজবদলের এবং মানুষের উত্থানের।

অধ্যাপক চৌধুরীর আরেকটি পরিচয় হচ্ছে সম্পাদকের। অনেক আগে তিনি লেখক শিবিরের ‘পরিক্রমা’ পত্রিকাটি সম্পাদনা

করতেন। মাঝখানে একাডেমিক নানা জার্নাল সম্পদনা করেছেন। এখন করছেন 'নতুন দিগন্ত' শীর্ষক সাহিত্য জার্নাল। সম্পাদকের কাজ কি? তিনি কি শুধুই লেখা জমা পড়ার ডাকবাক্স, এবং সর্টি ক্লার্ক, যিনি কোন লেখাটি মুদ্রিত হবে, কোনটি হবে না, সেই সিদ্ধান্তের পর লেখার ভালো-মন্দ, ভাষা ইত্যাদি ঠিক করে দেবেন, তথ্যসূত্র ভুল হলে শুধরে দেবেন? না; একজন সম্পাদক একজন সমাজ সচেতকও; তিনি লেখক সৃষ্টি করেন, পাঠক সৃষ্টি করেন, একটা সামাজিক আন্দোলনের সূচনাও তিনি করতে পারেন। 'নতুন দিগন্ত' একটি চিন্তাশীল জার্নাল এবং এর সংখ্যাগুলো হাতে নিলেই বোঝা যাবে, তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ অধ্যাপক চৌধুরীর প্রিয় বিষয়গুলোর ওপর। তিনি 'নতুন দিগন্ত' সম্পাদনা করে তৃপ্তি পান, তাঁর ক্লান্তি হয় না। কেননা, তিনি তাঁর প্রিয় চিন্তাগুলোকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে, বাজিয়ে নিতে পারেন। তাঁর দৃষ্টির কেন্দ্রে এখনও মানুষ এবং সমাজ। এবং তাঁর নিরন্তর প্রয়াস, এদুয়ের বিকাশ, উন্নতি এবং উত্তরণ। তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হবে কি না; হলে কতটা হবে, এটি বলতে পারবে সময়। কিন্তু তিনি যে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, অথবা তাঁর ভেতরের রোমান্টিক সত্তাটি, সে ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। তার সত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধা, এবং আমাকে জীবনের অনেকগুলো পাঠ অকপটে এবং অকৃপণভাবে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা।

দর্শনের মানুষ, সক্রিয়তার মানুষ : চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম

মার্ক্স-এর একটি উদ্ধৃতি ধরে সরদার ফজলুল করিমের ওপর এ লেখাটি শুরু করা যায়: 'দার্শনিকরা বহুভাবে পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, 'মার্ক্স বলেছেন, 'এখন প্রয়োজন একে বদলানোর।' যারা বদলাবেন তারা বিপ্লবী, সক্রিয় সমাজকর্মী; যারা শ্রেণি ও বিত্তের শাসন এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অচলায়তন ভেঙে সমাজের বন্দিদশা ঘুচাবেন, জগৎকে বদলে দেবেন। মার্ক্স ধরে নিয়েছিলেন কিনা কে জানে যে, যারা পৃথিবীকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা বিপ্লবীদের থেকে আলাদা; তাঁদের সক্রিয়তার অঞ্চল চিন্তা, সমাজ ও জগৎ বদলের কর্মযজ্ঞে, বিপ্লবের মাঠে তাদের অংশগ্রহণ থাকে না। মার্ক্স এ কথাটি বলার পর এ পর্যন্ত জগৎ বদলানোর প্রতয়ে খুব বেশি দার্শনিক যে পথে নেমেছেন, তা বলা যাবে না। হয়তো নিজের মতো করে বদলনোর কাজটি ভেবে নিয়েছেন তাঁরা, হয়তো করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন নানান দিক থেকে, তারপর ফিরে গেছেন তাঁদের চিন্তার জগতে। আমদের সময়েও তেমন উল্লেখ্যযোগ্য নাম আমরা পাইনি সামাজিকভাবে সক্রিয় দার্শনিকের। গত শতকের ষাটের দশকে ফ্রান্সে জাঁ পল সার্ত্র উদাহরণ দেখিয়েছেন এ সক্রিয়তার। কিন্তু তাঁর জগৎ বদলানোর চিন্তাভাবনাকে খুব একটা আমলে আনেনি রাষ্ট্র, অথবা বৃহত্তর ফরাসি (অথবা ইউরোপীয়) জনগোষ্ঠী। তারপর তো মার্ক্সের চিন্তা থেকেই বেরিয়ে আসার সময় দেখা দিল। সোভিয়েত রিপাবলিকের পতন হলো। সে আরেক ইতিহাস।

দর্শন পড়ে সবাই দার্শনিক হন না, তবে কেউ কেউ হন। কালেভদ্রে দর্শন না পড়েই দার্শনিক হওয়া মনীষীদের তালিকাটাই বরং দীর্ঘ। আমাদের দেশে যে ক'জন দর্শন চিন্তাবিদ প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন চর্চার পাশাপাশি মর্যাদায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন সরদার ফজলুল করিম। আরেকজন ছিলেন জিসি দেব। আমার সৌভাগ্য, এ দুই দার্শনিকের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম। জিসি দেবের সঙ্গে যেচে পরিচিত হয়েছিলাম, একটা দুটো কথা বলতে পেরেছিলাম, কিন্তু সরদার স্যারের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছে; তাঁর স্নেহও পেয়েছি। আমি দেখেছি তাঁর ভিতরে একটা বিশাল জ্ঞানস্পৃহা ছিল, চিন্তার একটা শৃঙ্খলা ছিল, বলার কাঠামো ছিল। পাশাপাশি সমাজ বদলের একটা অঙ্গীকার ছিল।

এই অঙ্গীকারের কথাটাই প্রথমে বলা যায়, যেহেতু এ একটা জায়গায় তিনি অনেকের থেকেই পৃথক। মার্কিন চিন্তাবিদ, লেখক রালফ ওয়ালডো এমার্সন তাঁর "দ্য আমেরিক স্কলার" বক্তৃতা/রচনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশে বলেছিলেন "জ্ঞানান্বেষীদের হতে হবে Man thinking; অর্থাৎ চিন্তাশীল মানুষ, যে মানুষ চিন্তার সঙ্গে তার প্রয়োগের সক্রিয়তাটাও মেলাবে।" সরদার ছিলেন সেই Man thinking; কিন্তু পাশাপাশি তিনি ছিলেন সমাজকে বদলে দেওয়ার প্রত্যয়ে সক্রিয় মানুষও। কম্যুনিস্ট আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন, মার্ক্সীয় বীক্ষণে তিনি আস্থাবান ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক সম্মান ও ১৯৪৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে যখন তিনি বের হলেন, শিক্ষকতার একটি চাকরি নিয়ে পড়াশোনার চর্চা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য দুটো কাজই তিনি চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক এবং সমাজের প্রান্তবাসী মানুষজন। তাদের ভাগ্য বদলের জন্য তিনি পথে নামলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শে ততদিনে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। চল্লিশের মধ্যদশকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে মুসলিম তরুণদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। তিনি ছিলেন ওই ব্যতিক্রমীদের একজন। তাঁর নিজের জবানীতে তিনি লিখেছেন, "সকল মহৎ সংগ্রামের মহৎ ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িত সংগ্রামী মানুষ :

(আমি সরদার বলছি, ১৫)। তিনি তাদের দলে নাম লেখালেন। সংগ্রামের মহৎ ঐতিহ্যের পুনরাধিষ্ঠান ঘটানোর কাজে ব্রতী হলেন।

তবে নির্যাতিত মানুষের জন্য কিছু একটা করার চিন্তাটা সরদার ফজলুল করিমের মাথায় এসেছে আরও আগে, ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়। তিনি নিজেই লিখেছেন, ওই সময় তিনি যতটা না কম্যুনিস্ট, তার চাইতে বেশি জাতীয়তাবাদী। কিন্তু এক রাতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পড়ে তিনি অনুপ্রাণিত হলেন মেহনতী মানুষের সংগ্রামে শামিল হতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর ওই পথেই তিনি যেতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতায় যুক্ত হতে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হয়ে যান। কিন্তু বেশিদিন সেই চাকরি তিনি করেননি। পার্টির নির্দেশে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, এবং এক অনিশ্চিত জীবন বেছে নিলেন। অনিশ্চিত জীবন অর্থাৎ আন্ডার গ্রাউন্ডের জীবন। গ্রামে গিয়ে তিনি কৃষকের সঙ্গে কাজ করেছেন। জীবনের এগারোটি বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। নিজের সুযোগ-সুবিধা অথবা নিরাপত্তা নিয়ে কখনো ভাবেননি।

ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মতো এতটা নিশ্চিত এবং নিরাপদ চাকরি, যার সঙ্গে আছে সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানের বিষয়টি, তিনি কত সহজে ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাজে নেমে পড়লেন। অথচ ওই কাজে পদে পদে ছিল বিপত্তি, গ্রেপ্তার হওয়া এবং নির্যাতিত হওয়ার ভয়। এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে ঢোকার আগে, তিনি বিলেতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। বৃত্তির জন্য সাক্ষাৎকারের চিঠিও পেয়েছিলেন, এবং বৃত্তিটি যেহেতু দর্শনশাস্ত্র ও মুসলমান প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তিনি সেটি পেতেনই। কিন্তু কলকাতায় কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে গিয়ে যখন এ কথাটি তিনি মজাফ্‌ফর আহমেদ ও নৃপেন চক্রবর্তীকে বললেন, এবং তাঁরা মত দিলেন, পার্টির কাজটা বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাওয়াটা থেকে জরুরি, তিনি সাক্ষাৎকারের চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সক্রিয়তা সরদার ফজলুল করিমের কী পরিমাণ ছিল তা শুধু তাঁর কারাবাসের সংখ্যা ও সময়কাল থেকেই বোঝা যাবে না, যাবে পার্টির নেতাকর্মীরা কীভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করতেন, তা থেকেও। কারাগারে বসেই তিনি পাকিস্তানের আইন পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। এটি সম্ভব ছিল তাঁর পিছনে পার্টি কর্মীদের শক্ত সমর্থন এবং তাঁর পক্ষে তাদের মাঠে নামার কারণে। যে কটি গুণ তাঁকে নেতাকর্মীদের কাছে প্রিয় করেছিল, সেগুলোর মধ্যে ছিল তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নিজের ব্যক্তিজীবনকে তাঁর বৃহত্তর রাজনৈতিক– সামাজিক জীবন থেকে গৌণ মনে করা, তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ও জীবনযাপনের সততা। তাঁর বিনয়, সকল মানুষের প্রতি তাঁর উদারতা– এসবও তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এজন্য তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও মানুষের মধ্যে কাজ করতে পেরেছেন।

সরদারের সক্রিয়তার অনেক দিক ছিল, অনেক পরিচয় ছিল। এসব থেকে মাত্র দুটি উদাহরণ এখানে তুলে দিলে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং অভিঘাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হতে পারে। ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দিদের যত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো, মুসলিম লীগ সরকার এক জিঘাংসা থেকে সেসবের অনেকগুলোই প্রত্যাহার করে নেয়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা কারাগারের রাজবন্দিরা অনশন ধর্মঘট করেন। ওই সময় সরদারকেও গ্রেপ্তার করে কারাগারে ঢোকানো হয়, তিনিও অনশনে যোগ দেন। অনশনের একটা সময়, তাঁর নিজের বর্ণনা মতে, এরকম তাঁর 'মনের সত্তা চাচ্ছে অনশনে অটল থাকতে। দেহের সত্তা চাচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করতে।' (স্মৃতিসমগ্র : ১,১৩১)। সরদারের স্বাস্থ্য কোনকালেই খুব মজবুত ছিল না। কিন্তু তারপরও তিনি দেহের সত্তাকে অস্বীকার করে প্রায় তিরিশ দিন অনশন চালিয়ে গেলেন। অনশন শেষ হল কর্তৃপক্ষ কিছু দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ায়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়কালের। সরদার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সক্রেটিস-প্লেটো-হেগেল পড়ছেন। একদিন এক কমরেড এসে তাঁকে বলল, যখন দুর্ভিক্ষে মানুষ মরছে, তখন হেগেল থেকে একটি হেঁশেল বা লঙ্গরখানা বেশি জরুরি।

তাঁকে পাঠানো হল নয়া বাজারের লঙ্গরখানায়। তবে শুধু শহরে নয়, তিনি গ্রামেও গিয়েছেন রিলিফ দিতে, কিছু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথম উদাহরণটি তাঁর অনশনে যোগ দেওয়ার তাৎক্ষণিক একটি সিদ্ধান্তের। দ্বিতীয়টি এক বন্ধুর কথায় হঠাৎ গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার। ১৯৪৩-এ তাঁর বয়স আঠারো– জীবনকেও বাস্তবতাকে তিনি বুঝতে শিখছেন, জ্ঞানের রাজ্যে উঁকি ঝুকি মেরে এর সম্পদের একটি ছোটখাটো জরিপ করতে শুরু করেছেন– এবং এ জগতের আকর্ষণটাকে বড় মনে করছেন। কিন্তু একবার যখন লঙ্গরখানা ও গ্রামে গিয়েছেন আর্তমানবতার সেবার জন্য, তিনি জ্ঞানের আকর্ষণের পাশাপাশি মানুষের জন্য কিছু করার একটি তাড়াও অনুভব করেছেন। ঢাকা কারাগারে কয়েদিদের অনশন কর্মসূচিতে তিনি যখন অংশ নেন, এক পরিণত সরদার আমাদের চোখে পড়ে, যে সরদার মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। ওই অনশনে তাঁর মৃত্যু হতে পারত, যেমন হয়েছিল শিবেন রায়ের, কারারক্ষীদের অত্যাচারে এক প্রকোষ্ঠে একাকি দম বন্ধ হয়ে।

সরদার ফজলুল করিমের রাজনীতি ও এক দশকের বেশি কারাবরণ তাঁকে জীবন ও বাস্তবতাকে আরও পরিষ্কারভাবে পড়তে শিখিয়েছিল। তিনি একদিকে মানুষের সামনে আলো দেখেছিলেন, কিন্তু অন্ধকারটাও তিনি দেখেছেন, যে অন্ধকার ক্ষমতার, বিত্তের, অহমিকার, মূঢ়তার। আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বে শীঘ্রই যে আলো জ্বলে উঠবে, অন্ধকার দূর হবে, সেরকম তিনি ভাবেননি। 'স্মৃতি সমগ্র-১' ও 'স্মৃতি সমগ্র-২' এবং 'আমি সরদার বলছি' গ্রন্থে সংকলিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, সমাজ বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর কোনো ভুল ধারণা ছিল না, আকাশ কুসুম কল্পনা ছিল না। তিনি জানতেন বিপ্লব হঠাৎ করে আসে না, তার জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি প্রয়োজন; যে ভূমির ওপর তা দাঁড়াবে সেটা শক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য তাঁর লেখাতে একটা নির্মোহ দৃষ্টি থাকে, যা আশা এবং বাস্তবতার একটা ভারসাম্য রেখে চলে। তিনি কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর লেখায় 'সর্বহারা' 'পাতি বুর্জোয়া', 'লুম্পেন বুর্জোয়া' এ ধরনের পদ বা বর্ণনা প্রায় চোখেই পড়ে না,

কারণ তিনি দীর্ঘ একটি দৃষ্টি দিয়ে উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের বাস্তবতা, বিপ্লব বা বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দেখেছেন। তিনি বারবার একটি দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রেখে চলেছেন। এর বাইরে আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর; এক সূক্ষ্ম রসবোধ তাঁর লেখায় ছিল, নিজেকে নিয়ে কৌতুক করার একটা ইচ্ছাও। যেন তিনি নিজেকেই দেখেছেন একটু দূর থেকে, বিচার করেছেন, সক্ষমতা-দুর্বলতাগুলো বর্ণনা করেছেন। মেহনতি মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা চিরদিন অটুট ছিল, কিন্তু যারা তাদের সামনে দাঁড়াবেন আদর্শ নিয়ে, তাদের সহযোগী হবেন, পথ দেখাবেন, তাদের নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তাঁর লেখায় ভালোর সঙ্গে মন্দও এসেছে; তাঁর লেখায় ইউটোপিয়ার কোনো ছায়াপাত নেই। দুনিয়াটা কখন বদলাবে, কোন অবস্থা বা পরিস্থিতি এর বদলে যাওয়ার সুযোগটা তৈরি করে দেবে, তা নিয়ে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। কিন্তু কীভাবে সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং বিশেষ করে কারা, কোন নেতৃত্ব– সেই পরিস্থিতির দিকে মানুষকে নিয়ে যাবেন, সে বিষয়টি জোরের সাথে কোথাও তিনি বলেননি। হয়তো এ জগৎ বদলের বিষয়টা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সব মানুষের হাতে। সবাই যদি নিজের জায়গাটাতে, নিজের পরিমণ্ডলে বদলে যায়, জগৎটা তো একদিন বদলাবেই।

সরদার ফজলুল করিম একসময় রাজনীতি ছেড়ে দিলেন যখন তাঁর পরিবার তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিতে রাজনীতি আর না করার একটা শর্ত তার ওপর চাপিয়ে দিল। তিনি সেটি মেনে নিলেন। সরদার স্যারকে আমি যতটুকু চিনেছি, তাঁকে কেউ শর্ত দিয়ে কোনো কিছু করাবে তা ভাবা মুশকিল। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য যে তাঁর সক্রিয় রাজনীতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। তবে আমার মনে হয়েছে দীর্ঘদিনের কারাবাস তাঁকে যে একটা অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল, তা দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মেহনতি মানুষের অবস্থার ইতর বিশেষ না হলেও যুগ পাল্টেছে। যে মানুষ কৈশোরে যৌবনে স্বপ্ন দেখে সমাজ বদলের, সে আশা করে সামনের দিনগুলো পিছনের দিনগুলো থেকে ভালো হবে। সরদার তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের পিছনে কম বিনিয়োগ করেননি, দীর্ঘ এগারোটি বছরের কারাবাসের কষ্ট বিনিয়োগ করেছেন বিশ্বাসটাকে

কাজে পরিণত করার কাজে, চাকরি ছেড়েছেন, বিলাতে পড়াশোনার সুযোগ ছেড়েছেন, পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে নিজের আবেগ-ভালোবাসাকে তাঁর কাজে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু দেখতে পেয়েছেন সামনের দিনগুলো কোথায় ভালো হবে, বরং আরও খারাপ হওয়ার পথে আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে আরও খারাপ প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র। তাঁর পার্টিতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নীতি ও স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে। তিনি ভেবেছেন, ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি যদি এখন লড়ে যান, তিনি একাই লড়বেন। আর কারাগারে বসে তো লড়াই হয় না, মানুষের মাঝেও যাওয়া হয় না।

কারাগারের জীবন শেষ হলে একটা চাকরি জীবনে ঢুকে পড়লেন সরদার ফজলুল করিম। বাংলা একাডেমিতে একটা চাকরি নিলেন এক সময়। তাঁর হতাশায় ডুবে যাওয়ার কথা ছিল। এত আত্মত্যাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি চাকরিতে ঢুকে (যদিও তা বাংলা একাডেমি) কিছুটা গ্লানিও হতে পারত তাঁর। কিন্তু তাঁকে সুরক্ষা দিল কিছু বিষয়। প্রথমত জীবন সম্পর্কে তাঁর নির্মোহতা, দ্বিতীয় তাঁর সেই রসবোধ, তৃতীয়ত দীর্ঘ দৃষ্টিতে ইতিহাস ও সমকালকে দেখে তাঁর ভবিষ্যতের ভিন্ন একটি রূপ নির্মাণ, এবং চতুর্থত এবং স্পষ্টত এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকর, জ্ঞানের রাজ্যে আরেকবার তাঁর পরিব্রাজক হয়ে যাওয়া। তিনি সক্রিয় মানুষের সীমাবদ্ধতাকে Man thinking-এর অঞ্চলে নিয়ে একটি সমীকরণে তাঁর দুই সত্তাকে (না, দেহ বা মন নয়; বরং সক্রিয় মানুষ আর চিন্তাশীল মানুষের) মেলাতে চাইলেন।

বাংলা একাডেমি থেকে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় তিনি ফিরে গেলেন স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালে। এরপর তাঁর ভূমিকাটি হয়ে গেল একজন জ্ঞানসাধকের। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতে মনোসংযোগ করলেন। দর্শনের মৌলিক বই তিনি লেখেননি, কিন্তু দর্শন নিয়ে লেখালেখি করেছেন, পশ্চিমের প্রাচীন ও সমকালীন দার্শনিকদের বাছাই কিছু লেখা বাংলায় তরজমা করেছেন। তরজমাগুলোর ভূমিকাতে তিনি যেটুকু লিখেছেন, তার বাইরে মূল গ্রন্থের কোনো কোনো শব্দ-পদকে ব্যাখ্যা

করার জন্য তিনি পাদটিকা ব্যবহার করেছেন। তবে এসব অনুবাদ গ্রন্থ সামগ্রিকভাবে একটি বিষয় তুলে ধরে– সরদারের চিন্তাভাবনার পিছনে এদের প্রভাব; অথবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সরদারের দর্শনের চাবিকাঠির সন্ধানে এ অনুবাদ গ্রন্থগুলোর ভূমিকা। তিনি যেসব বই অনুবাদ করেছেন, সেগুলো কোন হঠাৎ-চয়নের মাধ্যমে করেননি, বইয়ের তাকে হাত দিয়ে যে বইটা উঠে আসবে, তার অনুবাদ করা যাক– এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত থেকে নয়। বরং একটা পরিকল্পনা থেকে, দর্শনের পূর্বাপর ইতিহাসের কিছু মূলভূমির পরিচিতি তুলে ধরতে এবং তাঁর চিন্তাকে জাগ্রত করছে যেসব দর্শনচিন্তা, সেগুলোকে আবার বাজিয়ে দেখতে এ নির্বাচন। দর্শনের অঞ্চল থেকে বেছে বেছে সরদার ফজলুল করিম কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ এবং এগুলোর ওপর আলোচনা লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো 'প্লেটোর সংলাপ' ও 'প্লেটোর রিপাবলিক', অ্যারিস্টোটলের 'পলিটিক্স', রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' ও এঙ্গেলসের 'এন্টি ডুরিং'(এটি 'এন্টি ডুরিং' গ্রন্থের 'দর্শন' অংশের অনুবাদ)। এ ছাড়া তিনি 'দর্শন কোষ' নামের একটি বইও লিখেছেন। এসব প্রতিটি বইয়ের একাধিক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। সাধারণত দর্শনের বইয়ের পাঠক সংখ্যা সীমিতই থাকে– দর্শনের যারা ছাত্র ও শিক্ষক তারাই এসব বই কেনেন, গ্রন্থাগারগুলোও কেনে। কিন্তু সরদারের বই কেনেন সকল বিষয়ের ও শ্রেণি বা পেশার মানুষ। তার প্রধান কারণ তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলো পড়তে ভাষাগত কোনো সমস্যা হয় না, এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলোও দুর্বোধ্য নয়। সরদার নিজে বড়মাপের দার্শনিক ছিলেন, তিনি প্লেটো বা অ্যারিস্টোটলকে যখন অনুবাদ করতেন, নিজের বোধ-বুদ্ধিতে তাঁদের আত্মস্থ করে, তাঁদের ওপর একটি অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই তা করতেন। ফলে যে কোনো জটিল চিন্তাভাবনা সহজেই বুঝিয়ে লিখতে তিনি সক্ষম হতেন। এ ছাড়া, ভাষা ব্যবহারেও তিনি ছিলেন কুশলী। ভালো অনুবাদের একটি মূল শর্ত তিনি মেনে চলতেন, এবং তা হলো; আক্ষরিক অনুবাদ না করে অর্থের অনুবাদ করা এবং অনুবাদের সময় ওই ভাষায় বাক্য নির্মাণ থেকে নিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রেফারেন্সগুলোর ভাষান্তরের দিকে লক্ষ্য রাখা।

সরদারের অনুবাদকর্মগুলো পড়ার সময় মনে হবে তিনি যেন তরজমা করেননি, বরং দার্শনিকদের নিজস্ব একটি বয়ানে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রেণিকক্ষে দর্শনের অনেক কঠিন বিষয় যেমন তিনি সহজে ব্যাখ্যা করতে পারতেন, শিক্ষার্থীদের বোধের ভিতরে নিয়ে আসতে পারতেন, অনুবাদের ক্ষেত্রেও এ কাজটি তিনি অসম্ভব দক্ষতায় করেছেন। আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে একবার মার্ক্স এবং কিয়ের্কেগার্ডের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আধাঘণ্টার মতো সময় তিনি আমাকে দিতে পেরেছিলেন। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে একটি সেমিনারে আমাকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছিল, সেটি লিখতে ওই বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার করে নিতে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমি অবাক হয়ে শুনলাম। তিনি মাঝে মাঝে চোখ বুঝে, বাকি সময় আত্মমগ্ন হয়ে– যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন– আমাকে বিষয়গুলো বুঝিয়েছিলেন। বছর পনেরো অথবা তারও আগের কথা। অথচ এখনও তাঁর ব্যাখ্যাগুলো কানে বাজে।

সেদিন সরদার ফজলুল করিমের কথা শুনতে শুনতে এবং তার আগে থেকেই দর্শন বিষয়ে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংবলিত বইগুলো পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, মার্ক্স ও রুশোকে বেছে নেওয়ায় তার একটি কারণ ছিল। তিনি মার্ক্সবাদী বীক্ষণে আস্থা রেখেছিলেন- সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু মার্ক্সের মতো এঙ্গেলসের চিন্তাও তাঁকে জাগিয়েছিলেন। এঙ্গেলসের লেখালেখিতে তিনি যে বিষয়গুলোর প্রাধান্য দেখতেন সেসবে তিনি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং সমষ্টির জীবনে এসবের চর্চার আশা করতেন। তিনি নিজেই এঙ্গেলসের এসব চিন্তার একটি সারাংশ নির্মাণ করেছিলেন; "এঙ্গেলসের রচনাবলিতে বস্তু এবং গতি, সময় ও স্থানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, অজ্ঞেয়বাদের অসারতা, বস্তুর উপাদানের জটিল গঠন এবং তার অনুম্মোচিত অসীমতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং এ সব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মার্ক্সবাদী অবদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়" ('এন্টি ডুরিং, ১৭')। এ্যারিস্টোটলের যুক্তিবাদ, জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে তাঁর বিশ্বদর্শন, 'প্রাকৃতিক দর্শন' এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নতুন চিন্তা

সরদারকে উৎসাহিত করেছিল। অ্যারিস্টোটলের গুরু প্লেটোতেও তিনি জ্ঞানতত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা পেয়েছেন, সমাজ সংগঠনের উপাদান পেয়েছেন। তবে তাঁকে এ দুই দার্শনিক যা দিয়েছেন, তা তাঁর চিন্তার দার্ঢ্য, পর্যবেক্ষণের শক্তি এবং জীবনবোধের পরিব্যাপ্ত বিকাশ। আর রুশো থেকে তিনি দিয়েছেন তাঁর রোমান্টিক চেতনা, যা মানুষ এ সমাজের শক্তিতে বিশ্বাস করে।

সরদার ফজলুল করিম এক কিংবদন্তীর জীবন পার করে মহাজীবনের পথে চলে গেছেন। কিন্তু তিনি চিন্তার ও দর্শনের যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়। সেসব আমাদের জীবনে নিলে, তাঁকে নতুন করে পড়লে, আমরাই সমৃদ্ধ হব।

উদ্ধৃতি

সরদার ফজলুল করিমের —

আমি সরদার বলছি (২০১৩)। ঢাকা : অন্বেষা

সরদার ফজলুল করিম স্মৃতিসমগ্র-১ (২০১৩)। ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স

সরদার ফজলুল করিম স্মৃতিসমগ্র-২ (২০১৩)। ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স

এ্যারিস্টোটল-এর *'পলিটিক্স'* (২০১৩ [১৯৮৩])। ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স

এঙ্গেলস-এর *'এন্টি ডুরিং'* (২০১৪ [১৯৮৫])। ঢাকা; হাওলাদার